কথা-সাহিত্য

নারায়ণ চৌধুরী

কনটেমপোরারী পাবলিশার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ :
ভাদ্র ১৩৭০ (সেপ্টেম্বর ১৯৬৩)

প্রকাশক :
ডি, এম, গাঙ্গুলী
কনটেমপোরারী পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
প্রধান কার্যালয় :
১২ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

রেজিঃ অফিস :
৬৫, রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট, কলিকাতা-৩

মুদ্রক :
শ্রীবিনয়রতন সিংহ
ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌
১৪১, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়
৪৫।সি, পাইকপাড়া রো
কলিকাতা-৩৭

পরিবেশক :
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ইস্টার্ন এজেন্সীজ,
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দাম পাঁচ টাকা

উৎসর্গ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

শ্রীচরণেষু

গ্রন্থকারের নিবেদন

'কথা-সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নিবন্ধগুলি সব কটিই এক সুরে গাঁথা; আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যের স্বরূপলক্ষণ নিরূপণ, বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পলেখকদের রচনা-রীতির মূল্যায়ন ও তাঁদের প্রধান প্রধান গল্পোপন্যাসের বিচারক্রিয়া এই গ্রন্থের উপজীব্য। আলোচনাগুলি স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত হলেও তাদের ভিতর একটি সঙ্গতির সূত্র বিদ্যমান! রচনাগুলিকে ধারাবাহিক বললেও অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যের একটি মোটামুটি পরিচয় এই গ্রন্থে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে; সে চেষ্টার ভাল-মন্দ পাঠকেরা বিচার করবেন।

প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ আজ থেকে ছ-সাত বছর আগে 'শনিবারের চিঠি' মাসিকে প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময় সেগুলি 'চিঠির' পাঠকসাধারণের দ্বারা আদৃত হয়েছিল। এই প্রবন্ধগুলি লেখবার পিছনে যাঁর উৎসাহ ও প্রেরণা সবচেয়ে বেশী ছিল, সেই 'শনিবারের চিঠির' প্রথিতযশাঃ সম্পাদক বিশিষ্ট কবি ও সমালোচক শ্রীসজনীকান্ত দাস আজ আর ইহলোকে নেই। প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে গভীর বেদনার সঙ্গে তাঁর স্মৃতি স্মরণ করছি। আজ তাঁর জন্ম-তারিখ, এই দিনটিতে তাঁর অভাব আরও বেশী করে বাজছে।

এই গ্রন্থে সংকলিত "কথা-সাহিত্য ও দেহবাদ" প্রবন্ধটি নিয়ে 'চিঠির' পৃষ্ঠায় একদা প্রবল বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল। কয়েক সংখ্যা ধরে এই বাদ-প্রতিবাদ চলে। অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বিতর্কে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর যে দুটি প্রবন্ধ সেই সময়ে চিঠির পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় বর্তমান গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট'-ভাগে সে দুটি মুদ্রিত হল।

৯ ভাদ্র ১৩৭০

লেখকের অন্যান্য বই—

- সাহিত্য ও সমাজ মানস
- আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন
- বাংলার সংস্কৃতি
- সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি
- সাহিত্যের সমস্যা
- আত্মদর্শন
- লঘুপক্ষ
- অম্লমধুর
- সঙ্গীত পরিক্রমা (২য় সংস্করণ—যন্ত্রস্থ)

ইত্যাদি

সূচীপত্র

কথা-সাহিত্য

বাংলা ভাষায় কথা-সাহিত্যের প্রচলন নিতান্ত আধুনিক কালের ঘটনা। ইংরেজ-আগমনের পরবর্তী কালে ইংরেজী সাহিত্য ও সভ্যতার সংস্পর্শ ও সংঘাতের ফলে বাঙালীর শিল্পবোধ আর কল্পনার যে দৃষ্টিগ্রাহ্য পার্শ্ব-পরিবর্তন ঘটে, তারই খাত বেয়ে আধুনিক রুচি ও রীতি-সম্মত কথা-সাহিত্যের আবির্ভাব হয়। এ জিনিস আমাদের সাহিত্যে পূর্বে ছিল না। অবশ্য কথা-সাহিত্যের যা প্রধান উপজীব্য—কাহিনী—তা প্রাক্-ব্রিটিশ পর্বের বাংলা ভাষায় পুরো মাত্রাতেই ছিল, তবে তার বাহন ছিল পদ্য, প্রণালীবদ্ধ গদ্য নয়। প্রণালীবদ্ধ গদ্যের সূচনা ব্রিটিশ-উত্তর কালে। ব্রিটিশ-উত্তর যুগে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে গদ্যের সবিশেষ প্রচলন হয় এবং তারই হাত ধরে অচিরকালের মধ্যে আজকের দিনে যে কথা-সাহিত্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তার প্রবর্তন হয়। মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের পূর্বে সাহিত্যে গদ্যের ব্যবহার ছিল সামান্যই, যেটুকু ছিল তা দলিল-দস্তাবেজ কবলুতি-নামা খত ব্যবসায়িক চিঠিপত্র ইত্যাদি রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বললেও চলে। গদ্য মুখের ভাষা, মুখের ভাষাই সেটি ছিল, কলমের ভাষা হয়ে উঠতে তখনও তার অনেক বিলম্ব ছিল। পূর্ব-যুগের রূপকথা আখ্যান আখ্যায়িকা ইতিহাস পৌরাণিক গল্প ইত্যাদি—যা কথা-সাহিত্যের অন্তর্গত—অধিকাংশ পদ্যেই লিপিবদ্ধ হয়েছে; যেখানে তা হয়নি সেখানে মুখের ভাষার মধ্যেই আবদ্ধ থেকে গেছে। আমাদের অধিকাংশ রূপকথা উপকথা প্রস্তাব-জাতীয় গল্প প্রধানতঃ মুখের ভাষা অর্থাৎ মৌখিক গদ্যকে আশ্রয়

করে বিকাশ লাভ করেছে এবং শ্রুতি ও স্মৃতি-প্রসাদাৎ যুগ থেকে যুগান্তরে বাহিত হয়েছে। প্রাক্-ব্রিটিশ বাংলা সাহিত্যে লিখিত গদ্যে এসবের আত্মপ্রকাশের উদাহরণ নেই বললেই চলে। মুখের কথাতেই এই সকল রূপকথা-উপকথা-জাতীয় 'কথা' প্রধানতঃ স্ফূর্তিলাভ করেছে।

ইংরেজ-আগমনের পরবর্তী কালে পুরাতন ব্যবস্থায় প্রচণ্ড ওলট-পালট ঘটে গেল। সে ইতিহাস এতই সুপরিচিত যে, এখানে সে সব পুরনো কথার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। তবে সাহিত্যের বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রেখে বলা যায়, নতুন কাল নানা দিক দিয়েই বিস্ময়কর অভিনবত্বের সূচনা করল। এইরূপ একটি বিস্ময়কর অভিনবত্ব হল—মুদ্রিত কথা-সাহিত্যের আবির্ভাব। মুদ্রাযন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে এই বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্যের নিকট-সম্পর্ক থাকলেও শুদ্ধমাত্র মুদ্রাযন্ত্রের প্রসঙ্গোল্লেখ দ্বারা আধুনিক কথা-সাহিত্যের আবির্ভাবকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না। মুদ্রাযন্ত্রের সঙ্গে কথা-সাহিত্যের সম্পর্ক বহিরঙ্গের সম্পর্ক; কথা-সাহিত্যের বাহন গদ্যের প্রচলন ও প্রসারের সঙ্গেই মাত্র এর যোগ। কিন্তু কথা-সাহিত্যের আবির্ভাব আর বিকাশ তো শুধু গদ্যনির্ভর নয়, তার মূল আরও অনেক গভীরে নিহিত। সেই গভীর গহনে দৃষ্টি সঞ্চালন করলে দেখা যাবে, মুখ্যতঃ এটি ভাববস্তুরই প্রশ্ন। আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যের আবির্ভাবের পিছনে সুস্পষ্ট কয়েকটি আদর্শের প্রণোদনা ছিল, আর এইসব ভাবাদর্শ একান্তভাবেই এসেছে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতির সূত্র অবলম্বন করে। প্রথমতঃ ইংরেজী সাহিত্যের উপন্যাস আর ছোটগল্পের নজির আমাদের চোখের সামনে হাজির হল; দ্বিতীয়তঃ সেইসব গল্প-উপন্যাসের ভিতর যে সকল বিষয় আর ভাব মুদ্রিত রয়েছে তা আমাদের কল্পনাকে উচ্চকিত করল। স্কটের উপন্যাসের ইতিহাস-বিমিশ্র রোমান্স, গতযুগচেতনা, স্বদেশ

ও স্বজাতি-প্রেম, মধ্যযুগীয় আড়ম্বর আর ঐশ্বর্যবিলাস, আভিজাত্য-প্রীতি বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। অন্যদিকে রিচার্ডসন, ফিল্ডিং, স্টার্ন, সুইফ্‌ট্‌, থ্যাকারে. ডিকেন্স, জেন অস্টেন, ব্রঁতে ভগিনীদ্বয়, জর্জ এলিয়ট, অ্যান্থনি ট্রলপ, মেরিডিথ, ডিসরেলি, ওয়াশিংটন আর্ভিং, এডগার আলেন পো, উইলকি কলিন্স, রাইডার হ্যাগার্ড, হথর্ন প্রমুখ ইংরেজ ও আমেরিকান লেখকগণ আমাদের উনিশ শতকীয় ঔপন্যাসিকদের সামনে নতুন প্রেরণা আর নতুন কল্পনার উপকরণ সমুপস্থিত করেছিলেন তা তো একটি সুবিদিত তথ্য। ইংরেজী উপন্যাসের মাধ্যমে শুধু যে আমরা একটা নতুন প্রকাশরীতি আর আঙ্গিকের সঙ্গেই পরিচিত হলাম তাই নয়, অনেক নতুন ভাবধারাও আত্মসাৎ করলাম। এই স্বীয়কৃত ভাবধারার মধ্যে জাতীয়তা-বোধ অন্যতম, আর এই নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ আমাদের উনিশ শতকীয় উপন্যাসের পরতে পরতে অনুস্যূত হয়ে আছে সে কথা সকলেই জানেন।

উনিশ শতক হচ্ছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিকাশের যুগ, লিবারেলি-জমের আদর্শের প্রসারণের যুগ। রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যমণি ব্যক্তি—এই ধারণার ক্রমব্যাপ্তির ফলে সাহিত্যে এক দিকে যেমন খণ্ড-কবিতা আর গীতি-কবিতার প্রাধান্য বিস্তৃত হল, অন্য দিকে তেমনি উপন্যাস আর ছোটগল্পের সহায়ে মানব-মহিমা প্রতিষ্ঠারও সুসংবদ্ধ চেষ্টা হতে লাগল। উপন্যাসে ও গল্পে এই-যে ব্যক্তি-চরিত্রগুলির যথাযথ বিকাশের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়, তাদের মনোগত আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভাব সকল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করা হয়, তাদের সাফল্য অথবা ব্যর্থতাকে সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বোঝাবার চেষ্টা হয়—এ-সবই উনিশ শতকীয় ব্যক্তিতন্ত্র আর ঔদার্যবাদের বিস্তৃত প্রভাবের ফলশ্রুতি মাত্র। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের খাত বেয়ে এই আদর্শের

স্রোতোবেগ বাঙালীর মনের তীরে এসে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছিল এবং তার অনেকটা ঢেউ চল্‌কে বাঙালীর শিল্প-সাহিত্যের এলাকাতেও প্রবেশ করেছিল। শুধু শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম নয়, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আদর্শের দ্বারা গম্ভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। উপন্যাসে গল্পে চরিত্রসৃষ্টির সার্থকতার উপরেই তত্তৎ শিল্পকর্মের উৎকর্ষ মূলতঃ দাঁড়িয়ে আছে। এই চরিত্রসৃষ্টি নামক বস্তুটি একান্তভাবেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আদর্শের হাতে-ধরা হয়ে সাহিত্যে প্রবেশ করেছে। নবযুগের মানবতন্ত্রী প্রত্যয়ের অন্যতর অভিব্যক্তি আমরা পাই এ-যুগের গীতি-কবিতায়। ভিন্ন আর-একটি অভিব্যক্তি পাই আধুনিক গল্পে ও উপন্যাসে। গীতি-কবিতায় ব্যক্তির সূক্ষ্ম কামনা-বাসনার রূপায়ণ; উপন্যাসে-গল্পে ব্যক্তির চরিত্রমহিমা প্রকটিত। প্রথমটি মানবতার সুররূপ; দ্বিতীয়টি মানবতার বাস্তব রূপ। এই দ্বিবিধ রূপ একে অপরের পরিপূরক, সে কথা বলাই বাহুল্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাংলা ভাষায় দুই-একটি উপন্যাসবর্গীয় রচনায় দেখা মিললেও* বঙ্কিমচন্দ্রই হলেন বাংলা সাহিতের প্রথম সত্যিকার সার্থক উপন্যাসের স্রষ্টা। আজও উপন্যাস-সৃষ্টির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র অপরাজেয় রয়েছেন বলা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র আত্মপ্রকাশের পর এক শত বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এই একশত বৎসরের মধ্যে বাংলা-উপন্যাসের প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে সন্দেহ নেই, এবং তার রূপকর্ম আর গঠন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হয়েছে যথেষ্ট, সে কথাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের উৎকর্ষের যে মানদণ্ড ও ঐতিহ্য আমাদের সামনে ধরে দিয়ে গিয়েছিলেন

---

* যথা, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস, হানা ক্যাথেরীণ ম্যলেস্‌ রচিত ফুলমণি ও করুণার বিবরণ ও প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুর) আলালের ঘরের দুলাল।

তাকে আজও পর্যন্ত আমরা অতিক্রম করতে পারি নি—এ কথা অপ্রিয় হলেও না মেনে বোধ হয় কারও গত্যন্তর নেই।

আমাদের এ রকম সিদ্ধান্তের কারণ কী, তা একটু বিস্তারিত করে বলি।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রসবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অঙ্গাঙ্গী সম্মেলন ঘটেছিল। গভীর শিল্পানুভূতি আর গভীর মনস্বিতার সমাহারের এই দৃষ্টান্ত পরবর্তী কালের লেখকগণ কর্তৃক খুব বেশী অনুসৃত হয়েছে এমন প্রমাণ নেই। এবং যে অনুপাতে পরবর্তী কালের লেখকগণ কর্তৃক এই আদর্শ উপেক্ষিত হয়েছে, সেই অনুপাতেই তাঁরা অন্যবিধ উৎকর্ষ সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় পশ্চাতে পড়ে আছেন। শরৎচন্দ্রের ভিতর আমরা অসাধারণ লিপিনৈপুণ্য, কাহিনীকথন-ক্ষমতা, দরদ আর আন্তরিকতার পরিচয় পাই; কিন্তু মনস্বিতার আপেক্ষিক অভাবের দরুন তাঁর রচনায় সর্বদাই এক ধরনের ভাবালুতা প্রশ্রয় পেয়েছে, যা নারীমনোহারী হলেও বিচক্ষণ পাঠকের গ্রাহ্য ছিল না। তা ছাড়া শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সংস্কারান্ধতার জয়জয়কার দেখতে পাওয়া যায়। কুলীন ব্রাহ্মণের অনুদার মনোবৃত্তি শরৎচন্দ্রের সব কটি পল্লীকেন্দ্রিক উপন্যাসে আসর জাঁকিয়ে বসে আছে বললেও চলে। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও রক্ষণশীলতা ছিল,—তিনিও তথাকথিত হিন্দুয়ানির সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি; কিন্তু সে রক্ষণশীলতার জাত ছিল আলাদা। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় যে রক্ষণশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, প্রবণতার দিক দিয়ে আমরা তার সমর্থক না হলেও সেই রক্ষণশীলতাকে হেসে উড়িয়ে দেবার জো নেই—তার কারণ সে রক্ষণশীলতার পিছনে সুদৃঢ় মনীষার পটভূমি ছিল, যুক্তিনিষ্ঠার জোর ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মত অসাধারণ পণ্ডিত আর সুধী ব্যক্তি তাঁর শিল্পকর্মের ভিতর অকারণ নীতিবাদের অবতারণা করেন নি। এত বড় সৌন্দর্যপ্রাণ শিল্পী যিনি, তিনি তাঁর উপন্যাসে সংস্কারের খাতিরেই

সংস্কারক সেজেছিলেন—এ কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। যাই-হোক, শরৎচন্দ্রের রক্ষণশীলতা আর বঙ্কিমচন্দ্রের রক্ষণশীলতার মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। শরৎচন্দ্র সন্ন্যাসীই সাজুন আর রেঙ্গুনের বিজাতীয় পরিবেশে দীর্ঘকাল অতিবাহিতই করুন, পৈতেগাছটির মায়া তিনি কখনও ভুলতে পারেন নি, আর সেটি তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে সর্বত্র ফুঁড়ে বেরিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মণ হলেও ওই-জাতীয় সঙ্কীর্ণ বর্ণশ্রেষ্ঠত্বাভিমান থেকে মুক্ত ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের পরবর্তী ধাপে বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক হিসাবে আমরা এই চারজনের নাম করতে পারি—৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বনফুল' ও ৺মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর ভিতর বিভূতিভূষণ মূলতঃ কবিপ্রাণ, নিসর্গচেতনায় ভরপুর, স্নিগ্ধ নিষ্কলুষ ভাবের পরিবেশক। বৃক্ষ-পত্র-পুষ্পলতিকার ঘন জটাজালের অন্তরাল থেকে গ্রামকে তিনি দেখেছিলেন বলে গ্রামের এক অপূর্ব-সুন্দর ভাবরূপ তাঁর মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত হয়েছিল। কল্পনা-কজ্জলীর প্রলেপে প্রলিপ্ত ঘনপক্ষ্ম নেত্রপাতে তিনি যে গ্রামকে অবলোকন করেছিলেন, সে গ্রাম বন্যকুসুমসুরভিত, নিত্যবিহগকূজিত, অনাবিল ভাবরসে বিভোর চিরশিশুর রম্যনিকেতন। এ দেখা রোমান্টিকের দৃষ্টিতে দেখা হলেও এর ভিতর একটা গভীর বাস্তব সত্যের প্রণোদনা আছে। পল্লীর এই ভাবরূপ পল্লীর সর্বদা-দৃশ্য রূপ অপেক্ষা কোন অংশে কম সত্য নয়, কম অপ্রতিরোধ্য নয়। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' যদি খাঁটি গ্রাম-সমাজের চিত্রণ হয়, তবে বিভূতিভূষণের নিশ্চিন্দিপুরও বাংলা দেশের খাঁটি পল্লীচিত্র।

কিন্তু বিভূতিভূষণের লেখার যা গুণাত্মক দিক, সেইটেই তাঁর রচনার ঋণাত্মক দিক। নগর-জীবনের কলকোলাহল থেকে দূরে থাকতে চেয়ে তিনি এ যুগের প্রবহমাণ সমাজচৈতন্যকেও সেই সঙ্গে অস্বীকার করেছেন। নগর-সভ্যতার অস্থিরতা আর জটিলতার

কলুষস্পর্শ থেকে আত্মরক্ষা করে তিনি হয়তো এক ধরনের মানসিক শান্তি লাভে সমর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু এ শান্তি বহু মূল্য দিয়ে কেনা —এইটুকুই শুধু আমার বলবার কথা। গ্রামজীবনের শান্তিতে স্থিত হয়ে তিনি বোধ হয় এ যুগের ভাবধারা থেকে অনেকাংশে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন। হয়তো তাঁর এই নির্বাচন নিছক পল্লীর প্রতি রোমান্টিক আকর্ষণজাত নয়, তার পিছনে অভিজ্ঞতারও যথেষ্ট পোষকতা ছিল—শহর এবং পল্লীজীবনের ভাল মন্দ তৌলদণ্ডে বিধিমতে পরিমাপ করবার পরই সম্ভবতঃ তিনি গ্রামজীবনের প্রতি ঝুঁকেছিলেন; কিন্তু এর পিছনে যে এক ধরনের অব্যাহতিবাদ আছে তাকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না। আসল কথা, বিভূতিভূষণের দৃষ্টির পিছনে কবিত্বের কান্তি ছিল, প্রজ্ঞার জোর ছিল না। তিনি যদি বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রজ্ঞাবাদী লেখক হতেন তা হলে আধুনিক নগর-জীবনের বিচিত্র ভাবাধারার সংঘাতে আলোড়িত-আবর্তিত নতুন চিন্তার আন্দোলনগুলি সম্পর্কে কখনই অনবহিত থাকতে পারতেন না। সত্যকে জানবার উৎকণ্ঠ আগ্রহ থেকেই তিনি আধুনিক কালোচিত সমাজচেতনার অনুশীলনে প্রবুদ্ধ হতেন, নগরকে নিবিড় করে জানবার চেষ্টা করতেন। সত্যের সকল দিক সমানভাবে জানতে না চাইলে যে প্রকৃত সত্যদর্শন হয় না—এই বোধ বিজ্ঞানীর আর প্রজ্ঞাবাদীর সহজায়ত্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এই বোধ সহজাত ছিল, বিভূতিভূষণেরা বঙ্কিমচন্দ্রের পরে জন্মগ্রহণ করেও শুধুমাত্র খণ্ডসত্যের অনুশীলন করে গেলেন। অবশ্য শিল্পসৃষ্টির দিক দিয়ে বিভূতিভূষণের কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি তার তুলনা নেই, কিন্তু বাংলা কথা-সাহিত্যে রস-রসিকতা ও মনীষার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্থল বঙ্কিমচন্দ্রের পাশে আর কেউ, আর কিছুই কি তুলনীয় বলে মনে হয়?

অতঃপর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর বাংলা উপন্যাসে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ আর রকমারি চরিত্রের সৃষ্টি করে বাংলা

কথা-সাহিত্যের পরিধির দৃষ্টিগ্রাহ্য সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন। বীরভূম মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের গ্রামীণ অধিবাসীদের জীবনযাত্রার ছবি তুলে ধরে তিনি ইংরেজী সাহিত্যে হার্ডির মত বাংলায়ও আঞ্চলিক সাহিত্যের একটি সুস্পষ্ট ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন বলা যায়। এঁর চরিত্রগুলি জীবন্ত, জীবনের গভীরে প্রবেশ করবার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা লেখকের আছে। তা ছাড়া মানবীয় সহানুভূতিতেও তারাশঙ্করের হৃদয় সবিশেষ পরিপূর্ণ, তৎকৃত চরিত্রচিত্রণের ধারা লক্ষ্য করলেই সেটি বোঝা যায়। আর একটি মহৎ বৈশিষ্ট্য লেখকের আছে, সেটি হচ্ছে মানবচরিত্রের মিশ্র অনুভূতির উদ্‌ঘাটন। সু ও কু, আলো ও আঁধার, পাপ ও পুণ্য মিলে মানুষের যে দ্বৈত সত্তা, সেই জটিলতার উন্মোচনে লেখকের কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। এ ধারা শেক্‌স্‌পীরীয় ধারা, এই ধারার অনুবর্তন করে তারাশঙ্কর মহান্ পূর্বসূরীর উত্তরসাধনার সংস্কার বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবেই প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু এত কথা বলার পরও একটি কথা থেকে যায়। সে হচ্ছে, লেখক বিদ্যা ও বুদ্ধিবৃত্তি তথা মনীষার তেমন অনুশীলন করেন নি বলে তাঁর লিপিভঙ্গীর মধ্যে কেমন একটা স্থূলতা রয়ে গেছে। তাঁর রচনারীতি পাঠককে আকর্ষণ করে না, বরং সময়ে সময়ে বিমুখ করে, ক্লান্ত করে। বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জনা করবার তেমন গরজও দেখা যায় না লেখকের, ফলে নাগরিক জীবনের বৈদগ্ধ্য আর সাংস্কৃতিক ঔদার্য সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে তিনি কাজে লাগাতে পারলেন না। তারাশঙ্কর বাংলা উপন্যাসে আধুনিক কালের পটভূমিতে গ্রামীণ সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিকার। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব, ফল-কথা, নাগরিক সংস্কৃতির প্রভাব, এঁর উপর সামান্যই বর্তিয়েছে; তিনি কথা-সাহিত্যের মাধ্যমে মুখ্যতঃ লোকসংস্কৃতির ধারাটিরই অনুসরণ করে চলেছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট প্রবীণ সমালোচক তারাশঙ্করকে 'গ্রামবাংলার চারণ কবি'

আখ্যায় আখ্যাত করেছেন। এটিই তারাশঙ্কর-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের উপযুক্ত পরিজ্ঞাপক অভিধা।

বনফুলের রচনারীতি, ভাষাভঙ্গী অতি চমৎকার। লিপির ভিতর মার্জিতবুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট। এঁর অধ্যয়ন ব্যাপক, ঐতিহ্যবোধ প্রখর, আঙ্গিকের জ্ঞান পাকা, কাহিনীর বিন্যাসে চাতুর্য (smartness) প্রত্যক্ষ। তারাশঙ্করের তুলনায় এঁর ভাষা বহুগুণে বেশী উপভোগ্য, হওয়াই স্বাভাবিক, কেন না এঁর রচনারীতির ভিতর বিদ্যাবুদ্ধির সুস্পষ্ট কর্ষণা রয়েছে, যেটি বঙ্কিমচন্দ্রেরই আদর্শের উত্তরসাধনার ফল। বনফুলের বাস্তবতাও উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু তারাশঙ্করের ভিতর যে মানবীয় দরদ রয়েছে তা বনফুলে নেই, ফলে বনফুলের বাস্তবতা এক-এক সময় বড্ড বেশী নির্মম আর হৃদয়হীন বলে মনে হয়। বনফুলের ভিতর বঙ্কিমচন্দ্রের ধাঁচের সমালোচনা-প্রয়াসও লক্ষণীয়। কিন্তু এ সমালোচনা-বৃত্তির মধ্যে অসহিষ্ণুতা আছে, মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের মানসগঠনের নির্লিপ্ততা নেই। প্রজ্ঞা, মনীষা, দার্শনিকতার অনুশীলনে পরবর্তী কালের সকল লেখক বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা অনেক—অনেক খাট ; ফলে বঙ্কিমোত্তর সাহিত্যে art work-এরই সমধিক প্রাধান্য দেখতে পাচ্ছি, art ও wisdom-এর উচ্চতর যুগ্ম সম্মেলন বড় একটা চোখে পড়ে না।

এর পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি একজন স্বভাবকুশলী শিল্পী। এঁর অন্তর্নিবেশের ক্ষমতা ছিল অতি প্রগাঢ়, মনস্তত্ত্বজ্ঞান গভীর। মানুষের মনকে ছিঁড়ে-ফেঁড়ে তছনছ করে বিশ্লেষণ করে দেখানোর ব্যাপারে বাংলা কথা-সাহিত্যে এঁর জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তবতাবোধও ছিল অতিশয় তীক্ষ্ণ। সাম্প্রতিক মধ্য আর নিম্নমধ্য-বিত্ত বাঙালী জীবনের অবক্ষয়ের বাস্তব চিত্র এমন নিষ্ঠুর সত্যনিষ্ঠা নিয়ে আর কেউ ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর আত্যন্তিক বাস্তবনিষ্ঠাই

তাঁর কাল হয়েছিল। ওই বাস্তবতা-প্রীতির সূত্র ধারণ করে তিনি বাস্তবতার এমন এক অন্ধকার পাতালগর্ভে অবতরণ করেছিলেন, যেখান থেকে সৌন্দর্য আর আনন্দের আলো-হাওয়ায় পুনরায় উত্তীর্ণ হতে অপরিসীম প্রজ্ঞাশক্তির দরকার। সে প্রজ্ঞা তাঁর ছিল না। তিনি নিজেরই অজ্ঞাতসারে কুটিল মননের পাকে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি ক্লেদরতির পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছিলেন। প্রজ্ঞা ও ঋষি-দৃষ্টির দ্বারা লভ্য নিরাসক্ত দর্শন আয়ত্ত না করলে ক্লেদরতির ফলে লেখকের কী দুর্গতি হতে পারে, মানিকের সাহিত্য ও জীবন তার অকাট্য প্রমাণ।

মানিক-সাহিত্য সম্পর্কে আমি আমার 'সমকালীন সাহিত্য' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, সুতরাং এখানে এ সম্বন্ধে আর অধিক বক্তব্যবিস্তারের আবশ্যকতা দেখি না।

বাকী রইলেন—রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ কালানু-ক্রমে না সাজিয়ে সর্বশেষে উপস্থাপিত করবার একটা কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে একক বৈশিষ্ট্যের ধারক। বঙ্কিমচন্দ্রের মনোগঠনের সঙ্গে যেমন তাঁর মিল নেই, তেমনি পরবর্তী কালের লেখকদের সঙ্গেও তাঁর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর উপন্যাস কবিধর্মিতার দ্বারা বিশেষরূপে মণ্ডিত। ভাষার লাবণ্য ও মাধুর্যে, প্রণয়চিত্রণের কমনীয়তায়, একাধিক নিষ্কলুষ, শুচি-সুন্দর চরিত্রের (পরেশবাবু, নিখিলেশ, যোগমায়া দেবী, বিপ্রদাস প্রভৃতি) প্রবর্তনায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে কবিকর্মের ছাপ এত স্পষ্ট যে, সে-বস্তুর পূর্ব-নজির কিংবা ধারাবাহী উদাহরণ খুঁজতে গেলে আমাদের বিফল হতে হবে। কিন্তু কবিস্বভাব প্রধান হলেও রবীন্দ্রনাথের ভিতর মনস্বিতাও বড় কম নয়। মনীষার অনুশীলন তিনিও কিছু কম করেন নি, যদিও এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের মেধা উচ্চতর ছিল সে কথা স্বীকার করতেই হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিকতার শিক্ষাও রবীন্দ্রনাথের চেয়ে

গভীরতর ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মত রবীন্দ্রনাথ প্রণালীবদ্ধভাবে দর্শনের চর্চা করেছিলেন কি না সন্দেহ, অন্ততঃ তাঁর লেখায় এই চর্চার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে রবীন্দ্রনাথের ছিল পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপর একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় (sixth sense), যাকে ভাষান্তরে আমরা তৃতীয় নয়ন আখ্যা দিতে পারি। এই তৃতীয় নয়ন বা কবিদৃষ্টির প্রসাদে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক শিক্ষার অপূর্ণতা শোধিত হয়ে গিয়েছিল মনে করা যেতে পারে। সে যাই হোক, বাংলার ঔপন্যাসিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই একমাত্র শিল্পী, যিনি প্রজ্ঞা ও মনস্বিতার অনুশীলনে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সমপংক্তির সাযুজ্য দাবি করতে পারেন, আর সব কথা-সাহিত্যিক এইক্ষেত্রে বহুদূর পিছনে পড়ে আছেন। তাঁদের বেলায় ফলটাও হয়েছে তাদানুপাতিক। তাঁরা কেউ বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারেন নি। রসবুদ্ধি, কবিত্ব আর প্রজ্ঞার একত্র সমাহার হলে উপন্যাসে কী বিস্ময়কর বস্তু সৃষ্টি করা যায় তার প্রমাণ 'গোরা'। এই একটি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্যান্য উপন্যাস-কীর্তিকে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ করে দিয়ে অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত অনন্য সৃষ্টিকর্মের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এই উপন্যাসের দ্বারা রবীন্দ্র-নাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সমাসনের অধিকারী হয়েছেন, যদিও এই একটিমাত্র উপন্যাসের মধ্যেই সেই অধিকার সংকুচিত হয়ে আছে বলা দরকার। 'গোরা'র উৎকর্ষের কারণ, এর ভিতর বঙ্কিমচন্দ্রের মতই প্রখর রসবুদ্ধির সঙ্গে প্রখর মনীষার সংযোগ ঘটেছে। রসবুদ্ধির সঙ্গে মনীষার সমন্বয় না ঘটলে যে প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস তৈরী হয় না, আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তই তার প্রমাণ। বিদেশী সাহিত্য থেকেও এরকম বহুতর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—আমাদের সাহিত্যের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণেই দেওয়া যায়—কেন না, ইংলণ্ড বা ইউরোপের অন্যান্য খণ্ডের বিশিষ্ট লেখকেরা নিরবচ্ছিন্ন

রসবুদ্ধিরই শুধু অনুশীলন করেন না, সেই সঙ্গে বিদ্যাবত্তা আর জ্ঞানেরও অনুশীলন করেন। সে দেশের প্রত্যেকটি শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক একাধারে বিশিষ্ট শিল্পী ও বিশিষ্ট দার্শনিক। তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব বিশেষ চিন্তা আছে, সেই চিন্তা দার্শনিকদের রচনাবলীর সঙ্গে গভীর পরিচয়ের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে। রস ও জ্ঞানের যুগপৎ চর্চা করেছেন বলেই টলস্টয়, ডস্টয়েভ্স্কী, টমাস মান, আনাতোল ফ্রাঁস, রমাঁ রলাঁ, আঁদ্রে জিদ, মোরিয়াক প্রমুখের রচনা এমন অপ্রতিরোধ্য হতে পেরেছে। তাঁরা যদি তাঁদের কল্পনার অভিব্যক্তির জন্য নিছক রসবুদ্ধির উপর নির্ভর করতেন তা হলে কখনও তাঁদের রচনা বিচক্ষণ পাঠকের ভোগ্য হত না, ব্যাপক সমাদরের দ্বারা সংবর্ধিত হত না। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের (বিশেষ করে 'গোরা') বেলায় ওই একই কথা বলা যায়।

আমাদের কথা হল, কথা-সাহিত্যেই হোক আর অন্যবিধ শিল্পকর্মেই হোক, অশিক্ষিতপটুত্বের দিন চলে গেছে। নাগরিক সংস্কৃতির আদর্শের বর্তমান ক্রমপ্রসারের দিনে শিল্পক্ষেত্র থেকে এই অশিক্ষিতপটুত্বের ধারণা যত শীঘ্র দূর হয় ততই মঙ্গল। সাহিত্যের অগ্রগতির পক্ষে অশিক্ষিতপটুত্বের আদর্শ অতীব ক্ষতিকর। কোন এক অদৃশ্য গোপন অজ্ঞাত আবেগের উৎস থেকে বিধাতার অভিপ্রায় অনুযায়ী শিল্পকর্মের স্রোত স্বতঃ-উৎসারিত হয় এবং দৈবনিয়তির দ্বারা শিল্পীর জীবন চালিত হয়—শিল্পের এই স্বয়ংক্রিয় উৎসারের তত্ত্বে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি যে, শিল্পীকে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের গৌরবের অধিকারী হতে হলে প্রভূত পরিমাণ অনুশীলন আর অধ্যবসায়ের দ্বারা নিজেকে সেইভাবে প্রস্তুত করে তুলতে হয়, সজ্ঞান-সযত্ন প্রয়াসে ধাপে ধাপে উৎকর্ষের উচ্চগ্রামে আরোহণ করতে হয়। অনুশীলনের দ্বারা শুধু যে মস্তিষ্কের ক্ষমতাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাই

নয়, সময় সময় অনুশীলনকারীর মধ্যে মৌলিকতারও পরিস্ফুরণ হয়; অর্থাৎ যেখানে মৌলিকতা ছিল না সেখানে মৌলিকতার আবির্ভাব হয়। একাগ্র চর্চার দ্বারা কল্পনাশক্তির উদ্বোধনের দৃষ্টান্তেরও অসদ্ভাব নেই। শুধু রসবুদ্ধির অনুশীলন করলেই শ্রেষ্ঠ শিল্পোৎকর্ষের স্তরে পৌঁছানো যায় না, সেই সঙ্গে জ্ঞানেরও অনুশীলন করতে হয়। এই সমন্বয়ের আদর্শ যে-শিল্পীর শিল্পকর্মের মধ্যে রূপ পায় নি, বুঝতে হবে সেই শিল্পী শিল্পের খণ্ডিত আর অসম্পূর্ণ আদর্শ অবলম্বন করে আছেন, এবং বলাই বাহুল্য, তাঁর রচনার আবেদনও তদনুরূপ খণ্ডিত আর অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। বিচক্ষণ পাঠকের আগ্রহ আর অভিনিবেশ আকর্ষণ করতে হলে রস-রসিকতা আর মনীষার সংযুক্ত ভিত্তিভূমির উপর শিল্পীকে আত্ম-প্রতিষ্ঠ হতে হবে, একটিকে বাদ দিয়ে আর একটিকে প্রাধান্য দিতে গেলে শিল্পসৌধ যে কোন মুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে।

বর্তমান কালের একটা প্রধান মুশকিল হয়েছে এই যে, স্পেশালাইজেশনের ব্যাধি আমাদের সকলকেই অল্পবিস্তর পেয়ে বসেছে। নিজ নিজ ক্ষমতার খাটো মাপ অনুযায়ী প্রত্যেকেই স্পেশালাইজেশনকে মনোমত আদর্শরূপে নিজের হাতের মুঠোর ভিতর পেয়েছেন। এমন অখণ্ড সতীপনা পূর্বে ছিল না। আজকাল যিনি গল্প বা উপন্যাস চর্চা করেন তিনি শুধু গল্প বা উপন্যাসেরই চর্চা করেন, সেই সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির সমানুপাতিক অনুশীলনের প্রয়োজন বোধ করেন না। ফল যা হবার তা-ই হয়। উপন্যাস-চর্চার নামে শুধু তথাকথিত রম্যকাহিনীরই চর্চা হয়, আর কিছুর চর্চা হয় না। অবশ্য এ মন্তব্যের বিপরীতে দু-একটি ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত আছেন—যথা, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুবোধ ঘোষ, দীপক চৌধুরী প্রভৃতি। আধুনিক গোত্রের লেখকদের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র এই লেখকেরাই রসবুদ্ধি ও মননশীলতার

যুগ্ম আদর্শ সামনে ধরে রেখে বলিষ্ঠ ভঙ্গিমায় কথা-সাহিত্যের চর্চা করছেন। এঁদের রচনারীতির আসল জোরই হল এখানে যে, এঁরা মননশীল লেখক, নিছক কাহিনীরসের রসায়নে এঁরা এঁদের লেখনীকে নিমজ্জিত করে রাখেন নি। কিন্তু বাদবাকী আর প্রায় সবাই চটুল রম্যতার কারবারী। তাঁদের মননশীলতার বালাই নেই, সে সম্বন্ধে মাথাব্যথাও বিশেষ নেই। সবাই সস্তা আত্ম-তৃপ্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে বসে আছেন। উপযুক্ত কর্ষণার অভাবে বুদ্ধিবৃত্তি যথেষ্ট পরিমাণে উঁচু সুরে বাঁধা না থাকায় এঁদের মনোভঙ্গীর ভিতর আদর্শবাদী অভীপ্সা মোটে জায়গা পায় না, ফলে নিতান্ত তুচ্ছ নগণ্য খুঁটিনাটি বৃত্তান্তের উপর মনোযোগ স্থাপিত হয়ে তাঁদের শিল্পশক্তিকে অযথা ক্ষয় করতে থাকে। এই একবর্ত্মাভিমুখী কাহিনীরসের অনুশীলনে যে প্রকৃত শিল্পানু-ভূতির চরিতার্থতা নেই, সে কথা সাম্প্রতিক কালের কথা-সাহিত্যিকদের বিশেষভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

সাহিত্যে উপন্যাসের স্থান

সাহিত্যের নানা বিভাগ আছে—কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা, ভ্রমণ-কাহিনী, স্মৃতিকথা, ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী, ব্যঙ্গ ও কৌতুকচিত্র ইত্যাদি এবং সর্বশেষে—বর্তমানের তথাকথিত রম্যরচনা। এই বিভিন্ন বিভাগগুলির তুলনামূলক আলোচনায় অনেক কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য যেমন উদ্‌ঘাটিত হওয়া সম্ভব তেমনি অগ্রপ্রাধান্যের বিচারে তাদের কার কোথায় স্থান সে মূল্যায়নটিও নিষ্পন্ন হতে পারে বলে মনে করি। বর্তমান নিবন্ধে এ-জাতীয় মূল্যায়নের একটা প্রাথমিক চেষ্টা করা যেতে পারে।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, উপরের বিভাগগুলির প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র রূপ ও রীতি আছে। এই রূপ ও রীতি ক্ষেত্রবিশেষে বহু বহু শতাব্দীর, ক্ষেত্রবিশেষে মধ্য যুগের, ক্ষেত্রবিশেষে নিতান্ত হাল আমলের কনভেনশনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। মানুষের আত্মপ্রকাশের চেষ্টার ক্ষেত্রবদলের জন্যই এরূপ হয়েছে। আত্মপ্রকাশের নানা ভঙ্গিমা আছে। সাহিত্যের আত্মপ্রকাশ একান্তভাবেই শব্দাশ্রয়ী। শব্দই সাহিত্যের প্রাণ। কিন্তু কল্পনা, অনুভূতি ও চিন্তার বৈচিত্র্য অনুসারে এই শব্দ কত বিচিত্র ছাঁদেই না প্রকাশিত হয়। কখনও এই শব্দ অপূর্ব ছন্দোবদ্ধ ও ধ্বনিমধুর, কখনও তা মূলতঃ সংলাপাশ্রিত, কখনও আখ্যান ও বর্ণনা-ধর্মী, কখনও চিন্তাকেন্দ্রিক, কখনও আর-কিছু। শব্দের অর্থগত পার্থক্য ও শব্দ সাজাবার রীতির পার্থক্য অনুযায়ী মূলতঃ এই বিভিন্ন বিভাগীয় রূপভেদগুলি গড়ে উঠেছে। কবিতায় আমরা যে ভাবে শব্দ সাজাই নাটকে বা উপন্যাসে সে ভাবে সাজাই না। নাটকে যদি বা সাজাই, তার অর্থগত ব্যঞ্জনা অন্যরকম। নাটকে

সর্বপ্রকার শব্দসজ্জার লক্ষ্য থাকে কোন একটা বিশেষ পরিণতির দিকে ঘটনার প্রবাহকে অনিবার্য বেগে টেনে নিয়ে যাওয়ায়। কাব্যের বেলায় কবির সে রকম কোন অভিপ্রায় থাকে না। প্রথমতঃ ঘটনা কবিতার পক্ষে আবশ্যিক নয়, দ্বিতীয়তঃ ঘটনা-পরম্পরার কার্যকারণ নির্ণয় কবির কাজ নয়। কবি বিশুদ্ধ ভাবের কারবারী, বিশুদ্ধ ভাবেই তাঁর স্থিতি ও স্ফূর্তি। মহাকাব্য, ঐতিহাসিক কাব্য, কাহিনীকাব্য জাতীয় পৃথুল ও ভারবহুল কাব্যরচনায় ঘটনার একটা বিশেষ স্থান আছে সন্দেহ নেই; কিন্তু সেখানেও ঘটনা রচনার মূল উপজীব্য নয়, ঘটনার অন্তর্নিহিত কাব্যসৌন্দর্য সন্ধান করা ও তাকে ফুটিয়ে তোলাই হল রচয়িতার প্রধান কাজ। ঘটনার অন্তরে যেখানে সংঘাত ও সংঘর্ষের ভাবটিই বড়, অর্থাৎ নাটকীয়তাই যেখানে ঘটনাবলীর বৈশিষ্ট্য, সে স্থলে নাটকের আঙ্গিকে ভাব প্রকাশ করাটাই রীতি।

বলা নিষ্প্রয়োজন, লেখকের মানসিক গঠন ও রুচি অনুযায়ী তাঁর পক্ষপাত নিয়ন্ত্রিত হয়। কাব্য নাটক উপন্যাস সমালোচনা-সাহিত্য প্রভৃতি বিভাগের কোন্‌টিকে কে অবলম্বন করবেন তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট সাহিত্যকর্মীর সহজাত প্রবণতার উপর। আর সহজাত প্রবণতার দ্বারাই যে মানুষের সামর্থ্য-অসামর্থ্য মুখ্যাংশে নিয়ন্ত্রিত হয় তা আশা করি বলার অপেক্ষা রাখে না। যে মানুষ আত্মলীন হয়ে থাকতে ভালবাসেন এবং কল্পনার পাখায় ভর করে আকাশে আকাশে ভেসে বেড়াতে গভীর আনন্দানুভব করেন তাঁর পক্ষে কবিতার আকর্ষণ কাটানো কঠিন। এই শ্রেণীর রচয়িতার পক্ষে গীতি-কবিতাই হল আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। কিন্তু যে কবির মন বহির্মুখী, অর্থাৎ শব্দান্তর্গত ছন্দ ও ধ্বনির দোলায় স্বভাবতঃ মন বিমোহিত হলেও যে কাব্যরচয়িতা আপনাতে-আপনি-নিবদ্ধ হয়ে থাকার চাইতে বাহিরের দৃশ্য ও ঘটনায় স্বভাবের সমধিক স্ফূর্তি বোধ করেন, তিনি অবধারিত ভাবে কাহিনী-কবিতা

(narrative poems) কিংবা বর্ণনাত্মক কবিতার (descriptive poems) প্রতি আকৃষ্ট হবেন। মহাকাব্য অবশ্য এই দুইয়েরই এক যৌগিক সংমিশ্রণ, তাতে যেমন জায়গায় জায়গায় আত্মার গহনগোপন গুহা হতে উৎসারিত গভীর ভাবের কথা ছড়িয়ে থাকে, তেমনি স্থূল ঘটনার বর্ণনারও কিছু অসদ্ভাব নেই। তথ্য এবং তত্ত্ব, কাহিনী এবং কল্পনা, কর্ম এবং ভাব, দেহ এবং আত্মা—এই দুইই মহাকাব্যের ভিতর অল্প-বিস্তর সম পরিমাণে বিধৃত। মহাকাব্য একাধারে দর্শন, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, পুরাণ ও কাব্য। ঋষিকল্প কবিই শুধু এই শ্রেণীর রচনার প্রতি পূর্ণ সুবিচার করতে পারেন।

অন্য পক্ষে নাট্যকার হলেন কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র ধরনের শিল্পী। স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট। গীতি-কবির ন্যায় নাট্যকার বিশুদ্ধ ভাবের পরিবেশক নন। আবার কাহিনীকার কবির মত তিনি নিরবচ্ছিন্ন ঘটনাজীবী শিল্পীও নন। ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আবর্তে অবস্থার ক্রীড়নক যে মানবভাগ্য, সেই আলোড়িত-সংক্ষুব্ধ-বিপর্যস্ত মানবভাগ্যের রূপকার তিনি। নাট্যকার কবি, মানবচরিত্রাভিজ্ঞ, লোকশিক্ষক। তাঁর বিভাগীয় কলাকারুর ভিতর গভীর শিল্পপ্রাণতা বর্তমান। সুনিবিড় রসবোধ এবং মননশীলতা এক আধারে যুক্ত হলে তবেই বুঝি সার্থক নাট্যকার হওয়া যায়। নাট্যকারের মননশীলতা তত্ত্ব-ঘেঁষাও বটে। তত্ত্বাশ্রয়ী সমস্যাপ্রধান নাটকের রূপায়ণে তাঁর অনীহা নেই। মহাকাব্যকারের মত নাট্যকার হয়তো গূঢ় তত্ত্বজ্ঞানী নন বা ক্রান্তদর্শী ঋষি নন, তবে মহাকাব্য-কারের মত তিনিও জীবনের মৌলিক তাৎপর্য সন্ধান ও আবিষ্কারের সাধনায়ই মুখ্যতঃ ব্রতী। গ্রীক নাটকে বিরূপ ভাগ্য-পুরুষের (Nemesis) উপর যে গুরুত্ব আরোপিত হয়ে থাকে তা অহেতুক বা আকস্মিক নয়, তা একটি সুস্পষ্ট জীবনদর্শন হতে উদ্ভূত। ভবিতব্যবাদ এই জীবনদর্শনের মূল কথা। কিংবা আধুনিক

পাশ্চাত্ত্য নাটকে নাট্যবর্ণিত চরিত্রের উপর আবেষ্টনীর প্রভাব ফোটাতে গিয়ে আবেষ্টনীর প্রতি যে সবিশেষ মর্যাদা আরোপ করা হয় তারও মূল এ যুগের একটি বিশিষ্ট তত্ত্বের মধ্যে বিধৃত। প্রকৃত পক্ষে, প্রতিটি সমস্যাপ্রধান নাটকের পরিকল্পনার ভিতর এই তত্ত্ব গভীরভাবে অনুস্যূত হয়ে আছে। বিচক্ষণ পাঠক নিশ্চয় অনুমান করতে পেরেছেন এই তত্ত্বাংশের ভিতর আবেষ্টনীর বা পারিপার্শ্বিকের প্রভাব একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে।

যাই হোক, কাব্য এবং নাটকের ভিতর অগ্রপ্রাধান্য নিরূপণের সমস্যা বড় সহজ সমস্যা নয়। দুইয়ের রূপই অতি প্রাচীন এবং দুইয়েরই মর্যাদা সমান অব্যাহত। তবে দেশভেদে এই দুইয়ের প্রভাবের উচ্চাবচ অবস্থা বিচার করা যেতে পারে। আমাদের মনে হয় পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে নাটকের মর্যাদা কাব্যের চেয়ে বেশী; পক্ষান্তরে প্রাচ্য দেশগুলিতে নাটকের তুলনায় কাব্যের মর্যাদা অধিক স্বীকৃত। এ রকম হবার কারণ আছে। পাশ্চাত্ত্যের জীবনাদর্শের মধ্যে সংঘাতের ভাবটি অন্তর্লীন হয়ে আছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংঘাত এবং মানুষে মানুষে সংঘাত পাশ্চাত্ত্যের জীবনযাপন-প্রণালীর মধ্যে প্রবল একটা কর্মোন্মাদনার সৃষ্টি করেছে। প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন বাধা অতিক্রমণের চেষ্টার মধ্যে যে দুর্জয় পৌরুষের ভাব নিহিত আছে সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী পৌরুষ পাশ্চাত্ত্যের জীবনভঙ্গির ভিতর বিরাট অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে। পশ্চিম শান্তরসের সাধক নয়, তার অস্তিত্বের পরতে পরতে প্রমত্ততা ও চাঞ্চল্য নিত্যবহমান। পশ্চিমের মানুষের চলা ও বলার মধ্যে সব সময় যেন একটা tension থমথম করছে। শীতের দুরন্ততা, প্রকৃতির অসহযোগ, রুক্ষ-কঠোর জীবন-সংগ্রাম প্রভৃতি নানাবিধ প্রতিকূলতার দ্বারা প্রতিহত হয়ে মানুষ সেখানে চলার লয়ের ভিতর দুর্নিবার গতিবেগ লাভ করেছে। এ লয় বিষমপদী, তাই তার গাঁটে গাঁটে আকস্মিকতা, বাঁকে বাঁকে

অপ্রত্যাশিতের চমক। পশ্চিমী জীবন মসৃণ ছন্দে চলে না, ছুল্‌কি চালে চলে। তার সঙ্গীতের মত তার সাহিত্যও বাদী বিবাদী সম্বাদী নানাবিধ বিসদৃশ সুরের এক মস্ত ঐকতানলীলা। পশ্চিমী জীবনের এই অস্থিরতার ভাবটিকে আরও বাড়িয়েছে সেখানকার মানুষের হিংসাশ্রয়ী মনোভাব। পশ্চিমের, বিশেষ করে ইউরোপের, মানুষ Tooth for tooth, eye for eye-এর নীতিতে বিশ্বাসী। অপ-উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্য তো বটেই, মহৎ-উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্যও সেখানে হিংসা-নীতির বৈধতা স্বীকৃত। শারীরিক বলপ্রয়োগের আদর্শের মধ্যে পশ্চিমীরা এক ধরনের মহিমা দেখতে পায়, যা আমরা প্রাচ্যদেশবাসীরা আদৌ দেখতে পাই না। যুদ্ধ-বিগ্রহকে আমরা প্রচণ্ড এক অভিশাপ মনে করি, পশ্চিমীরা তা মনে করে না। আমরা জীবনযাপন-প্রণালীতে সারল্যের পক্ষপাতী, সোয়াস্তির পক্ষপাতী, আমাদের অভাব-অভিযোগ অল্পতেই তৃপ্ত ; পক্ষান্তরে, স্বাচ্ছন্দ্য আর বিলাসভোগের অত্যুগ্র আগ্রহে উপকরণের পর উপকরণ স্তূপীকৃত করতে গিয়ে পশ্চিমের মানুষ কাজ আর কাজ আর কাজের নীতিকেই জীবনের সার বলে জেনেছে। এক ধরনের জ্বরতপ্ত কর্মচাঞ্চল্য আর বেগের তাড়না যে-কোন-মূল্যে-আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী সংগ্রামতৎপর পশ্চিমের মানুষের মনে একটা নিত্য অশান্ততার জন্ম দিয়েছে। ছলে হোক বলে হোক প্রতিযোগিতায় জয়লাভেই যেন জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা।

দৃষ্টিভঙ্গির এই-যে পার্থক্য, এই পার্থক্য উভয় ভূখণ্ডের সাহিত্যাদর্শের মধ্যেও সম্যক্ প্রতিফলিত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য জীবনযাত্রার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অশান্ততার বিক্ষেপ, তাই অ্যাকশন এবং সংঘাত সে সাহিত্যের প্রাণ। অর্থাৎ নাট্যসাহিত্যই পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডের আসল সাহিত্য। নাট্যসাহিত্যে কাব্য এবং কাহিনী, চিত্র এবং চরিত্র, বর্ণন এবং মনন অতিশয় শিল্পসম্মত সামঞ্জস্যের ভিতর

গ্রথিত বলে মানুষ যেন নাটককেই তার সবচেয়ে প্রাণের জিনিস বলে গ্রহণ করেছে। প্রাচীন গ্রীক নাটকের যুগ থেকে তৎপরবর্তী রোমক নাট্যকারদের মধ্য দিয়ে ইংলণ্ডের গ্রীন, শেক্সপীয়র, মার্লো, বেন জনসন, শেরিডান, ফ্রান্সের মলেয়ার, জার্মানির গ্যেটে ও শিলার, রাশিয়ার পুস্কিন, গোগোল, শেখভ, আন্দ্রিয়েভ ও গোর্কি, সুইডেনের বিয়র্নসন ও নরওয়ের ইবসেন হয়ে একেবারে আধুনিক কালের প্রান্তে এসে আমরা পাচ্ছি পিরানদেল্লো, স্ট্রিণ্ডবার্গ, বার্নার্ড-শ', গলসোয়র্দি, ব্যারী, মম, নোয়েল কাউয়ার্ড, ইউজীন ও'নীল প্রমুখ প্রসিদ্ধ নাট্যকারদের। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে নাট্যরচনার সে এক বিশাল ঐতিহ্য, নাট্যকারদের সে এক বিরাট মিছিল! এখন পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে শেক্সপীয়র শুধু শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে নয়, কবিরূপেও সম্মানিত ও পূজিত। শেক্সপীয়রের ভাবসাম্রাজ্য দেশে দেশে প্রসারিত। যে 'ফাউস্টে'র জন্য গ্যেটের কীর্তি বিশ্ববিশ্রুত, সেই ফাউস্ট একখানি নাট্যকাব্য। এ যুগের সীমায় আমরা দেখতে পাই, শুধু মাত্র নাট্যরচনার কৃতিত্বের জন্য পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডের একাধিক শিল্পী নোবেল-পুরস্কার অধিকার করেছেন। বিয়র্নসন, পিরানদেল্লো, বার্নার্ড-শ', ইউজীন ও'নীল এ কথার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এঁদের সকলেরই নাটকে অল্প-বিস্তর কাব্য তত্ত্ব জনশিক্ষা সমস্যাচেতনা পাশাপাশি ছড়ানো রয়েছে।

আমরা প্রাচ্যদেশবাসী মানুষ জীবনে ও সাহিত্যে উভয়তঃ শান্তরসের সন্ধানী। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সাহিত্য নিরাভরণ সহজতার সুরে বাঁধা। কাব্যের প্রকৃতি মূলতঃ শান্তরসাশ্রিত, তাই কাব্যই যেন আমাদের মেজাজের সঙ্গে বিশেষ মেলে। যেখানে সংঘাতের অবসান, সামঞ্জস্যের সূচনা, সেই সীমাচিহ্ন থেকে আমাদের যাত্রার শুরু। বিভেদকে ঐক্যের মধ্যে, বিসংবাদকে সামঞ্জস্যের মধ্যে মেলানোই আমাদের কবিদের কাজ।

আমাদের সঙ্গীতে যেমন, কাব্যেও তেমনি বিবাদী সুর সর্বাংশে বর্জিত। তাই শান্তরসের উদ্‌গাতা ঋষি বাল্মীকি আমাদের আদি-কবিও বটেন, অদ্যাবধি শ্রেষ্ঠ কবিও বটেন। বাল্মীকি-রামায়ণের প্রভাব ভারতবাসীর মনোজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। ব্যাসদেব, কালিদাস ভবভূতি এবং একালের রবীন্দ্রনাথ সবাই তাঁদের কাব্যে সব ছাড়িয়ে শান্ত সৌন্দর্যেরই অনুধ্যান করেছেন। কল্যাণ ও শান্তিকেই তাঁরা জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে বরণ করে নিয়েছেন। মহাভারতের ভিতর যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা প্রচুর আছে, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, যুদ্ধ-বিগ্রহের অসারতাই তাতে বর্ণিত হয়েছে। মহাভারতের সমাপ্তির দিকের ঘটনাবলী যুদ্ধ আর হিংসার প্রচণ্ড ব্যর্থতার উপর এক মূল্যবান টীকা। গীতায় ক্ষেত্রবিশেষে, অর্থাৎ অমঙ্গলের নিরাকরণের উদ্দেশ্যে যুদ্ধের প্রয়োজন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারা যতই প্রত্যয়সিদ্ধরূপে প্রতিপাদিত হোক না কেন, শেষ অবধি কুরু-পাণ্ডবের ওই প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে মহাভারতকার উপসংহার-পর্বগুলিতে নির্মম ব্যঙ্গ করেছেন। এইখানেই ভারতীয় কাব্যরচয়িতাগণের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ও পাশ্চাত্ত্য কাব্যরচয়িতা-গণের সঙ্গে তুলনায় স্বাতন্ত্র্য। ভারতীয় মহাকবিগণ শুধুমাত্র কবি নন, তাঁরা ঋষি, ধ্যানী, সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ। আমাদের কবিদের এই মহিমময় রূপ প্রত্যক্ষ না করলে তাঁদের সত্যপরিচয় আবৃত থাকে। ভারতবাসীর দৃষ্টিতে কাব্য শুধুমাত্র সাহিত্যের আদিরূপই নয়, সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রূপও বটে। সেই কারণে কবির সম্মান এ দেশে সকল স্তরের শিল্পীর সম্মানের উপরে। কবিকে আমরা দৈবানুগ্রহ সেবিত বাণীর শ্রেষ্ঠ সাধক মনে করি এবং যাঁরা এই সাধনায় সিদ্ধকাম অর্থাৎ সিদ্ধবাক্ হয়েছেন তাঁদের আমরা মাথায় করে রাখি। এ যুগে রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর কাছ থেকে যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেলেন তেমন ব্যাপক সম্মান কি আর কেউ আকর্ষণ করতে পেরেছেন ?

সংস্কৃত-সাহিত্যে একাধিক নাটক আছে। সেগুলির অধিকাংশেরই শিল্পসৌন্দর্য অনস্বীকার্য, কিন্তু যতই উৎকর্ষমণ্ডিত হোক সংস্কৃত-সাহিত্যে নাটক কখনও কাব্যের মাথা ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠতে পারে নি। কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাট্যরচনা হিসাবে অতিশয় মনোজ্ঞ, কিন্তু শিল্পসৌন্দর্যের দিক দিয়ে 'রঘুবংশম্' কিংবা 'কুমারসম্ভবম্' অপেক্ষা অনেক খাট। তেমনি অন্যান্য রচয়িতার বেলায়ও বোধ করি এই মূল্যবিচারের আদর্শ মোটামুটি প্রয়োগ করা চলে। বর্তমান কালের সীমায় এসে আমরা দেখি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পিজীবনের সকল পর্বের মধ্যে নাট্যরচনার পর্বেই সবচেয়ে কম সৃষ্টিক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। এর কারণ নাট্যরচনায় রবীন্দ্রনাথের নৈপুণ্যহীনতা নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে নাট্যরচনার ঐতিহ্যই এ দেশে অতিশয় দুর্বল। ইউরোপ এ ক্ষেত্রে আমাদের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসর। বাংলা সাহিত্যে নাটকের বিভাগ সবচেয়ে পেছিয়ে আছে এটি মোটেই অকারণ নয়।

শিল্পসৃষ্টি হিসাবে কাব্য এবং নাটকের তুলনায় উপন্যাস নিম্নস্তরের শিল্প। বয়সের দিক দিয়েও উপন্যাস কাব্য বা নাটকের তুলনায় অনেক অর্বাচীন যুগেব শিল্প। বস্তুতঃ আধুনিক যুগের আগে উপন্যাসের অস্তিত্ব ছিল না। মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন এবং গদ্যের সমৃদ্ধির সূচনার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস নামক শিল্পরূপের সূচনা। কাব্য-নাটকের তুলনায় উপন্যাসের এই বয়ঃস্বল্পতা তার আপেক্ষিক অগভীরতার একটি কারণ। উপন্যাস-শিল্পে ব্যঞ্জনাগুণের অপ্রতুলতা। উপন্যাস-শিল্প মূলতঃ পর্যবেক্ষণনির্ভর। যে লেখকের পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা যত তীক্ষ্ণ ও খুঁটিনাটিপরায়ণ, উপন্যাসকার হিসাবে তাঁর সাফল্য তত সুনিশ্চিত। মানবচরিত্রজ্ঞান এই তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতারই দান। দূরভেদী দৃষ্টি নিয়ে অন্তরে প্রবেশ করবার কৌশল জানা না থাকলে সার্থক চরিত্রসৃষ্টি সম্ভব হয় না।

কিন্তু এই পর্যবেক্ষণতৎপরতা উপন্যাসশিল্পের বৈশিষ্ট্যও বটে। পর্যবেক্ষণতৎপর শিল্পী যেহেতু স্বভাবতঃই খুঁটিনাটিপরায়ণ, সেই কারণে তাঁকে একটি বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়। পর্যবেক্ষণের সুফল খুঁটিনাটি বৃত্তান্তের আকারে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে তাঁকে অজস্র কথার, অন্তহীন কথার দ্বারস্থ হতে হয়। পাতার পর পাতা ভরিয়ে তুলতে না পারলে ঘটনা এবং চরিত্রের চিত্রণ অভীপ্সিত শিল্প-সৌন্দর্যের সঙ্গে সম্পাদন করা যায় না। উপন্যাসকার ও গল্পকারকে যে কথাশিল্পী বলা হয় তা ওই কথার আতিশয্যের জন্যই। নয়তো সকল স্তরের সাহিত্য রচনাই কথাশিল্প, ঔপন্যাসিক ও গল্পকারকে ওই বিশেষণে বিশেষভাবে বিশেষিত করার কারণ দেখা যায় না। সাহিত্য মাত্রই কথা সাজাবার খেলা, শব্দবিন্যাসের প্রক্রিয়া। তবে কোথাও এই শব্দসজ্জা অতিমাত্রায় আড়ম্বরপূর্ণ ও বিস্তারিত, কোথাও তা ব্যঞ্জনাগুণাশ্রিত, অর্থাৎ স্বল্প কথার সাহায্যে গূঢ় ইঙ্গিত ও সংকেতবাহী। উপন্যাস প্রথমোক্ত স্তরের শিল্প। এতে ভাষণ-মুখরতা অত্যন্ত বেশী। কথা, কেবলই কথা, ক্রমাগত কথা—এই দিয়ে উপন্যাসের কলেবর পুষ্ট। এবং বলা বাহুল্য, যে অনুপাতে উপন্যাসের ভিতর কথার কোলাহল সেই অনুপাতে তার মধ্যে ব্যঞ্জনার অসদ্ভাব। অতিরিক্ত কলকোলাহলের আবহাওয়ায় মিতভাষী ব্যঞ্জনা অধিকক্ষণ তিষ্ঠোতে পারে না। স্বল্পবাক্ বলেই তার চারিদিকে নিভৃতির একটি পরিবেশ বিলম্বিত থাকা দরকার। উপন্যাসে এই নিভৃতি অনুপস্থিত। সেখানে বিচিত্র মানুষের জটলা, অসংখ্য ঘটনার ভিড়। অনেক সূত্র একত্র জড়িয়ে তবে উপন্যাসের মোটা দড়ি পাকিয়ে তুলতে হয়। হাঁ, দড়িই বটে, তাতে কাব্যের মত সুচিক্কণ স্বর্ণসূত্রে মালা গাঁথার নিপুণতা নেই, নাটকের মত কাব্য ও জীবনের সূক্ষ্ম জড়াজড়ি নেই। কাব্য গূঢ়-গভীর ভাবের প্রকাশক, পরিস্রুত

বিশুদ্ধ আবেগের পরিবেশনকারী, সুতরাং নিছক স্বকীয় প্রয়োজনেই কাব্যের পক্ষে শব্দব্যবহারের বেলায় ব্যয়কুণ্ঠার নীতি সবিশেষ মান্য। নাটকেও শব্দব্যবহারে সংযম অবশ্য-আচরণীয়, যেহেতু নাটকের লক্ষ্য অভিনয়, আর অভিনয়ে শ্রোতার মুখ চেয়ে অভিনেয় রচনাকে একটা নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে বাঁধতেই হয়। অন্তহীন ঘটনার স্রোতে নাটকের কাহিনীকে প্রবাহিত করে দিলে নাটকের রস স্ফটিকায়িত হবার অবকাশ পায় না। নাটকের রস জমাতে হলে ঘটনার স্রোতে আবর্ত চাই, সীমাবদ্ধ পরিসরেই শুধু আবর্তের সৃষ্টি হতে পারে।

উপন্যাসে সে রকম কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তাকে যত টেনে বাড়ানো যায় তত তার সম্প্রসারিত হবার সম্ভাবনা থাকে। কথার পর কথা যোজনা করে বিরাট ঘটনার জাল সৃষ্টির অপর নাম উপন্যাস। এ-জাতীয় কথাপ্রধান ঘটনাশ্রয়ী উপন্যাসে উৎকৃষ্ট পর্যায়ের শিল্পসৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার অবকাশ পরিমিত। অতি মোটা দানার একটা গল্পের রস ছাড়া এ-জাতীয় রচনা থেকে আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। বিচক্ষণ পাঠক এ-জাতীয় রচনায় আকৃষ্ট হওয়া অপেক্ষা বিকৃষ্টই হন বেশী। সাহিত্যে যাঁরা ভাবগাঢ় রসের সন্ধানী, গীতি-কবিতার সুরে যাঁদের মনপ্রাণ বাঁধা, তাঁরা এক-এক সময় উপন্যাসের আত্যন্তিক কথার ভারে বরং পীড়াই বোধ করেন। কথার জটিল অরণ্যানীর ভিতর তাঁরা তাঁদের রসদৃষ্টির স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলেন। কথার বাহুল্যে উপন্যাসের পৃথুলতা, আর এই পৃথুলতা প্রায়শঃ যথার্থ রসগ্রাহিতার পরিপন্থী।

তবে পৃথুলতা সত্ত্বেও উপন্যাসে যদি কাব্যের সৌন্দর্যের স্পর্শ লাগে তবে তা কাব্যের মতই মহিমময় হয়ে ওঠে। কিংবা জীবনের রহস্যময়তা, গূঢ় অভিপ্রায় ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের বোধ দিয়ে যদি উপন্যাসশিল্পকে মণ্ডিত করে তুলতে পারা যায় তা হলে কখন যে উপন্যাসের আটপৌর রূপ ঘুচে গিয়ে তার ভিতর অনবদ্য মহিমার

সঞ্চার হয় রচনাকার স্বয়ং তার হদিস পান না। উপন্যাসের একটি বহিরঙ্গ ও একটি অন্তরঙ্গ রূপ আছে। উপন্যাসের বহিরঙ্গে আছে তার গল্পাংশ, আর অন্তরঙ্গ রূপের ভিতর রয়েছে উপন্যাসের গূঢ় সৌন্দর্য ও তাৎপর্য। যিনি উপন্যাসের এই শেষের রূপটিকে সার্থক ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন তিনিই প্রকৃত ঔপন্যাসিক।

উপরের বিবৃতির যাথার্থ্যের প্রমাণস্বরূপ আমরা বাংলা সাহিত্য থেকে কয়েকটি উপন্যাসের নাম করতে পারি।—বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' 'বিষবৃক্ষ' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'রাজসিংহ'; রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ও 'ঘরে-বাইরে'; শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' ও 'গৃহদাহ', ; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি', 'কালিন্দী', 'তামসতপস্যা', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ও 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'; বনফুলের 'জঙ্গম'; অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'সত্যাসত্য'; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল-নাচের ইতিকথা' ও 'পদ্মানদীর মাঝি'; সুবোধ ঘোষের 'ত্রিযামা', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' ও 'পদসঞ্চার' এবং দীপক চৌধুরীর 'শঙ্খবিষ' ও 'এই গ্রহের ক্রন্দন'। নামপঞ্জীর সব কয়টি রচনাই আকারে ও আয়তনে মোটামুটি বৃহৎ, সুতরাং কথার ভারে ভারাক্রান্ত। কিন্তু কথা-ভারাক্রান্ত হলেও তারা কথামাত্রসার নয়। কথার আবরণ ভেদ করে তাদের ভিতর বৃহতের ও মহতের স্পর্শ লেগেছে। 'কপালকুণ্ডলা' 'ঘরে-বাইরে' 'পথের পাঁচালী' 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' আর 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে তো রীতিমত উৎকৃষ্ট কাব্যের আমেজ পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের যে কটি উপন্যাসে কাব্যধর্মিতার দোলা লেগেছে তারাই গল্প-কাহিনীর তুচ্ছ বন্ধন অতিক্রম করে অপূর্ব শিল্পসৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। মহৎ কোন বেদনা, মহৎ কোন ভাবনার ছোঁয়া না লাগলে যেন উপন্যাসের বাজার-

চলতি তুচ্ছ রূপটি ঘুচতে চায় না। কথার ভিতর সুরের বেগ এলে যেমন তা আর কথা থাকে না, অচিরেই গান হয়ে ওঠে, এও অনেকটা সে রকমের মৌলিক রূপান্তর। কথাকে কথার অতীত অর্থগৌরবে ভূষিত করতে যিনি জানেন, ঘটনার অন্তরে প্রবেশ করে জীবনের গভীর রহস্যময়তা ও ক্যাব্যসৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষমতা যাঁর আছে, তিনিই শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার।

ছোটগল্প

মানুষ গল্পপ্রিয়। গল্পের পিপাসা একটা জৈব ক্ষুধার মত মানুষের চিত্তে নিরন্তর ক্রিয়াশীল। বালবৃদ্ধবনিতানির্বিশেষে সকল মানুষই এই শুনবার পিপাসার অধীন। তাই গল্প-সাহিত্যের একটা একটানা স্রোত প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত অবিচ্ছেদে বহমান রয়েছে। রূপকথা (folk tales), পুরাণের গল্প (mythological stories), অতীত গল্প (legends), জন্তু-জানোয়ারের দৃষ্টান্ত অবলম্বনে নীতিমূলক গল্প (fables), ধর্মোপদেশপূর্ণ গল্প (parables), যে কোন রকমের কাহিনী, উপকাহিনী ও উপাখ্যান (story), অলীক বা আষাঢ়ে গল্প (phantasy) প্রভৃতি গল্পের পুরাতন-প্রচলিত রূপগুলি থেকে শুরু করে আধুনিক কালের ছোটগল্প (short story) পর্যন্ত গল্প-সাহিত্যের একটি সুবিশাল, সুসমৃদ্ধ ঐতিহ্য বর্তমান। সকল দেশের মহাকাব্যের অন্তর্গত অসংখ্য আখ্যায়িকা, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের জাতকের গল্প, কথাসরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বেতালপঞ্চবিংশতি, বত্রিশসিংহাসনের গল্প, আরব্য উপন্যাস, গ্রীস দেশের ঈশপের গল্প, বাইবেলের নীতিগল্প, বোকাসিও এবং বেয়ুলফের গল্প, চসারের গাথা-গল্প—মোটামুটিভাবে এগুলিকে বিশ্বসাহিত্য-ভাণ্ডারের গল্পসাহিত্যের আদি ও মধ্য নমুনা বলা যায়। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য মহাভারত গল্পের এক বিশাল আকর। ওই একটি মাত্র আধারে সব রকমের স্বাদগন্ধযুক্ত গল্পই প্রায় সমাবিষ্ট রয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। এমন কি আধুনিক মনস্তত্ত্বমূলক গল্পের অঙ্কুরও ওই আকরগ্রন্থখানির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

আজকের দিনে আমরা যাকে ছোটগল্প বলি তার একটি বিশেষ

প্রকৃতি আছে। এ প্রকৃতি একান্তভাবেই তার নিজস্ব। ছোটগল্পের বীজরূপ চেষ্টা করলে হয়তো প্রাচীন শিল্পের ভিতর খুঁজে পাওয়া যাবে, যেমন মহাভারতে খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু তার আঙ্গিক, প্রকাশরীতি ও ভাষা-বিন্যাস একান্তভাবে আধুনিককালের আবহাওয়া আর মেজাজকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। ছোটগল্প সম্পূর্ণরূপে আধুনিক মননের দান। এর পদ্ধতি-প্রকরণ পুরাপুরি এ কালের রচনাদর্শ থেকে গৃহীত। গীতি-কবিতা বা খণ্ডকবিতার সঙ্গে ছোটগল্পের স্বভাবের একটা মিল আছে।/ দুটোই প্রবন্ধ, প্রকৃষ্টরূপে বদ্ধনীকৃত আটোসাঁটো রূপরচনা। পুরাতন কালের মহাকাব্য ভেঙে যেমন আধুনিক যুগের গীতি-কবিতা হয়েছে তেমনি আকার ও আয়তনে ভারী পুরাতন কাহিনীর আদর্শ ভেঙে আধুনিক ছোটগল্প হয়েছে। ছোটগল্পের ঠাসবুনন বাঁধুনি, গাঢ়বদ্ধ রূপ, আদি মধ্য ও অন্তিম অংশের মধ্যে একটা সুগ্রথিত সচেতন ঐক্য এই বিশেষ শিল্প-রূপটিকে একটা সুচিহ্নিত বৈশিষ্ট্য দান করেছে। বৈশিষ্ট্যটি যেমন লক্ষণীয় তেমনি উপভোগ্যও বটে।

ছোটগল্পের আয়তনের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নেই। বক্তব্যভেদে এ আয়তন এক পাতার মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকতে পারে (দৃষ্টান্ত বনফুলের একাধিক এক-নিঃশ্বাসের গল্প) আবার তা একটা খণ্ড উপন্যাসের রূপও ধারণ করতে পারে (যেমন রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'; শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি', 'মেজদিদি', 'নিষ্কৃতি' প্রভৃতি আপাত-উপন্যাসসমূহ)। ছোটগল্পের স্বরূপবিচারে তার ওই 'ছোট' কথাটি সময় সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে, করেও থাকে। ছোটগল্প আকারে প্রকারে অবশ্যতঃই ছোট হবে এমন কোন কথা নেই। তার গল্পত্বটাও মুখ্য বিচার্য বিষয় নয়। এই বিশেষ শিল্পরূপটির প্রকৃতি-লক্ষণ অনুযায়ী গল্পকথা একটি বিশিষ্ট স্বাদগন্ধযুক্ত মৌলিক সংরচনের আকারপ্রাপ্ত হলে তবেই শুধু তাকে আধুনিক কথাসাহিত্যের পরিভাষা অনুসারে ছোটগল্প

আখ্যা দেওয়া যায়। ছোটগল্পের সংজ্ঞা নিরূপণের কাজটি খুব সহজ নয়। আমার 'বাংলার সাহিত্য' গ্রন্থের "আধুনিক উপন্যাসের স্বরূপ" নিবন্ধে স্বীয় ক্ষুদ্র বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী আমি একটি সংজ্ঞা নির্দেশের চেষ্টা করেছি। প্রাসঙ্গিক বোধে সেই অংশটি এখানে উদ্ধৃত করছি—

"ছোটগল্পের পরিসর দীর্ঘই হোক আর সঙ্কুচিতই হোক তা ছোটগল্পই থাকে। আয়তনস্ফীতি অথবা আয়তনের ক্ষীণতা কোনটাই ছোটগল্পকে তার স্বধর্ম থেকে স্খলিত করতে পারে না। কেন না ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য তার ছোটত্বে নয়; 'ছোটগল্প'ত্বে। এবং সে ছোটগল্পত্ব এমন একটা গুণ, যা কতকটা লিরিক কবিতার ধর্মের স্বগোত্র। ব্যক্তিগত সুখদুঃখের আলোড়ন-ছন্দে এ সংসারের প্রতিটি মানুষের জীবন আলোড়িত। সূক্ষ্ম অনুভূতিপরায়ণ মনে আবার এ ছন্দ বিশেষ দোলা জাগায়। প্রবল সুখদুঃখবোধসম্পন্ন হৃদয়ের অনুভূতির প্রগাঢ়তা যখন কাব্যাকাবে সংহত ও সুসংবদ্ধ রূপ পায়, তা গীতিকবিতার রূপ পরিগ্রহ করে। গীতিকবিতা আবেগাকুলতার স্ফটিকায়িত শৈল্পিক অভিব্যক্তি। ছোটগল্প সম্পর্কেও এই কথা বলা চলে। মেজাজ বা 'মুডে'র এক-একটা ফেরতার সময় আকস্মিক বিদ্যুদ্দীপ্তিতে ঝলসিত বস্তুর ন্যায় যখন আমরা ঘটনাকে একটা বিশেষ অর্থে অন্বিত হয়ে উঠতে দেখি এবং সেই দেখাটাকে উপযুক্ত ভাষা ও আঙ্গিকের আশ্রয়ে সাহিত্যে প্রকাশ করি, তখন তা ছোটগল্পের স্বধর্মপ্রাপ্ত হয়। ছোটগল্পে ঘটনার যে বিচ্ছুরণ, তা বিদ্যুদ্‌বিকাশের ন্যায় আকস্মিক। যেমন আকস্মিক তার আবির্ভাব, তেমনি আকস্মিক তার মিলিয়ে যাওয়া। তবে মিলোবার পরেও আকস্মিকতার ছন্দ মনের মধ্যে একটা দীর্ঘস্থায়ী রেশের মত গুঞ্জরণ করতে থাকে। কবিতা কিংবা ছোটগল্প দুয়েরই সার্থকতা এইখানে।"

বলা প্রয়োজন, এ সংজ্ঞা বাগ্‌বহুল হলেও ছোটগল্পের প্রকৃতির

সম্পূর্ণ প্রকাশক নয়। একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণের বিচারমাত্র। আধুনিক উপন্যাসের স্বরূপবিচার প্রসঙ্গে ওই বিশিষ্ট শিল্পরূপের প্রতিতুলনায় ছোটগল্পকে লেখকের যেমন মনে হয়েছে সেই ভাবটিকেই তুলে ধরতে চাওয়া হয়েছে ওই নিবন্ধে। তবে যিনি যে ভাবেই ছোটগল্পের বিচার করুন না কেন, এক বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে একটি বিশেষ অনুপ্রাণিত মুহূর্তের গভীর অনুভবের আলোকে আলোকিত চরিত্র বা ঘটনার অপরূপ অর্থসম্পৃক্ত প্রকাশ নিয়েই ছোটগল্পের কারবার। যাঁরা ছোটগল্পের মধ্যে শুধু গল্পের রস সন্ধান করেন তাঁরা ছোটগল্পের প্রকৃতির প্রতি পুরাপুরি সুবিচার করেন না। ছোটগল্পের মূল উপাদান গল্প তাতে সন্দেহ কি, কিন্তু ওই গল্পত্বটাই তার শেষ কথা নয়। বরং গল্পের যেখানে শেষ সেখান থেকেই ছোটগল্পের সত্যিকার জগতের আরম্ভ। এ জগৎ অনুভবের, মননের—মানবজীবনের তাৎপর্য সম্পর্কে রয়ে-বসে ভাবনা ও চিন্তনের। এক-একটি উৎকৃষ্ট গল্প পড়া শেষ হয়, হাতের তেলোয় উল্টানো-পাল্টানো ময়দার তালের মত মানবচরিত্র আর মানবজীবনকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রথম শ্রেণীর গল্পকাররা যখন একটা দ্রুত চমক দিয়ে ছোটগল্পের আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটান তখন সেই চমকের রেশকে একটি দীর্ঘবিলম্বিত সুররেখায় পাঠকের মনের ভিতর সম্প্রসারিত করে দেন। গল্প পড়া শেষ হলেও গল্পের গুঞ্জরণ থামে না—গল্পের বর্ণিত ঘটনা বা মানুষকে কেন্দ্র করে গভীর জীবনবোধের দ্বারা উদ্দীপিত রসিক কিংবা ভাবুকজনসুলভ চিন্তার তোলাপাড়া চলতেই থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে যে ঘটনার এবং মানুষবিশেষের স্বভাবের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে সে কি শুধু ওই চিত্র পরিবেশনার মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে? মোটেই তা নয়। গল্পটির মধ্য দিয়ে আমরা পিতৃস্নেহের এক কমনীয়সুন্দর স্নিগ্ধমধুর সার্বভৌম রূপের পরিচয় লাভ করে ধন্য হই এবং

সে পরিচয় আমাদের মনের মধ্যে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হয়ে যায়। কিংবা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অগ্রদানী' গল্প। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঔদরিক লোভাতুরতার ইতিবৃত্ত. কিন্তু গল্পের আবেদন ব্যক্তিবিশেষের বেদনাতেই সীমায়িত নয়। গল্পকার এখানে ওই বিশেষ হতভাগ্য মানুষটির মধ্য দিয়ে সর্বরিক্ত বঞ্চিত সমাজের হাহাকারটাকেই বিন্দু-কেন্দ্রায়িত করে তুলেছেন। এ চিত্র-রূপায়ণে লেখকের আবেগ-থমথমে হৃদয়বত্তা তাঁকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। লেখকের ভিতর যে সহজাত সহানুভূতি আছে এবং চরিত্রটির পরিকল্পনার সময় যে সহানুভূতির আন্দোলন তাঁর মনে জেগেছিল, চরিত্রটিকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে তা ওই মানুষটির স্বভাববৈশিষ্ট্যে আর লিখনপ্রক্রিয়ার গুণে বহুগুণিত হয়ে উঠেছে। মানবদরদী শিল্পীদের বেলায় শিল্পের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এ রকম আশ্চর্য সংঘটনই ঘটে।

কিংবা ধরা যাক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্প। এটি এক অসাধারণ রচনা। সমাজজীবনের বীভৎসতা আর বিকারের এমন জীবন্ত নগ্ন চিত্র বাংলা কথাসাহিত্যে বোধ হয় আর নেই। কিন্তু কতকগুলি ক্ষুধাতুর কামাতুর রুগ্ন গলিত ভিক্ষুকের কদর্য দিনযাত্রার চিত্র উপস্থাপনেই এ গল্পের গল্পত্ব নিঃশেষিত নয়। তারও পরে কথা থেকে যায়। গল্প পড়া শেষ হয়ে গেলে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অন্যায় অবিচার শোষণপীড়নের জাঁতাকলে পিষ্ট মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনার মর্মান্তিক ট্রাজিডি একটা দীর্ঘশ্বাসবিধুর সান্ত্বনাবিহীন ব্যথাহত চেতনার মত মনের ভিতর অবিরাম সঞ্চরণ করে ফিরতে থাকে। গল্পটির নিজস্ব বেদনা তো আছেই, তার সঙ্গে সমাজের একটা বড় অংশের ক্ষয় আর অপচয়ের বেদনা যুক্ত হয়ে গল্পের অভিপ্রায়কে বহুগুণ অর্থান্বিত আর শিল্পান্বিত করে তোলে।

উপরের বিশ্লেষণ থেকে বুঝতে পারা যাবে যে, ছোটগল্প শিল্পরূপ

হিসাবে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। পৃথিবীর সকল দেশের আধুনিক সাহিত্যে ছোটগল্প একটি বিশেষ মর্যাদার স্থান জুড়ে আছে। বিশ্ব-কথাসাহিত্যের সুপুষ্ট কলেবরের একটা বড় অংশ ছোটগল্পের উপাদান দ্বারা তৈরী। দেশে দেশে এই শিল্পরূপের প্রথিতযশা সব প্রবক্তা রয়েছেন, তাঁদের খ্যাতি কবি কিংবা নাট্যকার কিংবা ঔপন্যাসিকের খ্যাতির চাইতে কম নয়। একজন মোপাসাঁ কিংবা শেখভের যশ প্রথম শ্রেণীর একজন ঔপন্যাসিকের যশের সঙ্গেই তুলনীয়। আয়তনের দিক দিয়ে উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের তুলনা হতে পারে না। উপন্যাস পৃথুল, ভারবহুল, বিশালকায়; ছোটগল্প হ্রস্বায়তন, ভারবিমুক্ত, ক্ষণজীবী। ক্ষণজীবী কিন্তু ক্ষীণজীবী নয়। ছোটগল্প তার স্বক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রাবল্যের অধিকারী। উপন্যাস যদি হয় দীর্ঘ সময়ের জন্য দীর্ঘছন্দে গা এলিয়ে দেওয়া শিথিল আলস্যের বিশ্রান্তি, ছোটগল্প হল একটি পরিচ্ছন্ন নিটোল সংক্ষিপ্ত ঘুম। এ ঘুমে মন কম পরিতৃপ্তি, কম শক্তি সঞ্চয় করে না। উপন্যাসের সঙ্গে প্রতিতুলনায় ছোটগল্পকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করার কোনই কারণ নেই। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক টমাস মান্ শেখভের ব্যক্তিত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে ওই প্রসিদ্ধ গল্পকারের কৃতিত্বকে একজন টলস্টয় কিংবা ডস্টয়েভস্কির কৃতিত্ব অপেক্ষা কোন অংশে কম মর্যাদা দেন নি। উপন্যাস এবং ছোটগল্প নিজ নিজ এলাকায় স্বরাট্, দুটি শিল্পরূপই পূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত; তাদের বড়-ছোটর প্রশ্ন ওঠে না, যেমন প্রশ্ন ওঠে না মহাকাব্য বড় কি গীতিকবিতা বড় এই অবান্তর প্রতিতুলনার। দুইই সমান বড়, দুইই সমান ভোগ্য—শুধু একে অপরকে স্পর্ধা না করলেই হল।

আমাদের বাংলা সাহিত্য ছোটগল্পের সম্পদে অতিশয় সমৃদ্ধ। বাংলায় ছোটগল্পের উৎকর্ষের একটা ঐতিহ্য দাঁড়িয়ে গেছে। কথাটা বহুলকথনে পুরনো হয়ে গেলেও পুনরুক্তির যোগ্য যে, বাংলা ছোটগল্প শিল্পসৌন্দর্যের উৎকর্ষে বিশ্বসাহিত্যের যে-কোন

শ্রেষ্ঠ গল্পসাহিত্যের সঙ্গে তুলনীয়। অনেকানেক লেখকের সম্মিলিত দানে বাংলা ছোটগল্পের এই ঐতিহ্য নির্মিত ও পুষ্ট হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'যুগলাঙ্গুরীয়'কে আধুনিক বাংলা ছোট-গল্পের আদি ধরলে গত প্রায় আশি বছরের মধ্যে বাংলা ছোট-গল্পের বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়েছে। এই বিশেষ শিল্পরূপের সমৃদ্ধিবিধানে বিদেশী প্রভাব অনেকখানি কার্যকরী হয়েছে সন্দেহ নেই, তবে মনে হয় এক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় প্রতিভাও বড় কম নয়। বিদেশী প্রভাব তো উপন্যাসের উপরও পড়েছে, বস্তুতঃ আধুনিক বাংলা উপন্যাস বিদেশী প্রভাবেরই সৃষ্টি ; কই, শিল্পোৎ-কর্ষের দিক দিয়ে তা তো ছোটগল্পের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারে নি। আত্মশ্লাঘার যথার্থ ও সঙ্গত ক্ষেত্র যদি কিছু থেকে থাকে, তা এই ছোটগল্প।

বাংলা ছোটগল্পের এক প্রধান পুরুষ হলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রকৃত প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথ আজও এই ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ এবং প্রধানতঃ কবি হলেও তাঁর সৃষ্ট শিল্পরূপগুলির কোন একটির শ্রেষ্ঠত্ব যদি নির্দেশ করতে হয় তা হলে বোধ হয় এক-প্রকার অসঙ্কোচেই তাঁর গল্পগুলির প্রতি অঙ্গুলিক্ষেপ করতে হয়। 'গল্পগুচ্ছ' যতবার পড়া যায় ততবারই তাদের ভিতর নূতন সৌন্দর্যের চমক আবিষ্কার করে মন পুলকিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে কবিমন বিশেষভাবেই ক্রিয়াশীল, তবে আধুনিক-কালোচিত মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতাও তাতে বড় কম উপস্থিত নেই। গল্পগুলিতে গ্রামীণ পরিবেশের প্রাধান্য থাকলেও নিছক কৃষি-কেন্দ্রিক গ্রামজীবনের উদ্ঘাটনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্প রচনার শক্তি ব্যয় করেন নি। কবির অনেকগুলি গল্পেরই মূলে রয়েছে আধুনিক নাগরিক মননের সঙ্গে গ্রামীণ মননের সংঘাত ও অসামঞ্জস্যের বেদনার আলোড়ন। রূপে রসে বর্ণবিভায় রবীন্দ্র-নাথের অধিকাংশ ছোটগল্প নিটোল এক-একটি স্ফটিকখণ্ড।

তারপরেই ছোটগল্পের ক্ষেত্রে নাম করতে হয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের। আঙ্গিক এবং কাহিনীর বিন্যাসের দিক দিয়ে এঁর গল্পগুলি নিখুঁত বললেও চলে। প্রভাতকুমারকে বাংলা সাহিত্যের মোপাসাঁ বলা হয়। যদিও মোপাসাঁর সমাজ-বাস্তবতার সামান্যই প্রভাতকুমারে দেখতে পাওয়া যায়, তা হলেও এই অভিধাটি কুপ্রযুক্ত নয় এই কারণে যে, প্রভাতকুমার একজন সুদক্ষ আঙ্গিক-সচেতন শিল্পী। প্রভাতকুমারের গল্পের সুর মূলতঃ প্রসন্ন এবং তাঁর মন বিদগ্ধ নাগরিকের মন। খুব সম্ভব নাগরিকতায় তাঁর দীক্ষা পাকা ছিল বলেই তাঁর হাত থেকে ছোটগল্পের আবরণে এমন ওস্তাদ কারিগরির নমুনা আমরা উপহার পেয়েছি।

বাংলা সাহিত্যের আর একজন প্রধান ছোটগল্প লেখক হলেন শরৎচন্দ্র। 'মহেশ', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'একাদশী বৈরাগী' প্রভৃতি গল্প বাদ দিলে যদিও শরৎচন্দ্র ছোটগল্প আখ্যায় ছোটগল্প খুব কমই লিখেছেন, তা হলেও বড়গল্পগুলির মধ্য দিয়ে প্রকার ও প্রকৃতির বিচারে প্রধানতঃ ছোটগল্পই তিনি লিখেছেন জীবনভোর। 'নিষ্কৃতি' কিংবা 'বৈকুণ্ঠের উইল' যদি ছোটগল্প না হয় তবে তা যে কোন্ পর্যায়ভুক্ত গল্পরচনা আমাদের ঠিক ধারণায় আসে না।

এর পরই বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প-রচয়িতার সংখ্যার বিস্ময়কর স্ফীতি লক্ষ্য করা যায়। ছোটগল্প-লেখকদের সে এক অন্তহীন মিছিল। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, 'বনফুল', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, প্রমথনাথ বিশী, পরিমল গোস্বামী, অমলা দেবী, 'সম্বুদ্ধ', অন্নদাশঙ্কর রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, সুবোধ

ঘোষ, অমরেন্দ্র ঘোষ, আশাপূর্ণা দেবী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শিবরাম চক্রবর্তী—কত নাম করব। বয়সের দিক দিয়ে তার পরের সারিতেই রয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নবেন্দু ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, দীপক চৌধুরী, রণজিৎকুমার সেন, সন্তোষকুমার ঘোষ, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত দেবসরকার, সুশীল রায়, রমাপদ চৌধুরী, বিমল কর, সমরেশ বসু, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা প্রভৃতি। এ ছাড়াও একাধিক শক্তিমান ছোটগল্প-লেখক রয়েছেন যাঁদের গুণপনার আমি অনুরাগী, শুধু তালিকাটি নির্দিষ্ট পরিসর ছাড়িয়ে যাবে আশঙ্কায় তাঁদের নাম-সংকলনে বিরত রইলাম। আশা করি, সংশ্লিষ্ট গল্পকারগণ লেখককে মার্জনা করবেন।

নিম্নলিখিত গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে বহুকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলেই আমার ধারণা—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁইমাচা', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অগ্রদানী', 'তারিণী মাঝি', 'নারী ও নাগিনী', 'ইমারৎ', 'আরোগ্য' ইত্যাদি, বনফুলের 'অর্জুন মণ্ডল', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'রাণুর প্রথম ভাগ', রাজশেখর বসুর 'কৃষ্ণকলি', উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হেমাঙ্গিনীর সুটকেস', অমলা দেবীর 'ন্যাড়া', মনোজ বসুর 'নরবাঁধ', শৈলজানন্দের 'অতি ঘরন্তী না পায় ঘর', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগরসঙ্গমে' ও 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'হরেন্দ্র', প্রবোধকুমার সান্যালের 'প্রসাধন' ও 'অঙ্গার', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' ও 'ফেরিওয়ালা', বুদ্ধদেব বসুর 'রাধারাণীর নিজের বাড়ি', সুবোধ ঘোষের 'গোত্রান্তর', 'পরশুরামের কুঠার' ও 'চতুর্ভুজ ক্লাব' ইত্যাদি।

অপেক্ষাকৃত অপ্রবীণ বয়সীদের মধ্যে দুজন সেরা গল্পলেখক হলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আঙ্গিক আর ভাষার বিন্যাস যেমন সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত তেমনি তাঁর গল্প বলার ধরনটিও অতি মনোরম। তাঁর গল্পের উপজীব্য চিত্র ও চরিত্রে সমাজবাস্তবতা তথা মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতার কারুকার্য তেমন নেই, তবু সব জড়িয়ে তাঁর গল্পের আবেদন স্নিগ্ধ আর ওইখানেই তাঁর ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনার সুর অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ ও অলঙ্কারনিক্কণময়। অসাধারণ ভাষাকুশলতার প্রসাদে এ লেখক সর্বপ্রকার বর্ণনায় দুর্ধর্ষ। ইনি কবিপ্রাণও বটেন। এই দুই শক্তিমান লেখকের কয়েকটি উৎকৃষ্ট গল্প হল: (নরেন্দ্রনাথ মিত্রের) 'রস' 'পালঙ্ক' 'অসবর্ণা' 'দাম্পত্য' ও 'বিলম্বিত লয়', এবং (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের) 'কালাবদর' 'মর্গ' 'বাইশে শ্রাবণ' 'ভাঙা চশমা' ও 'শিকার'। এই প্রসঙ্গে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'সুর' ও 'দ্বিধা', সন্তোষকুমার ঘোষের 'জোড়-বিজোড়', সমরেশ বসুর 'অকাল বসন্ত' ও 'ষষ্ঠ ঋতু', দীপক চৌধুরীর 'লগ্ন উদ্ধার' ও তীব্র ব্যঙ্গরসের গল্প 'শশাঙ্ক গুপ্তর সাম্রাজ্য বিস্তার', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'একটিও না' আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'হাত' এবং বিমল করের 'তিল-তুলসী' ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

তরুণবয়সী গল্প-লেখকদের মধ্যে যাঁদের রচনায় সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির পরিচয় পাওয়া গেছে তাঁদের কয়েক জনের নাম— দেবেশ রায়, প্রফুল্ল রায়, সঙ্কর্ষণ রায়, সুভাষ সমাজদার ও মানবেন্দ্র পাল।

সাহিত্যে পরিবেশ-বৈচিত্র্য

আজকাল সাহিত্যালোচনা-প্রসঙ্গে এই দাবি প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে, বাংলা সাহিত্যের ভূগোলের সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে। যত দূর মনে পড়ে, কথাসাহিত্যিক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ বছর কয়েক আগে 'দেশ' পত্রিকার সাহিত্য-সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে এই দাবি প্রথম উত্থাপন করেন। তার পর একাধিক লেখকের আলোচনায় এই বিষয়টির পুনরবতারণা ঘটে। সাহিত্য-পাঠকের স্বাভাবিক বৈচিত্র্যস্পৃহার দিক দিয়ে বিষয়টি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বাস্তবিক, আমাদের সাহিত্যের ভূগোলের পরিধি বাড়ানো একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সাহিত্যের যদি বিষয়গত ভিত্তিতে বিচার করা যায় তা হলে দেখা যাবে তার দুটি দিক আছে—একটি ইতিহাসের দিক, একটি ভূগোলের দিক। ইতিহাসের এলাকায় স্থান পায় বিচিত্র ঘটনা-প্রবাহ, চরিত্র-চিত্রণ, মানবীয় মনন ও কল্পনার জটিল জালের উন্মোচন। মানুষ নামক অদ্ভুত এবং অসাধারণ জীবটিকে নিয়ে ইতিহাসের কারবার। আর সাহিত্যের ভূগোল বলতে বুঝি তার পটভূমি, পরিবেশ, আবহাওয়া আর স্থানমাহাত্ম্য। অর্থাৎ সাহিত্যের ভূগোল নিছকই সাহিত্যের ব্যাপ্তির দিকটির সহিত সংশ্লিষ্ট। এর গতি vertical নয়, horizontal। মানুষের মন অবস্থাভেদে ঊর্ধ্বমুখী অথবা নিম্নমুখী হয়; কিন্তু তার দেহটি স্থানে এবং কালে বিরাজ করে। এই স্থানকাল নিয়েই সাহিত্যের ভূগোলের কারবার। লেখকের রুচি প্রবণতা অভিজ্ঞতাভেদে সাহিত্যের ভূগোল কখনও গ্রামাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়, কখনও শহরে; কখনও অতি-পরিচিত পরিবেশের রূপায়ণে তা নিবদ্ধদৃষ্টি, কখনও অজানা-অচেনা পরিবেশের ছবি

ফুটিয়ে তুলতেই তার সমধিক স্ফূর্তি; কখনও তা দূর কালে প্রসারিত, কখনও নিতান্ত সন্নিহিত কাল এবং আশু বর্তমানের ওপারে তার দৃষ্টি পৌঁছতে চায় না। স্থানগত বৈশিষ্ট্য অথবা কালগত দূরবর্তিতা কিংবা নৈকট্যের নির্বাচন সবটাই নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট লেখকের মর্জির উপর। যে লেখক মধ্যবিত্ত জীবনকে ভাল করে জানেন তাঁর পক্ষে নগর-সীমায় সংহত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবনের রূপ ফুটিয়ে তুলতে পছন্দ করাটাই বেশী স্বাভাবিক; আর যে লেখক পল্লীজীবনের রূপেব সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত তিনি সব ছাড়িয়ে পল্লীকেই তাঁর রচনার পটভূমি হিসাবে নির্বাচন করতে চাইবেন তাতে সন্দেহ নেই। যে লেখক স্বভাবে রোমান্টিক তাঁর কল্পনা আধুনিক নগব-জীবনের সহস্রবিধ কৃত্রিমতার মধ্যে আড়ষ্ট না হয়ে পারে না; তিনি স্বতঃই বিগত কালের ঐশ্বর্য আড়ম্বর আর বিস্তারেব মধ্যে তাঁর সৃজনী আবেগের মুক্তি খোঁজেন। অপর পক্ষে, বাস্তববাদী লেখক যিনি, তাঁর চোখে সমসাময়িক-কালের সমাজের সমস্যাগুলিই সবচেয়ে বেশী সত্য। যুগচেতনায় তিনি ভরপূর। এই শ্রেণীর লেখকেব নিকট নিকট-পরিবেশটিই অধিক গুরুত্ব অর্জন করে থাকে।

এই ভাবে লেখকভেদে সাহিত্যের পটভূমির রূপান্তর ঘটছে। লেখকদের মনোভঙ্গীর বৈচিত্র্যের কল্যাণে আমরা সাহিত্য থেকে নানা ধরনের রস আহরণের সুযোগ পাচ্ছি। আমাদের পাঠকদের মানসিকতারও বহু স্তরভেদ আছে। নিজ নিজ প্রবণতা অনুযায়ী আমরা যে লেখকের মধ্যে যেমন খোরাক পাই, সেই মানদণ্ডে তাঁকে বিচার করি। পাঠক রচনার মধ্যে নিজের রুচি-বিশ্বাসের সমর্থন এবং শ্রেণীগত ও পরিবেশগত পক্ষপাতের সাযুজ্য পেলে উল্লসিত হন; তদভাবে প্রতিহত হন। এমন প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, যে সকল পাঠক সমাজের তথাকথিত উচ্চকোটিতে বিচরণ করেন, মধ্য আর নিম্নমধ্য-বিত্ত সম্প্রদায়ের জীবন-সংগ্রামের

অকরুণ কাহিনী পড়তে তাঁদের আদপেই ভাল লাগে না। আবার মধ্যবিত্ত কাহিনীর ভূরিভোজে অভ্যস্ত পাঠকসাধারণের কুলি-মজুরের দুঃখ-বেদনা নিয়ে লেখা গল্প পড়তে অল্পতেই হাঁফ ধরে যায়। উন্নত শ্রেণীর পাঠক অথবা সাধারণবোধবুদ্ধিযুক্ত পাঠক, সকলেই আমরা কম-বেশী সাহিত্য-রচনার মধ্যে স্বীয় অভ্যস্ত পরিবেশের প্রতিফলন আশা করি। এবং বলাই বাহুল্য, সে আশা পরিতৃপ্ত হলে মনও সঙ্গে সঙ্গে পরিতৃপ্ত হয়।

অবশ্য এ কথার ব্যতিক্রম নেই তা নয়। ব্যতিক্রম আছে, এবং সে ব্যতিক্রম আছে বলেই সাহিত্যের 'ভূগোলের সম্প্রসারণের জন্য সমালোচক এবং পাঠকসমাজের তরফে এত জোর তাগাদা কিন্তু এই ব্যতিক্রমের কারণ ষোল-আনাই মনস্তাত্ত্বিক। যে পরিবেশের সঙ্গে আমরা অতিমাত্রায় পরিচিত তার রূপায়ণের মধ্যে যেমন এক ধরনের পরিচয়জনিত স্বস্তির বোধ আছে তেমনি একঘেয়েমিও আছে। এই পীড়াদায়ক একঘেয়েমির চেতনাই সাহিত্যে আমাদের নব নব পটভূমি সন্ধানে প্ররোচিত করে। অভ্যস্ত পরিবেশের চিত্ররূপের বারম্বার স্থাপনায় আমাদের বৈচিত্র্যস্পৃহা দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবেই ক্ষুণ্ণ হয়। তারই প্রতিক্রিয়ায় পটভূমির বৈচিত্র্য অন্বেষণে মন নিয়োজিত হয়। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে দুই বিপরীত প্রকৃতির মানুষের মধ্যে নাকি সবচেয়ে মনের মিল ঘটে। এও অনেকটা সেইরূপ। নিয়তবিচরণের ক্ষেত্রের সঙ্গে একান্তরূপে পরিচিত বলেই মন তার প্রতিক্রিয়ায় অজানা পরিবেশের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বাস্তব-জীবনেই হোক আর মানস-জীবনেই হোক সেই পরিবেশের মুখোমুখী হতে পারলে আরাম বোধ করে। সাহিত্যের ভূগোল বাড়াবার আগ্রহের মূলে আছে মানবমনের এই মজ্জাগত বৈচিত্র্যস্পৃহা। এই বৈচিত্র্যের ক্ষুধাটি যে একান্তভাবেই মনস্তাত্ত্বিক কারণসঞ্জাত তা আশা করি আর বিশদভাবে বোঝাবার আবশ্যকতা নেই।

উপরে বাংলা সাহিত্যের রচয়িতাদের রুচি-প্রবণতা-অভিজ্ঞতার ভিন্নতার প্রশ্নটি আলোচনা করা হয়েছে বটে, কিন্তু তা থেকে এমন মনে করার হেতু নেই যে আমাদের সাহিত্য বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ। বাংলা সাহিত্যের পরিবেশের বৈচিত্র্যবিধানের বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং ওই প্রয়োজনবোধ থেকেই সাহিত্যের ভৌগোলিক পরিধির বিস্তারীকরণের দাবির উদ্ভব। একটু কাছে থেকে বাংলা সাহিত্যের ভূগোলের উপর দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, আমাদের সাহিত্যের মনচিত্র নানা রঙে রঙিন হলেও তার মানচিত্রে তিনটি মাত্র রঙের ব্যবহার—পল্লী-পটভূমি, শহরের পটভূমি, শহরতলী এবং মফঃস্বল-শহরের পটভূমি। পল্লী-পটভূমিতে বিরাজ করছে সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা তথা ইংরেজ-প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় লালিত অভিজাত সম্প্রদায় এবং তাঁদেব অনুগ্রহপুষ্ট কিংবা নিগ্রহ-নিপীড়িত অগণিত গ্রামীণ কৃষক-সমাজের মানুষ। শহব এলাকায় কেন্দ্রীভূত রয়েছে মুখ্যতঃ বৃত্তিজীবী মধ্য আর নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ এবং তাঁদের আশপাশ ঘিরে প্রতিপত্তিশালী ধনিক বণিক্ মহাজন এবং যুগপৎ সাংস্কৃতিক কৌলীন্য ও আর্থিক কৌলীন্যের অভিমানস্ফীত তথাকথিত অ্যারিস্টোক্রাটিক শ্রেণী। শহরতলীতে আছে নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষ আর গায়ে-গতরে-খেটে-খাওয়া অগণনসংখ্যক মেহনতী মানুষের জনতা—কারখানার শ্রমিক কুলি মজুর কারিগর মিস্ত্রী প্রভৃতি। আর মফঃস্বল-শহরের রূপ দো-আঁসলা, তার কোন অংশে গ্রামের রূপ প্রকট, কোন অংশে শহরের।* এই তিনটি মৌলিক স্থানিক স্তরবিন্যাসকে অবলম্বন করেই বাংলা সাহিত্যের ভূগোল এতাবৎ আবর্তিত হয়েছে বলা যায়।

সাহিত্যের এই যে তিনটি ভৌগোলিক স্তর, এরও ক্রমিক রূপান্তর হয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে,

---

* মদীয় 'সাহিত্যের সমস্যা' গ্রন্থে "বাংলার মফঃস্বল শহর" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সমাজের বিবর্তন যে নিয়ম এবং যে পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে সাহিত্যের ভূগোলের বিবর্তনও ঠিক সেই ভাবেই হচ্ছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ-মানসের উপর সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থার প্রভাব বলবৎ ছিল, সুতরাং তৎকালীন বাংলা উপন্যাস-গল্পের চেহারার মধ্যেও গ্রামীণ ভূগোল অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এক দিকে স্থানগত পরিবেশ বেছে নিয়েছেন তৎকালীন গ্রামীণ সমাজ থেকে, অন্য দিকে কালগত পরিবেশের জন্য কখনও কখনও তিনি বিগত ইতিহাসের দ্বারস্থ হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ নায়কচরিত্রই জমিদাব-শ্রেণী থেকে উদ্ভূত; যেখানে এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে সেখানে একপ্রকার অবধারিতভাবেই ইতিহাসের রাজা, নবাব, সামন্তসর্দাব বা তৎস্থানীয় ব্যক্তিগণ নায়ক-রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। প্রথম উক্তির প্রমাণ নগেন্দ্র, গোবিন্দ-লাল, প্রতাপ মহেন্দ্র, ব্রজেশ্বর প্রভৃতি সামাজিক চরিত্র; দ্বিতীয় উক্তির প্রমাণ জয়সিংহ, মীবকাশেম রাজসিংহ, সীতারাম প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র। বলা বাহুল্য, এই দুইপ্রকারের চরিত্র-পরিকল্পনাই তৎকালীন রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এব মধ্যে ফিউডাল ব্যবস্থার প্রতি প্রচ্ছন্ন পক্ষপাত এবং নবোদ্গত জাতীয়তার আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধেব পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা দেশে জাতীয়তাবাদের প্রথম সার্থক ঋত্বিক।

এর পবে মধ্যবিত্ত সমাজের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পরিবেশের পরিবর্তন হল। ধীরে ধীরে অথচ সুনিশ্চিতভাবে গ্রামীণ সমাজের উপব থেকে মনোযোগ সরে গিয়ে তা ক্রমেই শহরে কেন্দ্রীভূত হতে লাগল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী যেহেতু বৃত্তিজীবী শ্রেণী ও মূলতঃ শহরবাসী, সে-কারণ মধ্যবিত্ত চিত্র-চরিত্রের রূপায়ণে শহর ক্রমশঃ প্রাধান্য বিস্তাব করতে থাকল। লেখকদের ভৌগোলিক চেতনার এই যে ক্ষেত্র-পরিবর্তন, এ জিনিস একদিনে

কি দুদিনে সাধিত হয় নি, এই পরিবর্তন-প্রক্রিয়া আস্তে আস্তে চলতে থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে, বাংলা কথা-সাহিত্যে গ্রাম এবং শহর এখন পর্যন্ত পাশাপাশি জায়গা জুড়ে আছে এবং লেখকদের শ্রেণীগত পক্ষপাত ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সাহিত্যের ভূগোল আরও কিছুকাল এই মুখ্য দুই ধারাতেই অল্পবিস্তর সমান-সমান ভাবে বিভক্ত থাকবে বলে মনে হয়। গ্রাম থেকে শহরে ভৌগোলিক চেতনার উত্তরণের পথে শরৎচন্দ্রকে মধ্যসীমায় অবস্থিত লেখক বলা যায়। তিনি তাঁর রচনার উপজীব্যরূপে গ্রাম এবং শহর দুই পরিবেশকেই প্রায় সমান-সমান মর্যাদা দিয়েছেন—গোড়ার দিকে গ্রাম তাঁর মনোযোগের কেন্দ্র ছিল, শেষের দিকের রচনাবলীতে এই কেন্দ্র সরতে সরতে শহরের কাছ-বরাবর এসে পৌঁছেছিল। গ্রাম থেকে শহরে ভৌগোলিক চেতনার ক্রমিক পার্শ্ব-পরিবর্তন একটিমাত্র দৃষ্টান্তের দ্বারা যদি বোধগম্য করে তুলতে হয়, তা হলে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টান্ত নেওয়াই সবচেয়ে সুবিধাজনক। রবীন্দ্র-কথা-সাহিত্যেও অবশ্য এই যুগ্ম-ভৌগোলিক চেতনার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, তবে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বোধ হয় এই লক্ষণ শরৎচন্দ্রের মত পূর্ণতা লাভ করতে পারে নি। বঙ্কিমচন্দ্রের মত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীতেও সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশের প্রতি পক্ষপাত অলক্ষ্য ছিল না; অতএব নাগরিক পরিবেশকে পুরাপুরি মেনে নেওয়া বোধ হয় তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। ‘গোরা’র মত সার্থক প্রথম শ্রেণীর নগরকেন্দ্রিক উপন্যাস তিনি লিখেছেন বটে, তৎসত্ত্বেও বলা যায়, নগরজীবনের প্রাণস্বরূপ যে মধ্যবিত্ত সমাজ, সেই সমাজের সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ ছিল না। তিনি ছিলেন জন্ম-অভিজাত, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই অভিজাতই রয়ে গেলেন, টলস্টয়ের মত স্বকীয় শ্রেণীসত্তাকে বিলুপ্ত করে দিয়ে জনজীবনের সাধারণ ভূমিতে পুরাপুরি নেমে আসতে পারলেন না। কবির শ্রেণীচেতনার প্রমাণ দেবে তাঁর নাটক প্রবন্ধ ধর্মতত্ত্ব সঙ্গীত, এবং বাস্তব স্তরে তাঁর

জীবন-যাপনপ্রণালী ও স্বসৃষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ। শরৎচন্দ্রের কিংবা তৎপরবর্তী বিশিষ্ট কথা-সাহিত্যিকদের জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি, কেন না তাঁরা ওই জনজীবন থেকেই উদ্ভূত হয়েছেন, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই জনজীবনের আত্মীয় হতে পেরেছেন।

এর পরবর্তী স্তরে আমরা পাই শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণ। এটি একান্তভাবেই বিংশ শতাব্দীর দান এবং যুদ্ধ-পরবর্তী ঘটনা। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের ফলে বুর্জোয়া ভাবাদর্শে সুস্পষ্টভাবেই ভাঙন ধরে, মধ্যবিত্ত সমাজের এককালীন প্রভাব-প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের কাঠামোয় সেই-যে ফাটল ধরা শুরু হয়েছে, আজ পর্যন্ত সেই ভাঙনের প্রক্রিয়া অব্যাহত ধারায় চলে এসেছে। মধ্যবিত্ত সমাজের আজ ঘোরতর দুর্দিন উপস্থিত। বলা বাহুল্য, মধ্যবিত্ত মানসিকতাও সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ঘা খেয়েছে। মধ্যবিত্ত সমাজের এই ভাঙনের রন্ধ্রপথেই সাহিত্যে শ্রমিক সমাজের প্রবেশ। আজ শ্রমিক-জীবন বাংলা সাহিত্যে রীতিমত আসর জাঁকিয়ে বসেছে। সেই সঙ্গে সাহিত্যের ভূগোলেরও বিস্ময়কর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যে নগরোপান্ত অর্থাৎ শহরতলীর চিত্রচরিত্র এতকাল সাহিত্যে অপাংক্তেয় ছিল, রাজধানী কিংবা বৃহৎ নগরের মেখলাস্থিত সেই এতাবৎ-অনাদৃত কলকারখানার শ্রমজীবী মানুষ আর বস্তিবাসী মানুষের বিপুল জটলা সাহিত্যের পাতায় ক্রমবর্ধমান অধিকার বিস্তার করল। সেই সঙ্গে এল বেকার ভবঘুরে হা-ভাতে আর ভিখারীর গল্প, কয়লাকুঠির কথা, সাঁওতাল বাউরী কাহার মুণ্ডা হো কোল ভীল রাজবংশী কোচ প্রভৃতি বিচিত্র আদিম উপজাতিসমূহের মানুষের জীবন-রূপায়ণ। এসবই সাহিত্যের ভূগোলের সম্প্রসারণ বোঝায়। পূর্বের তুলনায় গত পঁচিশ-তিরিশ বৎসরের সাহিত্যে পরিবেশের রকমারী বৈচিত্র্য ঘটেছে তাতে কোন

সন্দেহ নেই। তার অর্থ, সাহিত্যের বিষয়বস্তু এবং পটভূমি দুইয়েরই পরিবর্তন ঘটেছে।

এই পরিবর্তনের জন্য সঙ্গতভাবেই প্রাথমিক কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকগণ। এঁরাই প্রথম বিধিবদ্ধভাবে সাহিত্যের নূতন নূতন বিষয় উদ্ভাবন করেন এবং সেই সকল বিষয়কে নূতন পটভূমিতে স্থাপন করেন। শৈলজানন্দের কয়লাকুঠির গল্প, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক', 'পোনাঘাট পেরিয়ে' প্রভৃতি রচনা, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বেদে', যুবনাশ্বের 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী', জগদীশ গুপ্তের রচনায় ভবঘুরে চরিত্রের রূপায়ণ, কাজী নজরুলের কবিতায় নির্যাতিত শোষিত সমাজের মনোবেদনার অভিব্যক্তি—এসব বিষয়ান্তর সাহিত্যের পরিবেশের দৃষ্টিগ্রাহ্য বৈচিত্র্য-সাধনে সক্ষম হল। অন্য দিকে প্রবোধকুমার সান্যাল গল্প-উপন্যাসের মধ্যে ভ্রমণ-কাহিনীর রস জারিত করে কথা সাহিত্যের একটি নূতন শাখার সূচনা করলেন। তাঁর লেখনীতে বাংলা কথা-সাহিত্যের ভূগোল হিমালয় পর্বত, খাইবার গিরিবর্ত্ম, কারাকোরাম প্রভৃতি ভারত-মানচিত্রের দূরতম বিন্দুগুলি ছুঁয়ে এল। এতকাল গল্প উপন্যাস কবিতায় যে স্বাদগন্ধে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম তা থেকে স্পষ্টতঃই ভিন্নতর স্বাদগন্ধ পাওয়া গেল। এর পর এলেন বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, বনফুল, মনোজ বসু, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ প্রভৃতি শক্তিশালী লেখকবৃন্দ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও সনাতন গ্রামজীবনকেই তাঁর রচনার উপজীব্য করলেন, তত্রাচ তার মধ্যে এক মধুর অরণ্যের রোমান্স অনুপ্রবিষ্ট করালেন। বহির্বাংলার অরণ্যসৌন্দর্যের চিত্রণও তাঁর রচনার একটি বৈশিষ্ট্য। এই অরণ্যের কাব্য বাংলা সাহিত্যের এক নূতন সম্পদ, এ জিনিস পূর্বে ছিল না। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আঞ্চলিক পক্ষপাতের প্রাবল্যহেতু তথা ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার প্রসাদে বীরভূমের রুক্ষ ধূসর

পল্লী-প্রকৃতিকে বাংলা কথা-সাহিত্যের পাতায় স্থায়ীভাবে মুদ্রিত করে দিলেন। আরও একটি কাজ তিনি করলেন : গ্রাম্য-জীবনের খিড়কি-সীমায় অবস্থিত ন্যাড়ানেড়ী বৈষ্ণব-বাউল ফকির-দরবেশ বেদে কাহার বাগদী সাঁওতাল বাউরীদের সমাজচিত্র উপস্থাপনের দ্বারা তিনি তাঁর শিল্পদৃষ্টিকে সজ্ঞানতঃ নীচুতলায় সঞ্চালিত করলেন ; এটি 'কল্লোলীয়' ঐতিহ্যেরই অনুবৃত্তি। বনফুল তাঁর গল্পে উপন্যাসে নানা রকমারী চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে নূতন নূতন পরিবেশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মনোজ বসু সুন্দরবনঘেঁষা জলজঙ্গলবেষ্টিত দক্ষিণ-বাংলার পল্লীপ্রকৃতির এক নূতন রোমান্স পরিবেশন করে অভ্যস্ত পল্লীচিত্রণের মধ্যে অভিনব স্বাদ যোজনা করলেন। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ী প্রমুখ লেখক উত্তর-বিহার, সাঁওতাল-পরগণা, ছোটনাগপুর প্রভৃতি বাঙালী-অধ্যুষিত বিহারী অঞ্চলগুলির সঙ্গে পাঠকসাধারণের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় সংসাধন করলেন। 'কল্লোল'-অতিক্রান্ত অচিন্ত্যকুমারের রচনায় পাই মফঃস্বল-শহরের উঁচুতলার জীবনের ও মুসলমান-সমাজের চিত্র। প্রমথনাথ বিশীর রচনায় পেলাম উত্তর-বঙ্গের ভৌগোলিক পরিবেশের নিপুণ রূপায়ণ—বরেন্দ্রভূমির জল-হাওয়া-আকাশ-মৃত্তিকা তাঁর লেখনীতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মানদীর মাঝির জীবন চিত্রিত করার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীবাসী মানুষের রহস্যকুহেলিসমাচ্ছন্ন দার্শনিক রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটালেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় যেন সমসাময়িক বাঙালী-জীবনের বৈচিত্র্যহীনতার প্রতিক্রিয়াবশেই তাঁর কল্পনাকে স্থাপন করলেন অতীত ভারতের পটভূমিতে। এই সব বিষয়ান্তরে মনোযোগ স্থাপনের নানাবিধ কারণ থাকতে পারে, তবে বৈচিত্র্যসন্ধান যে তাদের অন্যতম কারণ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এর পরের অধ্যায়ে যে সকল লেখক সাহিত্যের আসরে এলেন

তাঁদের মধ্যে বিষয়বস্তু ও পরিবেশনির্বাচনের দিক দিয়ে অভ্যস্ত গতানুগতিকতা যেমন আছে তেমনি বৈচিত্র্যস্পৃহার প্রমাণও আছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সমসাময়িক জীবন এবং অতীত জীবন দুই ক্ষেত্রেই সমান স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে সঞ্চরণে পটু। সমসাময়িক জীবনের রূপায়ণেও লেখকের বৈশিষ্ট্য অতি স্পষ্ট। দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের সমুদ্রস্তনিত নদীমাতৃক পল্লী অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং তিস্তা-আত্রেয়ী-মহানন্দা-করতোয়া-বিধৌত উত্তর বঙ্গের ভৌগোলিক আবহ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বর্ণনাকুশল লেখনীতে প্রাণবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে। অমরেন্দ্র ঘোষ রাঢ়দেশীয় পল্লীর শ্রেষ্ঠ কথাকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপরীতে পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলমান-অধ্যুষিত মিলিত গ্রামজীবনের স্নিগ্ধ-রূপটি অঙ্কন করে বাংলা সাহিত্যে পল্লীচিত্রের অভ্যস্ত সীমানাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্র মুখ্যতঃ নাগরিক নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের দরদী শিল্পী, কিন্তু পূর্ববঙ্গের পল্লীর অন্তরঙ্গ রূপটির সঙ্গেও যে তাঁর নিবিড় পরিচয় আছে তা তাঁর 'রস' 'পালঙ্ক' প্রভৃতি গল্প এবং 'দ্বীপপুঞ্জ' ও 'সুখদুঃখের ঢেউ' উপন্যাস পড়লেই বোঝা যায়। বিমল মিত্র ও রমাপদ চৌধুরী ভারতীয় রেলজীবনের বিশিষ্ট পরিবেশ ও রেলের কর্মীদের নিয়ে কতকগুলি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন। একদিকে নবেন্দু ঘোষের লেখায় পাই বিহারের শহরের জীবনযাত্রার রূপ, অন্য দিকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখায় আছে পর্ববঙ্গের মফঃস্বল শহরের বিশেষ স্বাদগন্ধময় পরিবেশের বর্ণন। সন্তোষকুমার ঘোষ ও বারীন্দ্রনাথ দাশ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের জীবনযাত্রা সম্পর্কে কয়েকটি সার্থক চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও দীপক চৌধুরী যুদ্ধোত্তর কলিকাতা শহরের উঁচুতলার সমাজের মানুষের আদর্শগত দ্বন্দ্ব ও স্বতোবিরোধ তাঁদের একাধিক রচনায় পরিস্ফুট করে তুলেছেন। এক সময়ে অন্নদাশঙ্কর রায় ও দিলীপ-

কুমার রায় ইউরোপীয় পরিবেশের পটভূমিতে বাঙালী অবাঙালী ও বিদেশীর চরিত্র এঁকে বাংলা কথা-সাহিত্যে যে নতুন ধারার সূত্রপাত করেন, সেই ধারারই অনুসরণ করে চলেছেন বর্তমানে সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। এই ক্ষেত্রে সৈয়দ মুজতবা আলী আর-একজন কুশলী রচনাকার। নবগোপাল দাস, দেবেশ দাশ প্রমুখ প্রথমে আই-সি-এস পরে সাহিত্যিক লেখকদের রচনায়ও এই ধারার অনুবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণারঞ্জন বসুও ইদানীং এই ধরনের কিছু গল্প লিখেছেন। 'জরাসন্ধ' তাঁর 'লৌহকপাট' পুস্তকের দুই খণ্ডে কারাজীবনের উপব আলোকপাত করে সমাজের একটি অনুদ্‌ঘাটিত দিকের পরিচয় উন্মুক্ত করেছেন। সতীনাথ ভাদুড়ী উত্তর-বিহারের একটি অবজ্ঞাত সমাজের মানুষের প্রতীকী চরিত্র অঙ্কন করেছেন তাঁর 'ঢোঁড়াই-চরিত মানস' গ্রন্থে। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে সমুদ্রের স্বাদ এনে দিয়েছেন একাধিক সমুদ্র-দ্বীপ ও নাবিক-চরিত্রের বর্ণনায়। সমরেশ বসুর রচনায় আছে কলিকাতার সন্নিহিত শিল্পাঞ্চলগুলির বস্তি-জীবনের বাস্তব চিত্র। বিমল করের একাধিক গল্পে পাই বঙ্গ-বিহার সীমানান্তর্গত সন্ধিস্থলগুলির ভৌগোলিক পরিবেশের বর্ণনা।

এই পর্যায়ের লেখকদের মধ্যে পরিবেশ-পরিবেষণায় বোধ হয় সবচেয়ে কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর 'ইস্পাতের স্বাক্ষর' নামক বৃহদায়তন উপন্যাসটির জন্য। শিল্পাঞ্চলের মানুষদের জীবনসংগ্রাম নিয়ে এত বড় বই এবং এত নিপুণ বই বাংলা সাহিত্যে ইতঃপূর্বে আর লেখা হয় নি। একটি শিল্প-শহরের পরিবেশকে লেখক চমৎকার ফুটিয়েছেন এ গ্রন্থে। এ রস বাংলা সাহিত্যে একেবারেই অভিনব। খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ভাবে শিল্পাঞ্চলের পরিবেশ কারও কারও লেখায় আগেও ফুটেছে, কিন্তু এমন অখণ্ড চিত্ররূপের সংস্থাপন এই প্রথম।

গৌরীশঙ্কর এই রচনাটির দ্বারা বাংলা কথা-সাহিত্যে সবিশেষ গৌরবের অধিকারী হলেন।

তরুণতরদের মধ্যে প্রফুল্ল রায় নাগা জীবনের উপর পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস এবং পূর্ববঙ্গের বেবাজিয়া (বেদে) সম্প্রদায়ের উপর গল্পকাহিনী লিখে বাংলা সাহিত্যের ভূগোলের বিস্তার ঘটিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর উৎসাহ যথার্থ প্রশংসার যোগ্য। সঙ্কর্ষণ রায়ের গল্পগুলির মধ্যে গল্পের স্থাননির্বাচনসূত্রে বৈচিত্র্যের স্বাদ পাই। তিনি তাঁর একাধিক গল্পে ভূ-স্তর-পরীক্ষাকার্যরত ভূ-বিজ্ঞানীকে তাঁর গল্পের মুখ্য বক্তা করেছেন, সুতরাং স্বতঃই বক্তার সঙ্গে সঙ্গে গল্পের পটভূমিটিও ভূ-পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে স্থাপিত হয়েছে। মানবেন্দ্র পালের গল্পের মধ্যে পাই পশ্চিম-বঙ্গের মফঃস্বল-শহরের জীবনযাত্রার স্নিগ্ধ বর্ণনা। সুভাষ সমাজদার বরেন্দ্রভূমির ভৌগোলিক পরিবেশের উপর একমুখী মনোযোগ সংহত করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ধারাটিরই অনুবর্তন করছেন।

ঠিক উপন্যাস-গল্প না হলেও কথাসাহিত্য-ঘেঁষা রম্য সাহিত্যের মধ্যেও নানাবিধ বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। চা-বাগানের কাহিনী, সাংবাদিকের জীবন-সংগ্রাম, ডাক্তারের আত্মকথা, লেখকদের আত্মজীবনী, অভিনেতার পুরনো কথা, ব্যারিস্টার-উকিল-অ্যাটর্ণির গল্প ইত্যাদি নানামুখী বিষয়ের উপস্থাপনের দ্বারা যেমন সাহিত্যের রসের বৈচিত্র্য ঘটছে তেমনি ভূগোলেরও সম্প্রসারণ হচ্ছে। এটি যথার্থই শুভলক্ষণ।

কিন্তু এই ক্ষেত্রে যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তাইতেই তৃপ্ত থাকা চলে না, আরও নানারকম বৈচিত্র্যের দ্বারা বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হওয়ার অপেক্ষা রাখে। একটি প্রধান বৈচিত্র্যের উপকরণ তো হাতের কাছেই রয়েছে—উদ্বাস্তু জীবন। উদ্বাস্তুদের জীবনসংগ্রামের কাহিনী নিয়ে আজও কোন উল্লেখযোগ্য সার্থক পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রচিত হল না এটি আক্ষেপের বিষয়। আমি পূর্বেই বলেছি, পাঠকের মনে

পরিচিতের আকর্ষণের পাশে পাশে অপরিচয়ের মোহও বড় কম থাকে না। পাঠকমনের এই শেষোক্ত মোহের চরিতার্থতার জন্যই সাহিত্যের ভূগোলের প্রভূত বিস্তৃ'ত সাধিত হওয়া দরকার। এই নূতনত্বস্পৃহা পুরাতনের প্রতি সম্ভ্রমবোধের অভাব বোঝায় না, বোঝায় বৈচিত্র্যের প্রতি মানবীয় স্বভাবের মজ্জাগত আকর্ষণী প্রবৃত্তি। বাংলা সাহিত্যের উদার দাক্ষিণ্যের ভাণ্ডার থেকে এযাবৎ যা পেয়েছি তা তো আছেই, তার উপর আরও বৈচিত্র্য চাই। পুরাতন যত ভালই হোক, তার ক্রমাগত পুনরাবৃত্তিতে একঘেয়েমির সৃষ্টি না হয়ে পারে না। নূতন নূতন পরিবেশের অবতারণার দ্বারা এই একঘেয়েমির চাপমুক্ত হওয়া দরকার। এই প্রয়োজনবোধের তাড়না থেকেই বর্তমান নিবন্ধে লেখকদের বরাবরে বৈচিত্র্যের আবেদনটুকু পেশ করা গেল।

উপন্যাসের প্রকৃতিবিচার

বাংলাদেশে সার্থক উপন্যাস খুব বেশী রচিত হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রের আমল থেকে এ পর্যন্ত যে কটি উৎকর্ষ-লক্ষণমণ্ডিত উপন্যাস লেখা হয়েছে তা বোধ হয় দু আঙুলের মাথায় গুনে শেষ করা যাবে। কেন বাংলাদেশের জল-হাওয়ায় মহৎ উপন্যাস তৈরী হয় না? সার্থক উপন্যাসরচয়িতার সংখ্যা লেখকসম্প্রদায়ের এমন বিস্তার সত্ত্বেও এত সীমাবদ্ধ কেন? বাংলা দেশের লেখকবৃন্দ কবিতায়, ছোটগল্পে, চিত্তবিনোদনকারী লঘু রচনায় এবং অন্যান্য ধরনের সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যপ্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং এখনও দেখাচ্ছেন; কিন্তু উপন্যাসের বেলায় তাঁদের কৃতিত্ব সমানুপাতিক নয় কেন? শ্রেষ্ঠ উপন্যাসসমূহের নাম করতে হলে বারবারই কেন আমাদের ঘুরে ফিরে 'কপালকুণ্ডলা,' 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ', 'গোরা', 'শ্রীকান্ত', 'গৃহদাহ', 'পথের পাঁচালী' 'পঞ্চগ্রাম' জাতীয় পাঁচ-সাত-খানা বইয়েরই নাম করতে হয়? এক ডজন অন্ততঃ ভাল উপন্যাসের নাম করতে গেলেই আমাদের মাথা চুলকোতে হয় কেন? এই অবস্থার কারণ বিশ্লেষণ করে দেখাটা মন্দ নয়। তাতে আর কোন লাভ হোক আর না হোক কথা-সাহিত্যরচয়িতাদের মধ্যে আত্মানুসন্ধানের প্রবৃত্তি জাগ্রত হলেও হতে পারে। আত্মানুসন্ধানের ফলে মানসিক অপূর্ণতা শোধনের ইচ্ছা বলবতী হওয়া বিচিত্র নয়।

সার্থক উপন্যাস রচনা করতে হলে লেখকের পক্ষে যে জিনিসটি আয়ত্ত করা দরকার তা হচ্ছে জীবন সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। উপন্যাসে শুধু কাহিনীবয়নের নৈপুণ্য প্রদর্শন করলেই হল না, সেই সঙ্গে সুগভীর জীবনদর্শনও গ্রথিত থাকা চাই। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটা দার্শনিক দৃষ্টি, একটা প্রজ্ঞা-দৃষ্টি

অর্জন করতে না পারলে উপন্যাসের ভিতর কাহিনীর রম্যতার অতিরিক্ত কোন গুণের সমাবেশ করা সম্ভব হয় না। অথচ এই অতিরিক্ত গুণের সমাবেশ না হলে উপন্যাস উপন্যাস নামের যোগ্য হয় না। যে কোন লেখক অন্য কোন সুসঙ্গত মাল-মসল্লার অভাবে নিজের জীবনের ইতিবৃত্তটাকেও যদি ঘটনা-পরম্পরাক্রমে সাজিয়ে লেখেন তা হলে মোটামুটি একটা উপন্যাসের চেহারা দাঁড়ায়। অন্ততঃ আমাদের সাহিত্যে যে সকল রচনা সচরাচর উপন্যাস নামে পরিচিত, যার যার নিজের জীবনের কাহিনী সাজিয়ে তেমন একখানা গ্রন্থ যে অনায়াসে লেখা যায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কোন এক বিদেশী সমালোচক বলেছেন যে, যে কোন ব্যক্তি একখানা অন্ততঃ উপন্যাস রচনার ক্ষমতা রাখেন; সেই একখানি উপন্যাস হল তাঁর আত্মজীবনী। এতে পরের জীবন পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয় না, বস্তুতঃ কোনরূপ পর্যবেক্ষণশক্তিবই প্রয়োজন হয় না; নিজের জীবনের ঘটনাগুলি মনে রাখাটাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট। কিন্তু আত্মজীবনীই হোক আর পরজীবননির্ভর রচনাই হোক, নিছক কাহিনীসর্বস্ব উপন্যাস রচনার কোন অর্থ হয় না। উপন্যাসের ভিতর যদি জীবনরহস্যের তাৎপর্যের বোধ অনুস্যূত না থাকে, লেখক কাহিনীবয়নের ছলে যে সকল ঘটনার সূত্র একত্রিত করেন তার অন্তর্নিহিত ঐক্যটি যদি তিনি না দেখাতে পারেন, তা হলে শুধু একটি গল্প দাঁড় করিয়ে কী লাভ? পথ চলতে চলতে একটি ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ের দেখা হল, রুমাল কুড়িয়ে দেবার ছলে তাদের মধ্যে আলাপ হল, আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হল, ঘনিষ্ঠতা প্রেমে, তার পর চিরাচরিত অদর্শন, বিরহ, মিলনাকাঙ্ক্ষা, মিলন—এই যে কাহিনীর ছাঁচ, যা অধিকাংশ বাংলা উপন্যাস নামীয় রচনার উপজীব্য বিষয়—এর দ্বারা সাহিত্যেরও কোন উপকার হয় না, সাহিত্যরচয়িতারও কোন উন্নতি হয় না। এমন রচনা অপরিণতমনা অর্ধশিক্ষিত কলেজপড়ুয়া বালক-বালিকাদের

ভাল লাগতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে যাঁরা গভীরত্বের সন্ধানী, কথা-সাহিত্যকে যাঁরা জীবন-সমালোচনার অনেক ফলপ্রদ মাধ্যমের মধ্যে অন্যতর প্রধান মাধ্যম বলে মনে করেন, তাঁরা কেন এ-জাতীয় হাল্কা রচনায় সন্তুষ্ট হবেন? আমাদের সমসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে যে দেশের গুণীজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট শ্রদ্ধা নেই, যাঁরা সাহিত্যের চর্চায় নিয়োজিত আছেন, বিশেষতঃ তথাকথিত সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য নিয়ে যাঁরা আছেন তাঁদের ব্যক্তিত্ব যে জনগণের মধ্যে যথোপযুক্ত সম্ভ্রমের ভাব উদ্রেক করে না তার একটা কারণ বোধ করি এই যে, আমরা আজকাল বড্ড বেশী তরল সাহিত্য পরিবেশনে মেতেছি। বিশেষ, উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই মনোভাব অতিশয় প্রকট। বেশীরভাগ লেখকই হয় উপন্যাসের নামে বড় গল্প লেখেন, নয়, নিছক কাহিনীসর্বস্ব রচনা দাঁড় করান। রচনার মধ্যে প্রজ্ঞা-বুদ্ধির ছাপ না থাকলে, জীবনবোধের পরিচয় না থাকলে যে সে রচনা উপন্যাস নামের যোগ্য হয় না এই চেতনা জাগ্রত হতে এখনও বাকী। ফলে সঙ্গতভাবেই উপন্যাস সম্বন্ধে পাঠকদের আক্ষেপের কারণ থেকে যাচ্ছে। আমি গিন্নী শ্রেণীর পাঠিকা, ছোকরা পাঠক কিংবা বালিগঞ্জের ড্রয়িংরুম-বিহারিণী তরুণী পাঠিকার কথা বলছি না, সত্যকারের সাহিত্যপাঠকের প্রতিক্রিয়ার কথাটাই এখানে বলছি।

বাংলাদেশে কবিতা হয়, ছোটগল্প হয়, রম্যরচনা হয়, কিন্তু উপন্যাস জন্মায় না, প্রবন্ধ নিবন্ধ সমালোচনা-সাহিত্য জন্মায় না—এর কারণ কী! এর কারণ কি এই নয় যে, আমরা জাতি হিসাবেই কিছুটা পরিমাণে খণ্ডরসের সাধক—বৃহৎ ভাব, মহৎ কল্পনা, বলিষ্ঠ ধ্যান-ধারণা আমাদের মগজে গিয়ে পৌঁছায় না? বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মনীষাসম্পন্ন লেখক বঙ্কিমচন্দ্র এবং সাধারণভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর র‍্যাশনালিস্ট লেখকগণ আমাদের যে যুক্তিবাদের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, চিন্তাশীলতার শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন—পরবর্তী

অভিজ্ঞতায় বলতে পারা যায়, সে শিক্ষা একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ঋজু মনস্বিতা আর চারিত্রিক দার্ঢ্যের আদর্শ গ্রহণ করি নি, করেছি রবীন্দ্র আর শরৎ-সাহিত্যের খাত-বেয়ে-আসা লালিত্য, কমনীয়তা আর ভাবালুতার আর্দ্র আদর্শটিকে। সৌন্দর্যচর্চার নামে এক ধরনের মেরুদণ্ডহীন ভাববিলাসিতায় দেশ ভরে গেল। এক হিসাবে দেখতে গেলে, বঙ্কিমচন্দ্র আর যুক্তিবাদী লেখকদের এ বিষয়ে বিশেষ কিছু করবার ছিল না; আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যেই একটা মূলগত বিচ্যুতি রয়ে গেছে। এই বিচ্যুতি আর কারও চোখে পড়ুক আর না-পড়ুক, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের চোখে পড়েছিল এবং তিনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন'-এ পঠিত এক ইংরেজী প্রবন্ধে (৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত এবং 'সাহিত্য' জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ সংখ্যায় প্রকাশিত) তাব প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশও করে গিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রোগনির্ণয় অভ্রান্ত এবং সেই রোগের নিরাকরণকল্পে তিনি যে ব্যবস্থা দিয়েছেন তাও অব্যর্থ। কিন্তু এই নেতৃশ্রেষ্ঠ মনীষীব কথায় কর্ণপাত করবার মত আমাদের ধৈর্যই বা কোথায় আগ্রহই বা কোথায়। সংস্কৃত কবি জয়দেবের আমল থেকে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ সাত শত বৎসর ললিতমধুর নমনীয়-কমনীয় খণ্ড কবিতা আর গীতি-কবিতার রসায়নে আমরা এমন ভাবে রসায়িত হয়েছি যে বীর্যবত্তা, শৌর্য, চারিত্রিক দৃঢ়তা, দার্শনিকতা, চিন্তাশীলতা, জ্ঞানস্পৃহা আমাদের মধ্য থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেছে বললেও চলে। যা মানুষকে ভাবায়, কর্মে প্রণোদিত করে, মহত্ত্বের প্রেরণা দেয়, তেমন ভাবসকলের প্রতি আমাদের আস্থা নেই, আমরা সব মৃণালভুক্ আলস্যবিলাসী কামকলাপরায়ণ এক নিরীহ জাতি, শুধু দু হাতের আঁজলা ভরে তরল সোমসুধা পান করতেই ব্যগ্র। আমাদের সাহিত্যের যুক্তিবাদী মনোভঙ্গীর মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের ললিতগীতিপ্রবণ লতানে

স্বভাবই মূলতঃ দায়ী এবং সৌন্দর্য আর আনন্দের আদর্শ পরিবেশনের আবরণে এই সহজিয়া ভাব যে বাঙালী জাতির কত বড় অহিত সাধন করেছে তা ভাবালুতার আতিশয্যে আজকের মানুষ উপলব্ধি করতে না পারলেও ভবিষ্যতের মানুষ ঠিকই উপলব্ধি করতে পারবে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনাকে লালিত্য আর কোমলতার বন্যায় যাঁরা ভাসিয়ে দিলেন এ দায়িত্ব তাঁদেরই বইতে হবে।

আমাদের প্রায় এক হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে কাব্যসমুদ্র থৈ থৈ করছে, যেদিকে তাকানো যায় সেই দিকেই কেবল জল আর জল। দেখে দেখে চিত্ত আমাদের বিকল হয়ে গেছে। এই সুবিশাল জলরাশির মধ্যে সুদৃঢ়ভূমিযুক্ত দ্বীপের মত শোভা পাচ্ছে মাত্র কয়েকটি বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ—'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', কৃত্তিবাসী রামায়ণ, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্য-চরিতামৃত', 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী', 'অন্নদামঙ্গল,' কাশীদাসী মহাভারত, আলাওলের 'পদ্মাবতী'; তার পরই এক ধাপে এ যুগের প্রান্তে এসে 'মেঘনাদবধ কাব্য,' 'পদ্মিনী-উপাখ্যান', 'বৃত্রসংহার,' 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্র' 'প্রভাস' ইত্যাদি। এ বাদে আর যা-কিছু তার প্রায় পনেরো-আনাই তো খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত কান্ত পদের সমষ্টি। বৈষ্ণব কবিতা, চরিতকাব্য, মঙ্গলকাব্য আর লোকরঞ্জক গ্রামীণ কাব্য-সাহিত্যের ছড়াছড়ি। এই যেখানে অবস্থা সেখানে জাতীয় চরিত্র দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপযোগী উপকরণ কেমন করে খুঁজে পাওয়া যাবে? আর জাতীয় চরিত্র দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে বড়রকমের সাহিত্য-সৃষ্টিই বা কী প্রকারে সম্ভব? সাহিত্য তো কেবল হাল্কা কবিতা, গল্প আর রম্যরচনার ঝুমঝুমি খেলেনা নয় যে শিশুর চমৎকৃত চক্ষুর সামনে তাকে নেড়ে-চেড়ে গেলেই হল। সাহিত্যের উদ্দেশ্য অনেক বেশী মহৎ ও বিশাল। জাতির সঞ্জীবনী প্রেরণার আধারস্থল যে সাহিত্য, সেই সাহিত্যকে দিয়ে যদি কেবলই সস্তা লোকরঞ্জনের কাজ করানো হয় তা হলে জাতীয় মানসের লঘুতা তো ঘটবেই।

খণ্ড-কবিতা আর লঘু রচনার সাহায্যে কেবলই যদি শিশুকে চামচ-আহার করানো হয় তা হলে সে শিশুর বৃদ্ধি কি কোন কালেই হওয়া সম্ভব?

এ সব কথা উপন্যাসের আলোচনা-প্রসঙ্গে আপাত-বিচারে কিঞ্চিৎ অবান্তর মনে হতে পারে, কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, দুইয়ের মধ্যে সংযোগসূত্র কোথাও একটা আছে, যা সূক্ষ্ম-দর্শীর অন্ততঃ নজর এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। আমাদের জাতীয় চরিত্র নেই, বলিষ্ঠতার সাধনা নেই, মনুষ্যত্বের অনুশীলন নেই; আমরা উপন্যাস সৃষ্টি করব কী। শুধু রম্য কাহিনী বয়ন করাই যদি উপন্যাসের শিল্পলক্ষণ হয় তা হলে সে-জাতীয় লেখক বাংলা সাহিত্যে অন্ততঃ শ' দুই আছেন। তাঁদের কারও কারও লিপিনৈপুণ্য রীতিমত বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিন্তু কাহিনীবয়নক্ষমতাই তো সব নয়, লিপিনৈপুণ্যই তো সব নয়; সত্যিকার উপন্যাসসৃষ্টিতে আরও এমন-কিছু চাই যা জীবনসাধনার অপেক্ষা রাখে। সার্থক উপন্যাস রচনার যে মানদণ্ড আমাদের মনে আছে এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের কতিপয় শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের দৃষ্টান্তের দ্বারা আমাদের যে ধারণা আরও পুষ্ট হয়েছে, সেই মানদণ্ড আর ধারণা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আমাদের মনে উপন্যাসের উৎকর্ষের সঙ্গে জীবনবোধের গভীরতা ওতপ্রোত হয়ে আছে। জীবনবোধের এই গভীরতা প্রজ্ঞাদৃষ্টি ছাড়া আয়ত্ত করা যায় না, আর চিন্তাশীলতা শুধু তাঁরই মধ্যে থাকা সম্ভব, জীবনের ক্ষেত্রে যিনি বাস্তবের সঙ্গে পদে পদে গভীর সংঘাতের মুখোমুখী হয়েছেন। অন্তর্দ্বন্দ্ব না ঘটলে মনের ভিতর চিন্তার আবর্ত সৃষ্টি হয় না, জীবনের স্বরূপ বোঝা যায় না। বিক্ষোভ-সংক্ষোভে মনের প্রশান্তি অনেকখানি বিনষ্ট হয় সত্য, কিন্তু ওই পথে ছাড়া জীবনের গভীরতায় পৌঁছনোর দ্বিতীয় রাস্তাও বোধ হয় নেই। কাজেই শিল্পী-মাত্রকে শুধু শিল্পের সাধনা করলেই হয় না, জীবনের

সাধনাও করতে হয়। বিশেষতঃ উপন্যাস-শিল্পীকে তো বটেই। তাঁকে প্রজ্ঞা-দৃষ্টির অধিকারী হতেই হবে। তাঁর একটি সুস্পষ্ট জীবনদর্শন থাকা চাই। যে উপন্যাস-শিল্পী মনে করেন শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ দ্বারা তিনি উপন্যাসের সর্ববিধ উপকরণ আহরণ করবেন, তিনি পর্যবেক্ষণক্ষমতার উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করছেন। নিছক পর্যবেক্ষণজাত অভিজ্ঞতার বর্ণনার দ্বারা বাজার মাত করবার আশা দুরাশা মাত্র। উপন্যাস-লেখকের শুধু ঘটনা আর মানুষ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেই হল না, তাঁর অন্তর্নিবেশেরও (introspection) ক্ষমতা থাকা চাই। আত্মানুসন্ধান আর আত্মজ্ঞানের সাধনার দ্বারা যিনি নিজ জীবনকে তলিয়ে বিচার করেন নি, তিনি অপরের জীবনের রহস্য ভেদ করবেন কী প্রকারে? জীবনে যিনি চারিত্র্য আব বলিষ্ঠতা আর সততার অনুশীলন করেন নি, তিনি বলিষ্ঠ, সৎ চরিত্র সৃষ্টি করবেন কোন্ রূপকথার জাদুমন্ত্রেব সাহায্যে?

শিল্পী অবশ্য অনুমানের দ্বারা, কল্পনার দ্বারা অনেক কিছুই উদ্ভাবন করতে পারেন; কিন্তু বলিষ্ঠতার বীজটুকু তাঁর নিজের মধ্যে থাকা চাই, আদর্শবাদী মনোভঙ্গীটুকু তাঁতে সহজাত হওয়া চাই। তা নয় তো তিনি কোন্ 'সামান্য' ধর্মের প্রসাদে নির্ভীক আর চারিত্রবলযুক্ত মানুষের অন্তরে প্রবেশ করবেন, তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করবেন? দেখেশুনে মনে হয়, অনুমানশক্তি তথা কল্পনা-কুশলতার উপর আমরা এক-এক সময় বড্ড বেশী ঝোঁক দিয়ে ফেলি। কল্পনাশক্তি হাওয়ায় ভেসে আসে না, ওটির বিষয়ীভূত অনেক উপকরণ অঙ্কুর আকারে নিজ চরিত্রের মধ্যেই লুক্কায়িত থাকে। সযত্ন জীবন-অনুশীলনের দ্বারা যিনি স্বীয় চরিত্রের এই প্রচ্ছন্ন সদ্‌বৃত্তিগুলির পরিস্ফুটন ঘটান না তিনি মহৎ চরিত্র কিছুতেই নির্মাণ করতে পারেন না। সোনার পাথর বাটির মতই এ জিনিস অসম্ভব।

শিল্পালোচনার প্রসঙ্গে চারিত্রসাধনার কথায় কেউ কেউ সমালোচককে চারিত্রবাতিকগ্রস্ত মনে করতে পারেন, কিন্তু সমালোচক এ ক্ষেত্রে নাচার। চিন্তাভাবনা আর আত্মবিশ্লেষণ করে করে লেখক এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শিল্পী নিজ জীবনে বলিষ্ঠতার পরিপোষক না হলে তিনি তাঁর সাহিত্যে বলিষ্ঠ মনোভঙ্গীর জন্মদান করতে পারেন না। [মহৎ উপন্যাসসৃষ্টি সাধনার অপেক্ষা রাখে—কি শিল্পে কি জীবনে। ক্ষুদ্রমনা, ক্ষুদ্র-আশা-আকাঙ্ক্ষাযুক্ত লেখকদের সাধ্য নয় ওই কাজের যোগ্যতা অর্জন করে।] যে সকল লেখক অজ্ঞতা আর ক্ষমতার অভাব বশতঃ নিতান্ত নীচু পর্দায় তাঁদের সুর বেঁধেছেন তাঁদের সাধ্য কি তাঁরা উঁচু পর্দাব নাগাল পাবেন। [মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে মহৎ ভাবনা-কল্পনার উচ্চগ্রামে বিচরণ করতে হয়, সুতীব্র অভীপ্সা আর আকূতির দ্বারা নিজ জীবন ভরপুর করে তুলতে হয়। তাঁদের পক্ষে শিল্পসাধনা আর জীবনসাধনা এক সীমানায় এসে মিলিত হয়। শুদ্ধমাত্র শিল্পেব বেলায়ও তাঁদের দৃষ্টি দূরপ্রসারী হওয়া চাই, অনুভূতি সুনিবিড় হওয়া চাই। ছোট মাপের ধনুকে ছোট তীব যোজনা করে যাঁরা দূরের লক্ষ্য ভেদ করতে চান তাঁরা নিতান্ত ভ্রান্তির স্বর্গে বিরাজ করছেন।]

উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের যে প্রবন্ধের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—"বাঙ্গালী জাতি এইভাবে, জয়দেবের কাল হইতে ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত, এই দীর্ঘকাল কেবল কাম-কবিতায় বুদ্ধি ও চিত্তের তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন। স্থবির, দুর্বল, কর্মহীন, কোমল জাতির পক্ষে এই সাহিত্যই উপযোগী; উহার দ্বারাই বাঙ্গালীব মনীষার পুষ্টিসাধন হইয়াছে। তাই মনুষ্যত্বের পরিপোষক উচ্চভাব, উন্নত আকাঙ্ক্ষা বাঙ্গালীর সাহিত্যে স্থান পায় নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথাগুলি যদি মনে রাখা যায় তা হলে কেন আমাদের সাহিত্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় মহৎ রচনার অভ্যুদয়

হচ্ছে না, সার্থক উপন্যাস রচিত হচ্ছে না, সেই উদ্ঘাটন সহজতর হবে। দুর্বল কোমল কর্মবিমুখ জাতির লেখক শুধু খণ্ড-কবিতা লিখতে পারেন, ছোটগল্প লিখতে পারেন, রম্যরচনা লিখতে পারেন, মহৎ উপন্যাস লেখা তাঁর সাধ্য নয়।

এপিকধর্মী বৃহদায়তন এক-একটি উপন্যাস এক-একটি মহাকাব্যের মত। ওই 'এপিক' নামকরণের মধ্যেই তার প্রকৃতিপরিচয় নিহিত। মহাকাব্যের মতই মহা-উপন্যাস একটা বিরাট্ পরিকল্পনার ব্যাপার। তার নানামুখী বেগ, নানামুখী গতি। বহু বিচিত্র ঘটনা আর চরিত্রকে একটি কাহিনীর আধারে সংহত করে তাদের কেন্দ্রগত ঐক্য প্রদর্শন করাই হল সার্থকনামা উপন্যাসের প্রধান কাজ। মহাকাব্যকে যেমন একটা বিশেষ তাৎপর্যের দ্বারা অন্বিত করতে হয় তেমনি মহা-উপন্যাসের মধ্যেও একটা বিশেষ গূঢ়ার্থের সঞ্চার করতে হয়। প্রতি সার্থক আর মহৎ উপন্যাসের একটা message থাকে, যা জাতিকে অনুপ্রাণিত করে, উজ্জীবিত করে। টলস্টয়ের 'রেসারেকশন' ও 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস', ডস্টয়েভ্স্কীর 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' ও 'দি ইডিয়ট', রলাঁর 'জাঁ ক্রিসতফ্', গলসোয়ার্দির 'ফরসাইট সাগা', টমাস মানের 'দি ম্যাজিক মাউণ্টেন' এবং আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিম-চন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'রাজসিংহ', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' ও অন্যান্য আরও দু-চারটি গ্রন্থ— প্রতি রচনার পিছনেই একটি করে মহৎ বাণী সংগ্রথিত রয়েছে। আর মহৎ বাণীর প্রসঙ্গ ছেড়ে দিলেও, যে-কোন সার্থক উপন্যাসে নানামুখী ঘটনার স্রোতকে একমুখী করে একটি বিশেষ পরিণামের মোহনায় সঙ্গত করতে যে গভীর অভিনিবেশের প্রয়োজন হয় তার বুঝি তুলনা নেই। মানুষের জীবনের বিভিন্ন বৃত্তি আর গুণপনাকে একটি কেন্দ্রীয় ঐক্যের মধ্যে সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করতে না পারলে যেমন জীবন থেকে পরিপূর্ণ সুফলের আশা

করা যায় না, তেমনি উপন্যাসের বিচিত্র ভিন্নমুখী প্রবণতাগুলিকেও নিপুণ হস্তে একটি মহামিলনের মধ্যে এনে মেলাতে হয়। এই integration-এর ক্ষমতা যাঁর যত বেশী তিনি তত সার্থক উপন্যাসকার। এ কাজে প্রচণ্ড অভিনিবেশের প্রয়োজন হয়। সেই আবেগ আসে শিল্পীর জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য থেকে, তাঁর মনোভঙ্গীর উৎকর্ষ থেকে। প্রথমতঃ মহৎ উপন্যাসের পরিকল্পনাটাই একটা দুরূহ ব্যাপার; তার উপর সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী উপন্যাস-সৌধ গড়ে তোলার কাজ আরও অনেক বেশী দুরূহ। শেষোক্ত কাজে শিল্পীর সবটুকু উদ্যম আর সবটুকু মনঃসংযোগের ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। এ হেঁজিপেঁজি লেখকের কাজ নয়, উচ্চ চিন্তার মার্গে যাঁরা সদা-সর্বদা বিচরণ করেন, যাঁরা মহৎ অভিপ্রায়ের দ্বারা জীবন এবং শিল্প দুইকেই সমৃদ্ধ করতে ঐকান্তিক যত্নপর, তাঁরাই শুধু ওই পরিকল্পনা আর ওই পরিকল্পনার রূপায়ণের ক্ষমতা রাখেন।

উপন্যাস নানা ধরনের হতে পারে। বাস্তবধর্মী কিংবা রোমান্টিক; আবেগপ্রধান কিংবা মননপ্রধান। বাংলা সাহিত্যে আবেগপ্রধান উপন্যাসেরই প্রাধান্য। আবার বিষয়গত শ্রেণীবিভাগের দিক থেকে উপন্যাস সামাজিক, ঐতিহাসিক, তত্ত্বমূলক কিংবা সমস্যামূলক হতে পারে। এ ছাড়া নতুন আর-একটি শ্রেণীবিভাগ করা যায়, যা একান্তই হালের জিনিস—গতানুগতিক রচনাশৈলীর উপন্যাস, নূতন আঙ্গিকের উপন্যাস। উপন্যাসের নব নব আঙ্গিক নিয়ে ওদেশে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। তার সবগুলিই ধোপে টিকবে এমন মনে হয় না, তবে নিছক অভিনবত্বের মোহ ছাড়া যেখানে সুষ্ঠু আত্মপ্রকাশের আন্তরিক তাগিদেই নতুন আঙ্গিকের জন্ম, সে ক্ষেত্রে অন্য রকম ফল হতে পারে। কিন্তু যিনি যে ধরনের উপন্যাসই রচনা করুন না কেন, তাকে শিল্পসাফল্যের

অ্যে উত্তীর্ণ করতে হলে উপরে যে সব নির্দেশের কথা বলা হয়েছে সেগুলি অনুসরণ করা ছাড়া বোধ হয় গত্যন্তর নেই।

কথাসাহিত্য-শিল্পীদের স্মরণ রাখা দরকার, ছোটগল্প আর উপন্যাসের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। ছোটগল্প লিখলেই যে ভাল উপন্যাস লেখা যাবে এমন কোন কথা নেই। পক্ষান্তরে, উৎকৃষ্ট উপন্যাস-লেখক জীবনে দু-চারটির বেশী ছোটগল্প লেখেন নি এমন হওয়াও আশ্চর্য নয়। ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে আমরা শেষোক্ত কথার প্রমাণস্বরূপ ডিকেন্স, ডস্টয়েভস্কী, রলাঁ, গলসোয়ার্দি প্রমুখের নাম করতে পারি; বাংলা সাহিত্যে এ কথার উজ্জ্বল প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্র। ছোটগল্প আর খণ্ড-কবিতা সমধর্মী; উপন্যাস, যে কথা পূর্বে বলা হয়েছে, মহাকাব্যের স্বগোত্র। ছোটগল্প চকিতে আভাসিত একটি উজ্জ্বল-মুহূর্তধৃত মানুষ বা ঘটনার কাহিনী; উপন্যাসের কারবার সমগ্র জীবন নিয়ে। ছোটগল্প একটিমাত্র বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত; উপন্যাসের বিস্তার সুবিশাল। ছোটগল্পে জীবনের খণ্ডাংশের রূপায়ণ; উপন্যাসে শুধু একের জীবন নয়, একাধিক মানুষের জীবনের রূপায়ণ এবং সে রূপায়ণও যতদূর সম্ভব পূর্ণাঙ্গ। ছোটগল্পে লেখকের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর দার্শনিকতার হদিশ মেলে না। ছোটগল্পের ক্ষুদ্র পরিসরের ভিতর দার্শনিকতার অবতারণার অবকাশ একান্তই সংকুচিত। কিন্তু উপন্যাসে লেখকের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী এবং দার্শনিকতা এতদুভয়েরই ছাপ থাকা চাই। লেখক প্রগতিশীল কি প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারার পোষক তা যেমন তাঁর উপন্যাস থেকে বোঝা যায়, তেমনি তিনি প্রজ্ঞাযুক্ত কি সাধারণ পর্যবেক্ষণনির্ভর মামুলী লেখক তাও তাঁর রচনার ধারায় অস্পষ্ট থাকে না। পর্যবেক্ষণের তলায় দার্শনিকতার বুনিয়াদ থাকলে বর্ণনার স্বাদই অন্যরকম হয়; নিছক পর্যবেক্ষণ-জনিত অভিজ্ঞতার বিবৃতিতে সেই স্বাদ থাকে না। নিছক

পর্যবেক্ষণজনিত অভিজ্ঞতার লিপিকরণ আর সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের (reporting) মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। আধুনিক বেশীরভাগ উপন্যাসের লিপিভঙ্গীই এই স্বাদহীন সাদামাঠা প্রতিবেদনের স্তরে এসে ঠেকেছে। মহৎ ভাবনা আর মহৎ কল্পনার প্রতিবেধ ছাড়া এই অবস্থার প্রতি-কারের অন্য উপায় আছে বলে আমাদের জানা নেই।

সাহিত্যে বাস্তববাদ

সাহিত্যে যাঁরা রিয়ালিজ্‌ম্‌-এর প্রবক্তা তাঁরা বলেন, সত্য হল সাহিত্যের মূল ভিত্তি, কাজেই সাহিত্যশিল্পীর পক্ষে সত্য সর্বাবস্থায় আশ্রিতব্য। সত্যের রূপ যতই নগ্ন নিষ্ঠুর হোক, সে রূপ দেখে ভয় পেলে চলবে না, তাকে নিরাবরণ স্পষ্টতায় সকলের চোখের সামনে তুলে ধরতে হবে। কবির ভাষায়—যা সৌন্দর্য তা-ই সত্য, যা সত্য তা-ই সৌন্দর্য। এই মানদণ্ডের বিচারে বাস্তব সত্যের আদর্শ থেকে শিল্পীর কোনমতেই ভ্রষ্ট হওয়া চলে না।

ঠিক কথা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, এই সত্য নীতি কার্যতঃ প্রয়োগ করতে গিয়ে বাস্তববাদীরা প্রায়শঃ তার বিকার ঘটান। আদর্শটি মূলতঃ যা, বাস্তববাদীর স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যায় তার স্বরূপের বদল ঘটে, এবং যখন সেটি সত্যি সত্যি সাহিত্যের পাতায় কার্যতঃ প্রযুক্ত হয় তখন তা তার মৌলিক রূপ থেকে একেবারেই ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। বাস্তববাদীরা উল্লিখিত প্রসিদ্ধ কবিকথার শেষ অংশটিকে মাত্র স্বীয় প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেন; কিন্তু উক্তিটির প্রথমার্ধ যে শেষার্ধের মতই সমান মান্য সে কথা আর তাঁদের খেয়াল থাকে না। স্মরণ রাখা দরকার, যা সৌন্দর্য তা-ই সত্য। অর্থাৎ সৌন্দর্যেরই আর-এক নাম সত্য। তথাকথিত বাস্তববাদীরা তাঁদের শিল্পপ্রয়াসের ভিতর এই নীতি কত দূর মেনে চলেন, সে প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই উত্থাপন করা চলে।

'সাহিত্য জীবনের দর্পণ', 'জীবনকে যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তোলাই হল শিল্পীর প্রধান কাজ'—এই সব এবং এই-জাতীয় অন্যান্য উক্তি বাস্তববাদীদের একটি প্রধান নির্ভর। কিন্তু জীবনকে তার অবিকৃত স্বরূপে ফুটিয়ে তোলাটাই যথেষ্ট নয়, সেই পরিস্ফুটন সৌন্দর্যসম্মতও হওয়া চাই। শিল্পের স্বকীয় রীতিপদ্ধতি উপেক্ষা

করে কেবলমাত্র বাস্তবসঙ্গতির আদর্শের উপর সবটুকু ঝোঁক আরোপ করলে বড়জোর রিয়ালিটির ফোটোগ্রাফ পাওয়া যাবে, কিন্তু সে জিনিস কখনও শিল্পপদবাচ্য হবে না, হতে পারে না। সৎ-অসৎ, সুন্দর অসুন্দর, শ্লীল-অশ্লীল প্রভৃতি জীবনের বিচিত্র দিক শিল্পের উপাদান হতে পারে—বস্তুতঃ শিল্পের উদার দৃষ্টিতে জগৎ-সংসারের কোন কিছুই অনাবশ্যক বা অপাংক্তেয় নয়—তবে শিল্প-সাহিত্যের এই ঔদার্যনীতি একেবারে শর্তবিরহিত নয়। সাহিত্য জীবনের সর্ববিধ বৈচিত্র্যকে আপনার পরিধির অভ্যন্তরে স্থান দিতে প্রস্তুত, কিন্তু নিছক বাস্তবসঙ্গতির আদর্শের প্রতি মোহবশতঃ নয়। এ ক্ষেত্রে দুটি মূল নীতি সাহিত্যের সকল তৎপরতার নিয়ামক। এক—অভিপ্রায়ের সততা; দুই—শিল্পের স্বকীয় আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা। অভিপ্রায়ের সততা অর্থে বুঝি আদর্শবাদ, আর শিল্পের স্বকীয় আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা বলতে বুঝি স্বাভাবিক শিল্পবোধ, স্বাভাবিক শিল্পদক্ষতা। শিল্পপ্রয়াসের ভিতর এই দুই সংগ্রথিত হলে তবেই রিয়ালিজ্‌ম্‌ মান্য, নচেৎ নয়।

অভিপ্রায়ের সততা বলতে কী বুঝি সেটি আরও বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। যে কোন শিল্পসৃষ্টিতে শিল্পীর উদ্দেশ্য সাধু হওয়া অত্যাবশ্যক। শিল্পী জীবনের নগ্ন চিত্র উন্মোচন করে দেখাতে পারেন, কিন্তু সেই উদ্ঘাটন যদি নিছক নগ্নতার জন্যই নগ্নতা পরিবেশন হয়, সে ক্ষেত্রে আপত্তি না জানিয়ে পারা যায় না। একাধিক তথাকথিত বাস্তববাদী লেখক আছেন, যাঁরা জীবনের বাস্তব চিত্র পরিবেশন করতে গিয়ে পাঠকের মনের ভিতর 'ঘিনঘিনে' ভাব ছাড়া অন্য কোন ভাব জাগ্রত করতে পারেন না। বুঝতে হবে, এ-জাতীয় লেখকের মনের মধ্যে অভিপ্রায়ের সততার বালাই নেই, যদি বা কোন অভিপ্রায় থেকে থাকে তা হচ্ছে পাঠকের মনের স্থূল জান্তব প্রবৃত্তিগুলিকে সুড়সুড়ি দেওয়া। আমরা একে 'ক্লেদরতি' আখ্যায় আখ্যাত করতে পারি।

বাস্তবিক, অভ্যাসটিকে ক্লেদরতি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বাস্তব চিত্র পরিবেশনের নামে এ-জাতীয় লেখক স্বীয় মনের ক্লেদ পাঠকের মনের ভিতর সম্প্রসারিত করেন মাত্র। এটি সজ্ঞানেই করা হোক আর অর্ধসজ্ঞানে করা হোক, সাহিত্যের পক্ষে এর ফল খুবই ক্ষতিকর হতে বাধ্য।

সত্যিকার বাস্তববাদী লেখকের জাত আলাদা। বাস্তববাদের তলায় তলায় তাঁর চিত্তে গভীর আদর্শবাদী নিষ্ঠা অনুস্যূত হয়ে আছে। তিনি তাঁর সাহিত্যে সৎ-অসৎ, সুন্দর-অসুন্দর, প্রচ্ছন্ন ও অতি-ব্যক্ত যা-ই কেন না পরিবেশন করুন, একটা মহৎ অভিপ্রায়ের দ্বারা তাঁর তাবৎ প্রয়াস বিধৃত। শুধু তাই নয়, আমরা আরও একটু দূর অগ্রসর হয়ে বলব, সুগভীর নীতিবোধ তাঁর একটা প্রধান মানসিক আশ্রয়। যে কোন উৎকৃষ্ট পর্যায়ের শিল্পীর শিল্প-প্রয়াসের মূলে অপরিবর্তনীয় মহৎ মানবিক মূল্যবোধ-গুলির প্রতি নিষ্ঠা সদা-সক্রিয়। এই নীতিচেতনা ও মূল্যচেতনা সংশ্লিষ্ট লেখকের শিল্পকর্মের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিব্যক্ত হতে পারে, ব্যঞ্জনার সাহায্যে অর্ধ-আভাসিত হতে পারে, আবার একেবারে প্রচ্ছন্ন থাকাও বিচিত্র নয়। কিন্তু ওটি থাকা চাই-ই। শিল্পীর মানসিক গঠনের ভিতর সুগভীব নীতিনিষ্ঠার পোষকতা না থাকলে কখনও তাঁর পক্ষে মানবমনকে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব নয়। পাঠককে যথাযথ পথে চালনা করবার অধিকারও শিল্পীর পক্ষে শুধুমাত্র এই উপায়েই লভ্য।

শিল্পীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বে নীতিবোধের আরোপে কেউ কেউ বর্তমান লেখককে অতিরিক্ত মাত্রায় সুনীতিবাদী মনে করতে পারেন। কিন্তু বলা দরকার, তথাকথিত সুনীতিবাদের ভূত দেখিয়ে পাঠকসাধারণকে আঁতকে দেবার উদ্দেশ্য লেখকের আদৌ নেই। উপরের কথাগুলি যে নিতান্ত আপ্তবাক্য নয়, পরন্তু সুদৃঢ় সত্যভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মোটামুটি-

ভাবে পর্যালোচনা করলেই সে কথা আমরা বুঝতে পারি। শেক্‌স্‌পীয়র-সাহিত্য ধরা যাক। শেক্‌স্‌পীয়র মানবচরিত্রের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন। সৎ-অসৎ, সুন্দর-কুৎসিত, স্বর্গীয়-নারকীয়—কত বিচিত্র ধরনের চরিত্রই যে তিনি তাঁর নাটকে সৃষ্টি করেছেন তার আর লেখাজোখা নেই। মানব-চরিত্র আঁকতে গিয়ে চরিত্র-মাহাত্ম্যের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিনিদর্শন যেমন তিনি তাঁর রচনায় উপস্থাপিত করেছেন, তেমনি মানুষের অতি বড় নীচতার চিত্রকেও তিনি তাঁর সামগ্রিক শিল্পপরিকল্পনার ভিতর স্থানদান করতে কুণ্ঠিত হন নি। শেক্‌স্‌পীয়রের ন্যায় একজন মহৎ পর্যায়ের জীবননিষ্ঠ শিল্পীর পক্ষে এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, এই জীবনের সর্বস্তরকে পরিব্যাপ্ত করে কল্পনার অবাধ সঞ্চরণক্ষমতা স্বাভাবিক ছিল, এবং সেই বিচারে তিনি যে একজন অতি উঁচুদরের বাস্তববাদী লেখক ছিলেন তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়র-সাহিত্য একটু অবধান করলেই বোঝা যাবে যে, নিছক মানবচরিত্রের রকমারি নমুনা প্রদর্শন করবার জন্যই সে সাহিত্য রচিত হয় নি, তার পশ্চাতে চূড়ান্ত সৌন্দর্যসৃষ্টির কামনার পাশে পাশে আরও কতকগুলি মহৎ অভিপ্রায় সক্রিয় রয়েছে। শেষোক্ত অভিপ্রায়সমূহের অন্যতম ছিল সংসার-জীবনে মানব-মহিমাকে তার পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি চিরন্তন মৌলিক সত্যের জয় ঘোষণা করা। এইভাবে শেক্‌স্‌পীয়র-সাহিত্যে বাস্তববাদ এবং আদর্শবাদের অতি সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটেছে দেখতে পাই।

এখানে আরও একটি কথা। মানবচরিত্র যাঁর রচনার প্রধান উপজীব্য বিষয়, তৎসৃষ্ট সাহিত্য বাস্তবানুসারী হতে বাধ্য। কারণ, সংসারে ভাল মন্দ মাঝারি নানা শ্রেণীর মানুষ আছে; আবার একই মানুষের ভিতর আলো-আঁধারির বিচিত্র জাফরি-কাটা নক্‌শার মত সু ও কু গায়ে গায়ে জড়িয়ে মিশিয়ে আছে;

শুধু তা-ই নয়, একান্ত ভাল বা মন্দ মানুষের জীবনে অবস্থাভেদে বিচিত্র মনোভাবের অর্থাৎ উল্টাপাল্টা মনোভাবের আধিপত্যের দৃষ্টান্তও বড় কম নয়। এইটেই যদি মানুষ সম্পর্কে সার কথা হয়, শেক্‌স্‌পীয়রের মত অতবড় বাস্তববাদী লেখক কজনা আছেন? কিন্তু তথাকথিত বাস্তববাদী লেখকের সঙ্গে শেক্‌স্‌পীয়র কিংবা অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর বাস্তববাদী শিল্পীর তফাত এইখানে যে, শেষোক্তের বাস্তববাদ সুদৃঢ় আদর্শবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, অভিপ্রায়ের সততা তাঁদের অঙ্কিত বিমর্ষ চিত্রগুলিকেও বিশেষ উজ্জ্বলতা দান করেছে। সেখানে আদর্শবাদের দীপ্তিতে বাস্তববাদের সম্ভাব্য কালিমা আপনা থেকেই ঢাকা পড়ে গেছে। মহৎ উদ্দেশ্যের স্বর্ণসূত্রে বিধৃত অতি গ্লানিমলিন বাস্তবতাও সংসার-জীবনে মানুষেব চলার পথে মস্ত দিঙ্‌নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। একালীন তথাকথিত বাস্তববাদী সাহিত্য সম্পর্কে এমন ভরসার কথা আংশিক ভাবেও যদি উচ্চারণ করা যেত তা হলে আর ভাবনার কিছু ছিল না।

আধুনিক সাহিত্যে যৌন-প্রসঙ্গের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে আমাদের যে আপত্তি সে এ কারণে নয় যে, সাহিত্যে যৌন বিষয়ের অবতারণা মাত্রই অশ্রদ্ধেয়। সে এ-কারণে যে, একালীন রচনায় প্রায়শঃ এবম্বিধ অবতারণা বিকৃত উদ্দেশ্যেব দ্বারা দুষ্ট। পাঠকের অন্তরে সুপ্ত নীচ প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করা ছাড়া এ-জাতীয় চিত্রণ-প্রয়াসের আর-কোন উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না। স্থূল ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি থেকেই সংশ্লিষ্ট লেখকের এই উদ্দেশ্যের জন্ম, এবং এই দিক থেকে দেখতে গেলে তথাকথিত বাস্তববাদী আপাত-শালীন লেখকের সঙ্গে জানিয়ে শুনিয়ে অশ্লীল সাহিত্যের বেসাতি যারা করে, সেই সব অ-শালীন ব্যবসাদারদের মনোভাবের খুব বেশী তফাত নেই। বাহ্যত-মনোহর ভদ্রতার আবরণে অশ্লীলতাকে আবৃত করলেই যে তা গ্রহণীয় হয়ে উঠবে, এমন কথা সত্য না-ও হতে পারে।

এখানেও সেই একই কথা—উদ্দেশ্যের সততার দ্বারা রচনার গুণাগুণ নির্ণীতব্য। নরনারীর প্রেম সাহিত্যের একটি প্রধান আশ্রয়। বিষয়-কৌলীন্যের জন্যও বটে আবার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি মানবমনের অপরিসীম কৌতূহলের জন্যও বটে, স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কের রূপায়ণ যুগ যুগ ধরে শিল্প-সাহিত্যে একটি প্রধান চিত্রিতব্য বিষয়ের মর্যাদা লাভ করেছে। এবং যেহেতু নরনারীর সম্পর্ক অংশতঃ যৌনতানির্ভর, সেই কারণে কতকটা অবধারিত ভাবেই যৌনতার প্রসঙ্গ সাহিত্যে এসে পড়েছে। কিন্তু কোথাও সীমারেখা টানতেই হয়। সংসারের বাস্তব আর সাহিত্যের বাস্তব এক জিনিস নয়। তা ছাড়া, উদ্দেশ্যের সততার প্রশ্নটিও এই প্রশ্নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। উদ্দেশ্য যেখানে মহৎ, আদর্শবাদী অভীপ্সা যেখানে শিল্পীর অনুপ্রেরণার মূল উৎস, সেখানে ছোটখাটো যৌনতার চিত্রণ কেমন করে যেন শিল্পীর বৃহৎ পরিকল্পনার ভিতর ধরে যায়। কেন না, শিল্পীর আদর্শবাদই হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে সব চাইতে বড় রক্ষাকবচ। শিল্পের ভিতর যদি কিছু খাদ-ময়লা থেকে থাকে, শিল্পীর আদর্শবাদের আগুনে তা অচিরেই জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যায়। শিল্পী তাঁর অভিপ্রায়ের সাধুতার দ্বারা, স্বাভাবিক শুচিতাবোধ দ্বারা, সর্বোপরি সৌন্দর্যসৃষ্টির সহজাত ক্ষমতার দ্বারা সহজেই তাঁর সাহিত্যের গ্লানির দিকটিকে শোধন করে নিতে পারেন। শিল্পীর প্রতিভার যাদুদণ্ডস্পর্শে গরল কখন অমৃতে রূপান্তরিত হয়ে পাঠকের তৃষ্ণাহর হয়ে ওঠে, রসে আকণ্ঠ-নিমগ্ন পাঠক নিজেই তা অনেক সময় ঠাহর করে উঠতে পারেন না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, মহাকবি কালিদাসের রচনায় কামজ প্রেমের চিত্রণের অভাব নেই। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের বর্ণিত শৃঙ্গাররসের সুবাসে কালিদাসের গোটা কাব্য ও নাট্যসাহিত্য ভরপুর বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কী সেই বস্তু, যা ভারতের এই মহামান্য প্রাচীন কবিকে অশ্লীলতার অপবাদের দায় থেকে রক্ষা করেছে?

—কবির সুগভীর প্রজ্ঞা, আদর্শবাদ এবং অমলিন সৌন্দর্যনিষ্ঠা। মহাকবির কল্পনাসুন্দর ও প্রজ্ঞাগাঢ় দৃষ্টিতে নিছক যৌন-মিলনের কোনও দাম নেই, যদি না সন্তানের মধ্য দিয়ে তা পরিণামরমণীয় হয়ে ওঠে। কামজ ভালবাসার বিকার একমাত্র দীর্ঘস্থায়ী দুঃখের তপস্যার দ্বারাই পরিশোধিত হওয়া সম্ভব। যে প্রেম ত্যাগ, ধৈর্য, ক্ষমা ও কৃচ্ছ্র সাধনার আত্ম-আরোপিত সংযম দ্বারা সুরক্ষিত নয়, কালিদাসের কবি-দৃষ্টিতে সে প্রেম কাণাকড়ির মূল্যেও বিকোবার যোগ্য নয়। যেখানেই কালিদাস তথাকথিত আদিরসের অবতারণা করেছেন, তাকে সংযমের পুণ্যবারিনিষেকে গ্লানিবিমুক্ত করে নিয়েছেন। ফুলের শোভার সঙ্গে ফলের ভার যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নরনারীর যুগল জীবনের সাধনা কবির নিকট গ্রহণীয় হয়ে ওঠে নি। সৌন্দর্যের সঙ্গে কল্যাণের যোগেই যে প্রেমের সর্বোচ্চ সার্থকতা—এই বাণী কালিদাসের কাব্যে বার বার উদ্‌ঘোষিত হয়েছে।

এ সব কথা বিশদ বিস্তারের অপেক্ষা রাখে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে কালিদাসের কুমারসম্ভব, শকুন্তলা ইত্যাদির আলোচনা-প্রসঙ্গে কালিদাসের কাব্যের মর্মকথা উদ্‌ঘাটন করে দেখিয়েছেন। কালিদাসের কবিচক্ষু যে নিছক সৌন্দর্যরসপিপাসুর চক্ষু নয়, পরন্তু থেকে থেকে তা থেকে যে জ্ঞানীর তৃতীয় নয়নের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়েছে—এ কথা আর একজন মহাকবি এবং মহাপ্রাজ্ঞ ছাড়া কেই বা অমন সুন্দরভাবে ব্যক্ত করতে পারতেন? রবীন্দ্রনাথের নিজের বেলায়ও আমরা দেখি, অসুন্দরের জন্যই অসুন্দরের অবতারণা তিনি কোথাও করেন নি। কবির 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যের ভিতর কোন কোন সমালোচক-কথিত যে সামান্য অশ্লীলতার আভাস আছে, তা 'চিত্রাঙ্গদা'র উপজীব্য বিষয়বস্তুর পরিস্ফুটনের জন্য অপরিহার্য ছিল। তবে অশ্লীলতার খাতিরেই অশ্লীলতা সেখানে বড় হয়ে ওঠে নি। সমগ্র কাব্যনাট্যটির অন্তরালে একটি সুমহান্ তত্ত্বকথা সুগুপ্ত থেকে

রচনাটিকে একটি মূল্যবান অভিপ্রায় দান করেছে। নাটকটির অনবদ্য সৌন্দর্যাশ্রিত রচনাভঙ্গিও তার গভীর আকর্ষণ-যোগ্যতার আর একটি হেতু। এক দিকে 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যের ভিতর আছে নারীর ব্যক্তিত্বকে তার যথাযোগ্য মর্যাদাদানের চেষ্টা, অন্য দিকে নিছক কামজ ভালবাসা এবং তজ্জাত সম্ভোগসর্বস্ব দেহমিলনা-দর্শের অসারতা প্রতিপাদনের প্রয়াসও রচনাটির ভিতর বিশেষ-ভাবেই পরিলক্ষিত হয়। ধৈর্যের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ অনুভূতিরিক্ত ভোগেচ্ছা যে দুদিনেই নিজেকে নিজে জীর্ণ করে তোলে তারই একটি অপূর্ব রূপক 'চিত্রাঙ্গদা'র মধ্য দিয়ে নিপুণ শিল্পীজনোচিত ব্যঞ্জনায় পরিবেশিত হয়েছে বলে মনে হয়। 'চিত্রাঙ্গদা'র আপাত-অশুদ্ধতা কবির ধ্যানদৃষ্টির সংস্পর্শে সম্পূর্ণই পরিশুদ্ধ হয়ে গেছে।

এ সব পুরনো কথা সবিস্তারে বলবার আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু হালে আদর্শবিরহিত নগ্ন বাস্তববাদ আর যথেচ্ছ অশ্লীলতার সমর্থনে এত এত সব লেখনী সাহিত্যের পাতায় নিয়োজিত রয়েছে যে, বহুব্যাপক ভ্রান্ত বুদ্ধির ফ্যাশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠ তারস্বর বলিষ্ঠতায় উত্তোলন করতে হয়ই। হোক সে কণ্ঠ একক, হোক সে প্রতিবাদ নিঃসঙ্গ, তবু আধুনিক সাহিত্য-ব্যবসায়ীদের সম্মিলিত মূঢ়তার বিরুদ্ধে সত্যনির্ভর প্রতিবাদের প্রয়োজন কোন সময়েই ফুরোবে না। বাংলা-সাহিত্যে অশ্লীল লেখনীর আজ জয়-জয়কার, আদর্শবাদের পোষকতাহীন বাস্তববাদের পূতিগন্ধ আবর্জনায় সাহিত্যের আঁস্তাকুড় ভরে উঠে সাহিত্যের সদর আঙিনাতেও কটুগন্ধ বিস্তার করতে শুরু করেছে। এই সময় যদি সাহিত্যের কল্যাণ চিন্তা করে মিথ্যার ও মূঢ়তার বিরুদ্ধে অভিযানে এগিয়ে আসা না গেল, তবে কবে আর সে মহৎ কাজ আরব্ধ হবে? সুতরাং এখনই সচেতন হওয়া দরকার। জানি, পাল্লা আজ মূঢ়তার সপক্ষেই সমধিক ভারী, কিন্তু এই অবস্থা স্থায়ী হতে পারে না। দেশের পাঠক-সাধারণের সুস্থ বুদ্ধির উপর আমাদের আস্থা

আছে, আস্থা আছে তাঁদের শুভাশুভ আসল মেকী চিনে নেবার সহজ ক্ষমতার উপর। সত্যের নির্দেশ আসে বিবেকের প্রণোদনা থেকে। মিথ্যার ঘনকৃষ্ণ কুয়াশাজাল ভেদ করে বিবেকবুদ্ধির আলো প্রকাশ হতে হয়তো কিছু বিলম্ব লাগে, কিন্তু সত্যের জ্যোতি একদিন না একদিন ছড়িয়ে পড়েই। মিথ্যার জয় চোখ-ধাঁধানো হলেও তার মূল্য ক্ষণিক; পক্ষান্তরে, সত্যের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া ধীর, কিন্তু সুনিশ্চিত। সৌন্দর্যাশ্রয়ী সত্য নিয়েই যখন সাহিত্যের কারবার, তখন সত্যের নৈকট্য থেকে সাহিত্যকে খুব বেশীদিন আড়াল করে রাখা সম্ভব হবে না।

বাস্তববাদ তথা ঘিনঘিনে অশ্লীলতার বিষয়ে যে সব কথা বলা হল, তা সকল দেশের সাহিত্য সম্পর্কেই সমান সত্য। ও-দেশের সর্বজনমান্য শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে সাধারণভাবে যৌন প্রসঙ্গের অবতারণার চিত্রণ, বিশেষ ভাবে দেহ-মিলনের বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু তাতে রুচিবিকারের আশঙ্কা থাকে না। আশঙ্কা থাকে না এই কারণে যে, ওই সকল আপাত-কামোদ্দীপক স্থূল চিত্রণের আদৌ নিজস্ব কোন মূল্য নেই; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, ওগুলি শিল্পীর পরিকল্পিত বৃহৎ শিল্প-পরিকল্পনার নিতান্ত ছোটখাটো দিক মাত্র। আধ্যাত্মিক অভীপ্সাযুক্ত অথচ বহু বাধাবিঘ্নকণ্টকিত সংগ্রামশীল মানুষ আত্মোপলব্ধির সাধনায় সম্মুখপথে চলতে গিয়ে অনিবার্যভাবেই নানা স্খলন-পতনের সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়। আলোচ্য উপন্যাসাদিতে বর্ণিত এই সকল স্খলন ও পতনকে সেই মহৎ আধ্যাত্মিক সাধনার অংশ ও অধীন রূপে দেখলে তবেই শুধু তাদের যথার্থ দেখা হয়। এ সব 'অশ্লীল' চিত্রণের স্বরূপ শুধু মহৎ শিল্পভাবনার পরিপ্রেক্ষিতেই নির্ধারিতব্য, তাদের বিচ্ছিন্নভাবে পরিমাপ করলে শিল্পীর প্রতি প্রকৃতই অবিচার করা হয়। ভরসা এই, পাঠক খুব কচিৎ এ-জাতীয় ভুল করেন। আর তাইতেই

টলস্টয়, রোলাঁ, আনাতোল ফ্রাঁস, ডি. এইচ. লরেন্স প্রভৃতি লেখকদের রচনা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা উপজিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় অনুপস্থিত বললেও চলে, যদিও তাঁরা এবং তদনুরূপ শিল্পীবৃন্দ বিরূপ সমালোচনার কবল থেকে একেবারে অব্যাহতি পেয়েছেন এমন কথা বলা যায় না।

আমাদের সাহিত্যের আধুনিক লেখকদের অধিকাংশেরই সম্পর্কে মুশকিল এই যে, তাঁদের রচনার পিছনে বৃহৎ কোন ভাবনা নেই। বিশেষ, যাঁরা অপেক্ষাকৃত নবীনবয়সী, নিরবচ্ছিন্ন একালীন বিষয়বস্তু অবলম্বনে গল্প-উপন্যাস-নির্মাণপ্রয়াসী, তাঁদের ভিতর এই অভাব আরও বেশী করে চোখে পড়ে। রচনার লিপিভঙ্গী এবং আঙ্গিক-প্রকরণের দিক থেকে এঁদের অনেকেই যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু একটি মাত্র মূল ত্রুটীর দরুন এঁদের অধিকাংশেরই রচনা আংশিক খণ্ডিত ও ব্যর্থ হয়ে আছে। আলোচ্য মূল ত্রুটী হল সংশ্লিষ্ট লেখকদের মানসিক গঠনের ভিতর আদর্শবাদী ধ্যান-ধারণার অভাব। কারও মধ্যে বিচ্যুতিটি অধিক মাত্রায় বর্তমান, কারও মধ্যে কম; তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, উল্লিখিত ত্রুটী নবীনবয়সী প্রায় সকলেরই রচনাকে অল্পবিস্তর তাৎপর্যহীন করে রেখেছে।

কেন এমন হয় যে বিশেষ করে একালেই লেখকের মনোভঙ্গীর ভিতর অভিপ্রায়ের সততার, আদর্শবাদী অভীপ্সার, এক কথায় চরিত্রবত্তার দৃষ্টিগ্রাহ্য অভাব দেখা দিয়েছে? এইখানেই দেশের বৃহত্তর রাষ্ট্রিক-সামাজিক পরিস্থিতির হিসাব নেবার প্রয়োজন হয়, এবং এই হিসাবের ভিত্তিতে সহজেই আমরা বুঝতে পারব, পুরাতন এমন কি গত দুই-তিন দশক আগে আবির্ভূত লেখকদের সঙ্গে কোথায় একালীন লেখকদের পার্থক্য। বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দী 'স্বর্ণযুগ' নামে কথিত। অভিধাটি যে অকারণ আরোপিত হয় নি, তা উনিশ শতকের তদানীন্তন আবহাওয়ার

প্রতি সামান্য দৃষ্টিক্ষেপ করলেই বুঝতে পারা যাবে। উনিশ শতকের প্রতিটি শক্তিশালী বাঙালী লেখক আদর্শবাদী ধ্যান-ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত ও চালিত হয়েছিলেন। সে যুগের আবহাওয়ায় পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যের-খাত-বেয়ে-আসা ঔদার্যবাদ তথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শ সতত-সঞ্চরমাণ ছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নীতির চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা আত্মোপলব্ধির সাধনার সাফল্যে, এবং সঙ্গতভাবেই এই সাফল্যকামনা তৎকালীন মনীষী, শিল্পী, লেখকমাত্রেরই হৃদয়-মন হরণ করেছিল। গোটা উনিশ শতকের বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস ধর্মীয় স্তরে ব্যক্তিগত আত্মোপলব্ধির এবং সামাজিক স্তরে সমষ্টিগত উন্নয়ন-প্রয়াসের এক অখণ্ড ইতিবৃত্ত। সমাজকল্যাণবিরহিত নিছক শিল্পচাতুর্যের আদর্শ তদানীন্তন লেখকদের মন কখনই তেমনভাবে আকর্ষণ করতে পারে নি। বরং এই বললেই তাঁদের লিখনবৈশিষ্ট্যের যথার্থ স্বরূপের পরিচয় দেওয়া হবে যে, তাঁদের প্রায় সকলেরই লেখনীমূলে আদর্শবাদী প্রণোদনা সক্রিয় ছিল এবং এই সক্রিয়তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মপ্রকাশ করেছে জাতীয় হিতসাধনের সুস্পষ্ট চেষ্টায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রঙ্গলাল-হেম-নবীন, রাজনারায়ণ বসু, প্রথম পর্বের রবীন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বামী বিবেকানন্দ এবং সর্বশেষে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—এঁদের সকলেরই রচনা পাঠে বার বার আমরা উপরি-উক্ত মন্তব্যের সত্যতার সাক্ষাৎ পাব।

সুখের বিষয়, উনিশ শতকের এই গৌরবজনক ঐতিহ্য বিশ শতকেও সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং প্রথমে স্বদেশী আন্দোলন ও পরে গান্ধীজী-প্রবর্তিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্যজনীর হাওয়ায় আরও বেশী স্ফূর্তিলাভ করে এই দুটি আন্দোলনের আওতায় থেকে আমাদের সাহিত্যে যাঁরা লেখনী ধারণ করেছিলেন

অর্থাৎ এখন থেকে কম-বেশী ষাট বৎসর আগে যাঁদের জন্ম হয়েছিল, তাঁদের সকলেরই মানসিক গঠনের ভিতর কোন-না-কোন আকারে আদর্শবাদের পোষকতা দেখতে পাই। তাঁরা জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন কি ছিলেন না সেটি বড় কথা নয়; বড় কথা হচ্ছে—সাহিত্যানুশীলনকে তাঁরা সকলেই ব্রতের মর্যাদা দিয়ে এসেছেন এবং তদনুযায়ী তাঁদের স্বকীয় সাহিত্য-ভাবনা ও সাহিত্যকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। সাহিত্য যে নিছক অর্থকরী বৃত্তি নয়, প্রকাশকদের দুয়ারে দুয়ারে সওদা ফেরি করার বেসাতি নয়—এই বোধ ষাটোত্তর লেখকদের প্রায় সকলেরই রচনাপ্রয়াসকে এমন একটা অভিপ্রায়ের সততা দান করেছে, যে সততা আজকের দিনের লেখকদের মধ্যে কম-বেশী অনুপস্থিত।

অতীতাশ্রয়ী মনোভাবের পোষকতাবশতঃ একালীন লেখকদের বিরুদ্ধে এ সব কথা বলা হচ্ছে—এ যেন কেউ না মনে করেন। সমসাময়িক কালের অপ্রবীণ-বয়সী লেখকদের মানসিক গঠন এবং সাহিত্যরীতি একটু তলিয়ে দেখলেই অভিযোগটির সারবত্তা প্রমাণিত হবে বলে বিশ্বাস। আজ থেকে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগে যে সব লেখকের জন্ম হয়েছে, তাঁরা অসহযোগ, আইন-অমান্য ও আগস্ট-বিপ্লব রূপ ত্রিমুখী গান্ধীবাদী আন্দোলন নিকট-সান্নিধ্য থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন সত্য, কেউ কেউ হয়তো স্বকীয় ব্যক্তিজীবনে এ সকল আন্দোলনের আঁচও খানিকটা অনুভব করেছেন, তবে ওই পর্যন্তই। এ সকল আন্দোলনের অন্তর্নিহিত সুগভীর দেশপ্রেম ও জাতীয় সমুন্নতির আদর্শ আমাদের তরুণ লেখকদের চিত্ত তেমনভাবে স্পর্শ করতে পারে নি। মুষ্টিমেয় উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে, তাঁদের প্রায় সকলেই বিকল্প মনোভঙ্গি হিসাবে হয় পশ্চিমী সভ্যতা-সুলভ বাঁধন-ছেঁড়া যথেচ্ছ মুক্তির আদর্শটিকে গ্রহণ করেছেন, নয়তো পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের খাত-বাহিত বামপন্থী রাজনীতির আদর্শটিকে নিজ নিজ জীবনে রূপায়িত

করবার চেষ্টা করেছেন। উক্তির প্রথমাংশের প্রমাণ, 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দ। দ্বিতীয়াংশের প্রমাণ বর্তমান মার্ক্সীয় লেখক-সম্প্রদায়।

বামপন্থী রাজনৈতিক আদর্শের অন্তর্শায়ী ব্যাপক গণকল্যাণের নীতি শ্রদ্ধেয় নীতি, তাতে সন্দেহ কি। তবে আমাদের ভিতর-কাঁপা লেখকদের হাতে পড়ে আদর্শটির জাত গেছে। জীবনের গভীরত্ব সম্পর্কে ধারণাবিবর্জিত এবং আত্মজিজ্ঞাসাহীন চটুলমনা আধুনিক লেখকদের কাছে তথাকথিত বামপন্থা একটা 'পোজ' মাত্র, সত্যি সত্যি কজন একে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছেন—সে সম্বন্ধে আমাদের দ্বিধা রয়েই গেল। ব্যাপক গণকল্যাণেচ্ছাকে আন্তরিক সাহিত্যনীতি হিসাবে এঁরা যদি গ্রহণই করবেন তবে বুর্জোয়া-জীবনযাত্রাসুলভ আরাম-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি এঁদের দুর্নিবার লোভ কেন, অপবিবর্তনীয় মহৎ মানবিক মূল্যবোধগুলির প্রতি হেলাফেলার মনোভাব কেন, জীবনচর্যায় মহৎ আদর্শের প্রতিফলন নেই কেন, রচনায় নগ্ন বাস্তববাদ তথা যৌনতার প্রাধান্য কেন? শুধু খস্ খস্ করে কলম চালিয়ে প্রতীতিযোগ্য আকার ও আয়তনের গল্পোপন্যাস লিখলেই তো লেখক হওয়া যায় না, শিল্পীর শিল্পপ্রয়াসের সঙ্গে আদর্শ জীবনচর্যার যোগ অতি নিগূঢ়। সত্য ও কল্যাণের আদর্শবিবর্জিত সৌন্দর্যচর্চা নিরর্থক, কেন না তদবস্থায় সৌন্দর্যচর্চা শেষ পর্যন্ত সৌন্দর্যচর্চা থাকে না, তা উচ্ছৃঙ্খলতার সংস্পর্শে বিকাবদশাপ্রাপ্ত হয়ে অধোগামী হয়। সাহিত্যে যা শুচিতা ও সংযম নামে পরিচিত, তা আসলে সৌন্দর্যের সঙ্গে সত্য ও শিবকে অন্বিত করবার একটি সজ্ঞান প্রয়াস মাত্র। এই শুচিতাবোধ না থাকলে, সংযমকেন্দ্রিক উদ্দেশ্যের সততা না থাকলে, সৌন্দর্যের অনুশীলন উৎকেন্দ্রিক হয়ে পড়বার সম্ভাবনা পদে পদে। সাহিত্যের অতিমাত্রায় 'ফর্ম'নিষ্ঠ লেখকগণ প্রায়শ এ-জাতীয় সম্ভাবনার সম্মুখীন হন, তার ফল তাঁদের সাহিত্য-

প্রয়াসের পক্ষে খুব সুখকর হয়—এমন কথা বলা যায় না। বিষয়বস্তুর কৌলীন্য উপেক্ষা করে 'ফর্ম'কে অতিরিক্ত উজ্জ্বল, শাণিত, পরিমার্জিত করবার চেষ্টা, অর্থাৎ আধেয়ের মূল্যে আধারের সৌকর্য-বিধানের আত্যন্তিক প্রয়াস প্রবীণ-অপ্রবীণ বয়সী লেখকদের সকলেরই রচনায় কমবেশী পরিলক্ষিত হয়। এর অর্থ আর কিছু নয়, এঁদের মানসিকতার ভিতর আদর্শবাদের পোষকতার অভাব। মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ ও দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটির প্রতি ঝোঁক তখনই শুধু বৃদ্ধি পায় (যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে কল্লোলযুগীয় ধ্যানধারণার দ্বারা প্রভাবিত কতিপয় আধুনিক গল্প-লেখকের মধ্যে), যখন লেখকের মনোভঙ্গিতে আদর্শবাদ নামক বালাইয়ের বিশেষ কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। বক্তব্য যেখানে অল্প বা দীন, সেখানেই খুঁটিনাটির প্রতি অনুপাত-অতিরিক্ত উৎসাহ। কয়েক বছর আগে চিন্তাশীল লেখক ৺বিমলচন্দ্র সিংহ কোনও একটি সাহিত্য-সাময়িকের পাতায় সংস্কৃতির রূপান্তরকালের লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে যৌনতার খাতিরেই যৌনতার চিত্রণকে অধোগামী যুগের সাহিত্যের একটি লক্ষণ বলেছেন। প্রাজ্ঞ প্রাবন্ধিক তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে আধুনিক বাংলা-সাহিত্য থেকে তিনটি রচনার দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেছেন।

শ্রীযুত সিংহের বিশ্লেষণ খুবই যুক্তিনিষ্ঠ। তিনি আমাদের প্রচলিত কথা-সাহিত্যের ক্ষতস্থানটির উপর অভ্রান্ত হস্তরক্ষা করেছেন। বাস্তবিক, বর্তমান বাংলা দেশ অধোগামী ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এবং তার প্রমাণ শ্রীসিংহ-কথিত এই সব কথা-সাহিত্যের নমুনা। সমালোচ্য লেখকদের লিপিকুশলতাদৃষ্টে মনে হয়, তাঁদের বুদ্ধিবিবেচনা আছে, আছে গল্প জমাবার স্বাভাবিক ক্ষমতা। তবু যে কেন তাঁরা এ-জাতীয় বিকারের আশ্রয় নেন, ভাল বোঝা যায় না। আমাদের ধারণা, নগ্ন বাস্তববাদের প্রতি আত্যন্তিক পক্ষপাত এবং আদর্শবাদের প্রতি তদনুপাত নিষ্ঠার অভাব এই বিকৃতির মূল হেতু। বিকৃতিটি আশু পরিশোধনীয়, বলাই বাহুল্য।

বিমর্ষ সাহিত্য

কয়েক বৎসর আগে সুপরিচিত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় সাহিত্য-আলোচনা প্রসঙ্গে দাবি জানিয়েছিলেন—'চাই আনন্দের সাহিত্য'। 'আনন্দের সাহিত্য' অর্থাৎ এমন সাহিত্য, যে সাহিত্য পাঠে মন আশায় ও আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে, বেঁচে থাকার সার্থকতায় বিশ্বাস ফিরে পাওয়া যায়, মানুষকে ভালবাসতে সাধ যায়। বেশ কিছুকাল হল বাংলা-সাহিত্যের আবহাওয়া নৈরাশ্যবাদের কালিমায় ঘুলিয়ে উঠেছে, তথাকথিত রিয়ালিস্টিক সাহিত্যসৃষ্টির নামে সর্বপ্রকার কদর্যতা, কুশ্রীতা বাংলা সাহিত্যের দরবারে নির্বিচারে প্রশ্রয় পাচ্ছে—ক্লেদপঙ্কিল আবর্জনার স্তূপে সাহিত্যের আঙিনা ভরে উঠল। প্রধানতঃ সমসাময়িক কালের পাশ্চাত্য সাহিত্যের দৃষ্টান্তে এমন রচনাদর্শ বাংলায় বিধিবদ্ধভাবে প্রচারের চেষ্টা চলেছে, যার পরিণামফল বাংলার সাহিত্য ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়ে পারে না। এ-জাতীয় কৃত্রিম আদর্শাশ্রিত রচনা একনাগাড়ে খানিকক্ষণ পড়বার চেষ্টা করলে মনের ভিতর হাঁফ ধরে যায়, মনে হয় শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, পায়ের নীচে থেকে বাংলার চিরাভ্যস্ত সংসার ও সমাজের মাটি সরে যাচ্ছে, সবলে আঁকড়ে থাকবার মত কোন প্রত্যয়ই যেন আর নিজের ভিতর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ এক কথায়, চিত্তবিমর্ষকারী, মানবপ্রীতিবিবর্জিত, অবিশ্বাসী সাহিত্যসৃষ্টির কোলাহলে বাংলার আকাশ-বাতাস মথিত হয়ে উঠল। এই অসুস্থ কোলাহল দূর করতে হলে চাই আনন্দের প্রতিষেধ, আশার প্রতিষেধ, প্রেমের প্রতিষেধ। বেঁচে থাকা যে নিরর্থক নয় সর্বপ্রকার সাময়িক পতন স্খলন পরাজয় ও মৃত্যুর পরপারে নতুন আশা ও আনন্দের আলো বাঙালী সমাজের দিগন্তে

চিকচিক করছে, মানুষকে ভালবেসে এবং মানুষের কাছ থেকে ভালবাসা পেয়ে আজও যে সুখ পাওয়া যায়—এই সুর বাংলা-সাহিত্যে আবার ফিরিয়ে আনা দরকার। নতুন লেখকের দল এই সুস্থ জীবনাদর্শ তাঁদের লেখায় সজ্ঞানে অনুসরণ করলে তবেই সাহিত্যের মঙ্গল; নয় তো যে পথ ধরে বাংলা-সাহিত্য অগ্রসর হচ্ছে সে পথেই যদি বাধাবন্ধহীন ভাবে তার পরিক্রমণ চলতে থাকে, তা হলে বাংলা-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিতরূপে অন্ধকার।

কথাটা ভাববার মত। সত্যই তো, আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যে আনন্দের বার্তা কোথায়? গোড়া ধরে বিষয়টির আলোচনা করা যাক। আমাদের জীবনের কী লক্ষ্য?—সুখ, শান্তি ও আনন্দ। যে সাহিত্য-পাঠে এই সুখ-শান্তি-আনন্দের প্রত্যাশা প্রতি পদে পীড়িত ও খণ্ডিত হয়, সে সাহিত্য কখনও সমাজজীবনের মূলে শক্তি সঞ্চার করতে পারে না। নৈরাশ্য ও নিরানন্দের চিত্র ক্রমাগত চোখের সামনে তুলে ধরলে চোখেই যে শুধু জ্বালা ধরে তা-ই নয়, মনও বিষিয়ে ওঠে। ব্যক্তিমনের এই বিষক্রিয়া ধীরে ধীরে সমাজমনে সঞ্চারিত হয়, আর তার ফলে সমাজজীবনে সহস্রবিধ গ্লানির উদ্ভব হয়ে সমাজকে সুনিশ্চিত ধ্বংসের অভিমুখে এগিয়ে নিয়ে যায়। আমরা সকলেই জানি, সাহিত্য ও সমাজ পরস্পর নিবিড় সম্পর্কে সম্পর্কিত। তার মানে শুধু এ নয় যে, সাহিত্য সমাজের দর্পণ; তার মানে এও বটে যে, সাহিত্য সমাজের নিয়ামক। সাহিত্যের আবহাওয়া অনিবার্যভাবে সমাজের উপর প্রতিফলিত হয়ে তার রূপ বদলায়। আমাদের আধুনিক লেখকদের দূরদৃষ্টির অভাবের ফলে সাহিত্যের ভিতর কেবলই যদি জীবনবিমুখতা আর নৈরাশ্যবাদের বাণী প্রচারিত হতে থাকে তা হলে এক সময় না এক সময় সমাজও জীবনবিমুখ তথা হতাশাকবলিত হয়ে উঠতে বাধ্য। সে অসুস্থ পরিণাম

অনুমানের স্তর থেকে সম্ভাবনার স্তরে অবনীত হওয়ার আগেই সময় থাকতে প্রক্রিয়াটিকে কঠোব হস্তে রোধ করা দরকার। কাজেই সম্মিলিত বলিষ্ঠ স্বরে এখন থেকেই দাবি জানাতে হবে—'চাই আনন্দের সাহিত্য'। তার সঙ্গে আরও একটু কথা যোগ করলে ভাল হয়—'চাই নিষ্কলুষ সাহিত্য'। বাস্তবচারিতা তথা তথাকথিত মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের নামে কলুষিত চিন্তন মনন কল্পনার পরিবেশন ঢের হয়েছে; আর কোন কারণে না হোক, সাহিত্যিক শুচিতার জন্যই এ জিনিস অবরুদ্ধ হওয়া দরকার।

কেউ কেউ বলতে পারেন, অসম সমাজব্যবস্থার অত্যাচার অবিচারের ফলে আমাদের জাতীয় জীবনের দিকে দিকে যখন কুশ্রীতার আবিলতা ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, তখন সাহিত্যকে সৌন্দর্যাশ্রিত করা কি সম্ভব? এমন কোন্ যাদুদণ্ড আছে যার সংস্পর্শ-প্রভাবে নিরানন্দ পরিবেশকে আনন্দময় পরিবেশে রূপান্তরিত করা যায়? রাষ্ট্র, অর্থ ও সমাজনৈতিক অব্যবস্থার কারণে জাতীয় জীবনের বারিধি মথিত হয়ে ঝলকে ঝলকে গরল উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে, সাহিত্যের সঙ্গে বাস্তবের নিগূঢ় সম্পর্ক স্মরণ করে লেখকদের যদি বাস্তব অবস্থাকে কিছু পবিমাণেও লেখার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হয়, তা হলে সে গরলেব খানিকটা ঝাঁজ সাহিত্যের উপরও আসতে বাধ্য। জীবনে যেখানে আনন্দ নেই, পরন্তু বিমর্ষতারই প্রাধান্য, সে স্থলে সাহিত্যকে আনন্দময় করে তোলা কী প্রকারে সম্ভব? সাহিত্যব্যপদেশে বাস্তবসঙ্গতির আদর্শ একটি বড় কথা, তা যদি হয় তো অসৌন্দর্য ও আনন্দ-হীনতাকে সাহিত্য থেকে আমরা বাদ দিয়ে চলব কেমন করে?

কথাটি প্রণিধানযোগ্য। বাস্তবিক, অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আমাদের সমাজজীবন নানা দিক থেকে গ্লানিময় হয়ে উঠেছে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বদ্ধমূল ত্রুটী, শাসনতান্ত্রিক অপদার্থতা, জাতিভেদের অভিশাপ, তথাকথিত

আভিজাত্য ও বনেদিয়ানার ভেদবুদ্ধিপ্রসূত অমার্জনীয় আচরণ, প্রবীণদের অতিরিক্ত গোঁড়ামি ও অতীতাশ্রয়ী মনোভাব, পক্ষান্তরে নবীনদের আত্যন্তিক পাশ্চাত্যমুখিনতা ও নকল আধুনিকতা, পুরুষের প্রভুত্বপ্রিয়তা তথা স্ত্রীজাতির হীনমন্যতা, ছাত্রসম্প্রদায়ের অসংযম, প্রগতিশীলতার নামে যৌন অনাচার ইত্যাদি বিবিধ বিসদৃশ অবস্থার সমবায়ে এমন জটিল ও অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, ভাল করে সমাজের দিকে চোখ চেয়ে তাকানো যায় না। এই যদি দেশের সত্যিকার পরিস্থিতি হয় তো সাহিত্যে তার প্রতিফলন না ঘটেই পারে না। অন্ততঃ আংশিক প্রতিফলন তো ঘটবেই। সুতরাং কেন অভিযোগ, কী নিয়ে অভিযোগ? বাস্তবসঙ্গতির আদর্শের প্রতি মুখে আমরা আনুগত্য প্রকাশ করব, অথচ কার্যতঃ তা রূপায়িত হতে দেখলে আঁতকে উঠব—এ-জাতীয় স্বতোবিরোধমূলক আচরণ স্বতই অগ্রাহ্য।

এ কথার জবাব এই যে, বাস্তবতায় আমাদের আপত্তি নেই, আপত্তি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। বাস্তবচিত্রণের নামে ক্লেদরতিটাই যদি মুখ্য হয়ে ওঠে, সে ক্ষেত্রে সবল কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাতেই হয়। একই বস্তু নানা জনের মনে নানা রকমের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এখানে বস্তু মৌলিক পদার্থ হয়েও উপলক্ষ্য মাত্র; প্রতিক্রিয়াটাই আসল। বাস্তব সম্বন্ধেও সেই কথা। একই ঘটনা বা আচরণ বিভিন্ন লোকের চোখে পড়ে, কে কোন্ দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে সেই ঘটনার বিচারে প্রবৃত্ত সেইটেই হচ্ছে এই প্রসঙ্গে সব চাইতে দামী কথা। তার অর্থ, বাস্তবের চাইতেও বেশী জরুরী হল বাস্তব থেকে আহৃত সিদ্ধান্ত। একই বস্তু থেকে কে কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে তা দিয়েই দৃষ্টিভঙ্গীর সুস্থতা-অসুস্থতার বিচার। প্রবণতা-ভেদে আমরা একই বাস্তব ঘটনা থেকে আশাবাদী বা নৈরাশ্যবাদী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। যদি এমন হয় যে, আধুনিক লেখকগণ রিয়ালিস্ট সাহিত্যসৃষ্টির নামে সমসাময়িক কালের

বাঙালীর সমাজজীবন থেকে কেবলই নৈরাশ্যবাদী সিদ্ধান্ত আকর্ষণ করে চলেছেন, অবসন্ন, ক্লিন্ন বিমর্ষ চিন্তার দ্বারা পাঠকের মনে হাঁফ ধরিয়ে দেওয়া ছাড়া তাঁদের আর কোন করণীয় নেই, ক্লেদরতিতে তাঁদের অস্বাভাবিক উল্লাস; সে ক্ষেত্রে বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ ভেবে তাঁদের এই আত্মঘাতী প্রয়াস প্রতিহত করবার জন্য এগিয়ে আসতেই হয়। সাহিত্য আনন্দের জিনিস, তার অর্থ তা কল্যাণকামীও বটে। নীরন্ধ্র নৈরাশ্যবাদ আর বিকৃত মনোভাবের প্রাধান্যের ফলে এই কল্যাণের আদর্শ ক্রমাগত পীড়িত হতে থাকলে কোন সমাজহিতকামী ব্যক্তিই স্থির থাকতে পারেন না।

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে বিমর্ষতার আবহাওয়ার প্রাধান্যের দু-একটি দৃষ্টান্ত দিই। প্রথমে মন্বন্তর-সাহিত্যের কথা ধরা যাক। পঞ্চাশের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এবং তৎপরবর্তী অবস্থাকে কেন্দ্র করে বাংলা-ভাষায় বহু গল্পোপন্যাসের সৃষ্টি হয়েছে। সে সকল সাহিত্যসৃষ্টির প্রভাব অধুনা কিঞ্চিৎ ম্লান হয়ে পড়লেও তদানীন্তন কালে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের অব্যবহিত-পরবর্তী বৎসরগুলিতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল—আশা করি সে কথা অনেকেরই স্মরণ আছে। নিতান্ত মুষ্টিমেয় সংখ্যক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে, সে সকল সাহিত্যপ্রয়াসের অধিকাংশেরই মূল উপজীব্য ছিল উৎকট নৈরাশ্যবাদ—এ কথা যদি বলি, আদৌ অত্যুক্তি করা হবে না। অন্নাভাবের নির্মম তাড়নায় স্বামী স্ত্রীকে বিকিয়ে দিচ্ছে, পিতা সুযোগসন্ধানী ব্যক্তির সঙ্গে কন্যার অনুচিত সম্পর্কের গ্লানি দেখেও দেখছে না, স্ত্রী অশক্ত রুগ্ন স্বামী ও বুভুক্ষু সন্তানাদির মুখে অন্নদানের জন্য নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ গর্বের বস্তু সতীত্বকে ধুলায় লুটিয়ে দিতে দ্বিধা করছে না, মোটা অঙ্কের কণ্ট্রাক্টের লোভে এবং চাকুরিতে প্রমোশনের আশায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অক্লেশে আপিসের বড়কর্তাদের লালসার

যূপকাষ্ঠে পারিবারিক সম্মান বলি দিচ্ছে, ইত্যাদি ও প্রভৃতি। যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের সময়ে মনুষ্যত্বের এমন চরম অবমাননাকর ঘটনা বাংলা দেশে ঘটে নি তা নয়—হয়তো আমাদের আত্মপ্রসাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায়ই ঘটেছে,—তা বলে সেইটেই বাস্তব পরিস্থিতির সবটুকু নয়। বাস্তবের আরও একটি দিক ছিল, যেখানে শত বিপর্যয়ের আঘাত-সংঘাতের মধ্যেও নারী কিছুতেই তার গৌরব ধূল্যবলুণ্ঠিত হতে দেয় নি, অভাব-অনটনের সুতীব্র পীড়ন উপেক্ষা করে নারীত্বের মহিমাকে অম্লান রেখেছে। আত্মসম্মানী মানুষের মনে বড় হয়ে উঠেছে জাতীয় মর্যাদার চেতনা। মানুষ অনাহারের জ্বালায় ক্ষিপ্তবৎ হয়ে খাদ্যের সন্ধানে দিগ্বিদিকে ছুটেছে, খাদ্যের অভাবে শুকিয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে গেছে, তবু তার সম্মান বিসর্জন দেয় নি। দারিদ্র্যের চূড়ান্ত হৃদয়হীনতার মধ্যেও নারীকে সত্যপথভ্রষ্ট করতে পারা যায় নি। কিন্তু এই গৌরবোজ্জ্বল দিকের চিত্র উপস্থাপিত করতে আমাদের লেখকবৃন্দ উৎসাহ পান নি, তাঁরা তাঁদের সবটুকু মনোযোগ ও উদ্যম ন্যস্ত করেছিলেন প্রথমোক্ত বিষয়ের চিত্রণের উপর। যেন সেইটেই একমাত্র রিয়ালিটি, সেইটেই একমাত্র পরিবেশনযোগ্য সাহিত্যিক বিষয়। এর থেকে মিথ্যা, এর থেকে জাতীয় চরিত্রের অপমান আর কিছু হতে পারে না। অথচ এই প্রচণ্ড মিথ্যার বেসাতিই যুদ্ধকালীন বাংলা কথা-সাহিত্যের একাংশের প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছিল।

প্রশ্ন হতে পারে, বর্ণিত চিত্র যদি সত্য না-ই হবে, তবে কেন লেখকগণ সেই চিত্রের রূপায়ণে দৃষ্টিগ্রাহ্য অধ্যবসায় প্রদর্শন করেছিলেন? তার উত্তর এই যে, মনোবৃত্তির অধোগামিতাই এর কারণ। আমাদের তথাকথিত প্রগতিশীল আধুনিক লেখকদের চারিত্রশক্তি যদি আরও উচ্চ মানের হত, তাঁদের আত্মসম্মানবোধ আরও সুতীব্র হত, তা হলে এ-জাতীয় অঘটন কখনই ঘটত্তে

পারত না। আসলে তাঁরা অল্প-বিস্তর সকলেই পরাজিতের মনোভাবসম্পন্ন লেখক, স্বকীয় পরাজিতসুলভ মনোভাবকে নিতান্ত অনুচিতভাবে তাঁদের সেই সময়কার সৃষ্ট চরিত্রাদির উপর প্রক্ষেপ করেছিলেন। মহৎ মানবিক মূল্যবোধের প্রতি যে শ্রদ্ধা থাকলে শত বিপর্যয়ের মধ্যেও চরিত্রকে অবিকৃত রাখবার প্রেরণা পাওয়া যায়, সে শ্রদ্ধাবোধ যেমন তাঁদের নিজেদের মধ্যে নেই, তেমনই অপরের মধ্যেও সে শ্রদ্ধাবোধ সঞ্চারে তাঁদের উৎসাহ অনুপস্থিত। কাজেই মনুষ্যত্বের অবমাননার চিত্র-অঙ্কনে তাঁদের রুচিবোধ পীড়িত হয় না, বরং এ থেকে কেমন একপ্রকারের বিকৃত সুখ তাঁরা লাভ করেন, মনস্তত্ত্বের ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে পীড়নমূলক বা সাদীয় (sadistic) সুখ। এক মুষ্টি চালের জন্য বা অনুরূপ তুচ্ছ সামান্য সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের টোপ সামনে ঝুলিয়ে রেখে যে লেখক তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে নারীকে তার শ্রেষ্ঠ সম্মান বিসর্জন দিতে প্ররোচিত করেন, সে লেখক বাস্তবসঙ্গতির নামে স্বীয় হীন মনোবৃত্তিকেই সকলের সামনে তুলে ধরেন মাত্র। এতে বাস্তবসঙ্গতির আদর্শ কতখানি রক্ষা পায় জানি না, তবে এটি যে স্বীয় ক্লেদাক্ত রুচির সমর্থন অপরের আচরণের মধ্যে খোঁজবার একটি সূক্ষ্ম অথচ সজ্ঞান প্রয়াস সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। বড়ই দুঃখের এবং তাজ্জবের ব্যাপার যে, মানুষ যেখানে চারিত্রভ্রষ্ট, অধঃপতিত, ক্ষুদ্র, কোন কোন লেখকের দৃষ্টি যেন সেখানেই বিশেষভাবে নিবদ্ধ; পক্ষান্তরে মানুষের চরিত্রের মহত্ত্বের দিক, সৌন্দর্যের দিক, মাধুর্যের দিক যেন তাঁদের চোখেই পড়তে চায় না। যে মানুষ সংযমে সুদৃঢ়, সহিষ্ণুতায় অবিচল, শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও যার চিত্তের স্থৈর্য ক্ষুণ্ণ হয় না, রক্তমাংসে গড়া দেহের স্বাভাবিক দুর্বলতা স্বীকার করে নিয়েও আত্মার তেজে যে তাকে অতিক্রম ও পরাভূত করার সৎসাহস রাখে, সততার দ্যুতিতে যে মানুষের ভিতর-বাহির

প্রভাময়, সেই সংগ্রামশীল মানুষের চিত্র ফুটিয়ে তোলবার মধ্যে একটা গৌরব আছে, আছে লেখনীর একটা স্বাভাবিক স্ফূর্তি। অথচ আশ্চর্য, এই স্ফূর্তি বা এ গৌরববোধ দ্বারা উদ্দীপ্ত হবার জন্য 'বাস্তবনিষ্ঠ' আধুনিক লেখকদের তেমন কোন আগ্রহ দেখা যায় না; বরং তাঁরা যেন সব আদাজল খেয়ে লেগেছেন জাতির মানুষকে কত কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করা যায় সেই অপসাধনাকে জয়যুক্ত করে তুলতে। দেশের ভিতর খারাপ মানুষ যেমন আছে তেমনই ভালো মানুষের সংখ্যাও অগুনতি। বস্তুতঃ, ভালয় মন্দে গড়া মনুষ্যস্বভাবের ভিতর খতিয়ে দেখতে গেলে ভালত্বের উপাদানই বেশী। মানুষ সহজাতভাবে ভাল; অবস্থাবৈগুণ্যই যা তাকে মন্দ করে তোলে। এই যদি মনুষ্যস্বভাব সম্পর্কে সর্বস্বীকৃত মত হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে বাস্তববাদের নামে তাকে অযথা কালিমালিপ্ত করবার যৌক্তিকতা বোঝা যায় না। যে বাস্তববাদ একচক্ষু হরিণের মত ভালত্বকে অগ্রাহ্য করে মন্দত্বের উপর জোর দেয়, আশাবাদের ঊর্ধ্বে নৈরাশ্যকে স্থাপন করে, মানবপ্রীতির বদলে মানববিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে, সে বাস্তববাদ এবং তৎলক্ষণাক্রান্ত সাহিত্যকে বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করা চলে না।

মানবপ্রীতি বনাম মানববিদ্বেষের কথায় মনে পড়ল, বাংলার একজন আধুনিক খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীভুক্ত হবার পর থেকে গল্প-উপন্যাসের মারফতে শ্রেণীবিদ্বেষ প্রচারের কাজে উঠে-পড়ে লেগেছেন। গত ছয়-সাত বছরে তাঁর যত লেখা পড়েছি, প্রায় তার সব কটিরই মূল সুর এক—মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই, ভালবাসতে নেই, মানুষের কাছ থেকে কিছু পাবার আশা করতে নেই। রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে শ্রেণী-সংগ্রামের যৌক্তিকতা-অযৌক্তিকতার প্রশ্ন এখানে উত্থাপন করতে চাই না, রাজনীতির ছাত্ররা তা নিয়ে অন্তহীন বিতর্ক করুন; কিন্তু কথা হচ্ছে সাহিত্য রাজনীতি নয়। বাস্তবপন্থী

সাহিত্যই হোক আর সমাজসচেতন সাহিত্যই হোক, সাহিত্যের প্রধান আশ্রয় হল আনন্দ। শ্রেণীসংগ্রামের আদর্শ প্রচারের নামে শ্রেণীবিদ্বেষের তিক্ততা দ্বারা এই আনন্দের মাধুর্য যদি কেবলই পীড়িত হতে থাকে, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আতঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না। অতি প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যমাত্রেতেই আনন্দ ও সৌন্দর্যের জয়জয়কার। আনন্দের ভূরিভোজনে পাঠককে পরিতৃপ্ত করার ক্ষমতার তারতম্যের দ্বারাই এ যাবৎ সাহিত্যের আপেক্ষিক উৎকর্ষ-অপকর্ষ নিণাত হয়ে এসেছে। সর্বাবস্থায় এই আনন্দ, সৌন্দর্য তথা মাধুর্যের আদর্শকে জিইয়ে রাখার মধ্যেই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। তা যদি হয়, তবে অকারণ তিক্ততা ও আক্রোশ প্রকাশ করে সাহিত্যের আবহাওয়াকে ঘুলিয়ে তোলবার কি অর্থ? আমাদের সাম্প্রতিক বাঙালী-জীবন সহস্রবিধ অসৌন্দর্য ও কুশ্রীতার আকর হতে পারে, অন্যায় অবিচার অত্যাচারের গ্লানিভারে সমাজদেহ যৎপরোনাস্তি জর্জরিত হতে পারে, তা বলে এই ইদানীন্তন বিসদৃশ অবস্থাটাই আমাদের জীবনের শেষ কথা নয়। সভ্যতার পুরাতন দেহে সকল দেশেই সম্প্রতি যে ঘোরতর জীর্ণতার অবক্ষয় দেখা দিয়েছে, যে প্রচণ্ড ওলট-পালটের মধ্য দিয়ে মানুষকে শিথিল হাতে মাটি আঁকড়ে দোদুল্যমান চিত্তে সম্মুখপথে এগিয়ে চলতে হচ্ছে, সেই অবক্ষয় এবং বিভ্রান্তিকর অনৈশ্চিত্য কখনই মানব-সম্প্রদায়ের চিরন্তন বিধিলিপি হতে পারে না। বাঙালী-জীবনের সাম্প্রতিক ক্ষয়িষ্ণুতা ও সঙ্কটকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে ক্রম-বিবর্তনেব প্রক্রিয়ায় একটি অপরিহার্য কৃষ্ণ-অধ্যায় মনে করলে তবেই বুঝি তার যথার্থ পরিমাপ করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিত ভুলে গিয়ে শিল্পী-সাহিত্যিকেরা যদি ক্ষণিকের উপর চিরন্তনের মর্যাদা আরোপ করেন, অতিক্রান্তব্য সাময়িক বিরূপ অবস্থাকে অপরিবর্তনীয়তার লক্ষণ দ্বারা মণ্ডিত করবার চেষ্টা করেন, তা

হলে তাঁদের মস্তিষ্কের উপর বিচার-বুদ্ধির ভ্রংশতা-দোষ চাপানো ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আমাদের সাম্প্রতিক সমাজজীবন নানাবিধ কলঙ্কে কলঙ্কিত তাতে সন্দেহ কি, কিন্তু সেইটেই তার একমাত্র সত্য দিক নয়। কলঙ্কের পাশে পাশে অকলঙ্কের দৃষ্টান্তও বহু আছে, শুধু তাকে দেখবার চোখ থাকা চাই। কিন্তু সাহিত্যে যিনি মুখ্যতঃ গান্ধীজীকথিত ড্রেন-ইন্‌স্পেক্টরের ভূমিকা নিয়েছেন, তাঁর দুই চক্ষুর মধ্যে যেটি স্বভাবতঃ প্রসন্ন নির্মল চোখ সেটি অবারিত হওয়ার আশা কম। তিনি বামপন্থাভিমুখী, তাই তাঁর বাম চক্ষু সর্বদা বাম হয়েই আছে। দক্ষিণ চক্ষুর দাক্ষিণ্যের দ্বারা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করতে তাঁর আগ্রহও নেই, সামর্থ্যও নেই। তা যদি থাকত, তা হলে তাঁর ছোট বকুলপুরের যাত্রী পথ চলতে গিয়ে পথের মধ্যে কেবল পিচ্ছিল কর্দম আর খানাখন্দই দেখত না, পথিপার্শ্বস্থিত দু-একটি ফুলও তার চোখে পড়ত। আজ কাল পরশুর গল্পে যিনি অদ্য কল্য পরশ্বের নিতান্ত সাময়িক বিরূপ অবস্থার চিত্রণ ছাড়া আর কোন বিষয়কে চিত্রিতব্য বিষয় বলে মনে করেন নি, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে কোন-ক্রমেই প্রশস্ত জ্ঞান করা চলে না। বাংলা-সাহিত্যে এ-জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার কঠোরহস্তে রোধ করার সময় এসেছে। বাস্তবনিষ্ঠার নামে ক্লেদরতি ঢের হয়েছে, চাই আশা-আনন্দ-সৌন্দর্য ও মাধুর্যের দ্বারা সাহিত্যের আবহের সুস্পষ্ট পরিশোধন। হাঁ, একে আমরা ক্লেদরতিই বলব। নিজের মনের ক্লেদকে সাহিত্যের পাতায় প্রক্ষেপ করবার এ এক ধরনের বিকৃত মানসিক বিলাস। রিয়ালিজ্‌মের অজুহাতে এ বিলাসকে প্রশ্রয় দিলে অপবুদ্ধিরই পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা পরাজিতের মনোভাব বা defeatism কখনও সৎসাহিত্যের লক্ষণ হতে পারে না। সর্বপ্রকার বিরূপ অবস্থার মধ্যে মানুষের ব্যক্তিসত্তার গহন গুহায় নিহিত

আত্মা বা চৈতন্যকে অপরাজেয় রাখবার বাণীই হল শাশ্বত সাহিত্যের বাণী। এ কথা, কি এ-দেশীয় সাহিত্য কি পাশ্চাত্য সাহিত্য—সকল সাহিত্যের প্রতিই সমান প্রযোজ্য। শুধু সাহিত্যের পুরাতন ধারা নয়, আধুনিক ধারারও এই কথা। আমাদের একালের পাশ্চাত্য-দৃষ্টিভঙ্গীঘেঁষা লেখকগণ কথায় কথায় ইউরোপীয় সাহিত্যের নজির টানেন—প্রকৃত প্রস্তাবে, ইউরোপীয় সাহিত্যাচার্যদের নামোচ্চারণ করা ছাড়া তাঁরা বাংলা-সাহিত্যের সংস্পৃষ্ট এক গণ্ডুষ জল পান করতেও রাজী নন—কিন্তু তাঁদেরই জিজ্ঞাসা করি, এমন কটি শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় উপন্যাস তাঁরা দেখাতে পারবেন, মানবমহিমায় বিশ্বাস তথা আশাবাদ যার কেন্দ্রমধ্যে প্রতিষ্ঠিত নয়? সমাজজীবনের পুঞ্জীভূত ক্লেদ ঘেঁটে কে কবে ইউবোপীয সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি লাভ করেছেন? জানি, এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদীবা স্তেধঁল, ফ্লবেয়ার, জোলা, প্রুস্ত, কুপরিন এবং অতি সাম্প্রতিক কালের সার্তর, কেমু প্রমুখ অতিরিক্ত বাস্তববাদী লেখকদেব নাম কববেন। কিন্তু তাঁদের সাহিত্য আপাতবিচারে যতই চোখ-ধাঁধানো আর জৌলুসময় হোক, থ্যাকারে, ডিকেন্স, হার্ডি, ডস্টয়েভস্কি, টলস্টয়, ভিক্টর হুগো, রোমাঁ রোলা, আনাতোল ফ্রান্স প্রভৃতির সঙ্গে তুলনায় কোথায় তাঁদের স্থান? ছোটগল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী মোপাসাঁকে বাস্তববাদের একজন প্রধান পুরোহিত মনে করা হয়ে থাকে, কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার, মোপাসাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বাস্তববাদে নয়, পরন্তু বাস্তবের নির্যাস দ্বারা তৎসৃষ্ট সাহিত্যকে শিল্পরসান্বিত কবার দুর্লভ ক্ষমতায়। সুগূঢ় মানবপ্রীতি তাঁর সাহিত্যের পরতে পরতে অন্তর্লীন হয়ে আছে। মোপাসাঁর ভাবশিষ্য এ-যুগের সমারসেট মমও তাঁর গুরুর মত একজন প্রথম শ্রেণীর বাস্তববাদী লেখক, আঙ্গিকনৈপুণ্যে তাঁব তুল্য কুশলী লেখক সহসা খুঁজে পাওয়া ভার; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি ইউরোপীয় রসিক-মহলে

প্রথম শ্রেণীর লেখকরূপে গণ্য নন। তার কারণ, যে উদার মানব-প্রীতি ও জীবনবিশ্বাস থাকলে সাহিত্য যথার্থ সাহিত্যপদবাচ্য হয়, মমের মানসিক গঠনের ভিতর তার কিঞ্চিৎ অভাব পরিদৃষ্ট হয়। বিদ্রূপে তিনি ক্ষুরধার, দৃষ্টিভঙ্গীর তির্যক্ চাতুর্যে এবং ভঙ্গীপ্রধান রচনারীতির প্রখরতায় পাঠককে চমৎকৃত করবার অদ্ভুত যাদু তিনি জানেন, কিন্তু আসলেই ফাঁকি। চরিত্রের সহজাত নৈরাশ্যবাদকে ছাড়িয়ে তিনি কখনও মানবপ্রেমের উন্মুক্ত বিশাল প্রাঙ্গণে উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। ছোট ছোট কারুকর্মে তিনি নিখুঁত ওস্তাদ শিল্পী, কিন্তু ডস্টয়েভস্কি কিংবা টলস্টয়ের মত কল্পনার উদার ঐশ্বর্য তাঁর নেই। 'সিনিক' দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে সহজাত অপূর্ণতা আছে, সেই অপূর্ণতার কারণে মম-সাহিত্য ব্যাপকভাবে সমাদৃত হওয়া সত্ত্বেও আংশিক খণ্ডিত হয়ে রইল। আর কেউ এ কথা স্বীকার করুন না করুন মম স্বমুখে স্বকীয় সাহিত্যের এই মজ্জাগত ত্রুটি স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ হন নি। তাঁর আত্মকথনমূলক গ্রন্থ *The Summing Up* এই অকপট স্বীকৃতির ঔদার্যে উজ্জ্বল।

দৃষ্টান্ত ইচ্ছা করলেই বাড়ানো যায়। তার প্রয়োজন দেখি না। শুধু আমাদের আধুনিক সাহিত্য থেকে দুটি নাম এখানে উল্লেখ করব।—বিভূতিভূষণ ও তাবাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর-সৃষ্ট সাহিত্যেব শ্রেষ্ঠ লক্ষণ এক কথায় যদি চিহ্নিত করতে বলা হয়, তা হলে মুহূর্তেকের দ্বিধা না করে আমরা বলব, সে লক্ষণ হল মানবপ্রেম তথা ভাবের নিষ্কলুষতা। মানুষেব মনুষ্যত্বে বিশ্বাস, জীবনের সার্থকতায় আস্থাশীলতা, চিরাভ্যস্ত মহৎ মানবিক মূল্যবোধগুলির প্রতি নিগূঢ় সম্ভ্রমবোধ এ দুয়ের রচিত সাহিত্যকে অবধারিতভাবে উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত করেছে। লক্ষ্য করবার বিষয়, বিভূতিভূষণ কিংবা তারাশঙ্কর এ দুয়ের কেউ ভঙ্গীপ্রধান রচনারীতিকে প্রশ্রয় দেন নি,

একালীন উপন্যাসসুলভ মনস্তত্ত্বের জটিলতার চিত্রণ এঁরা দুজনেই সযত্নে এড়িয়ে চলেছেন, তেরছা চোখে না দেখে জীবনকে তাঁরা দেখেছেন সহজ সরল দৃষ্টিতে এবং বিদ্রূপের পরিবর্তে তাঁরা তাঁদের সাহিত্যের কেন্দ্রমধ্যে স্থাপিত করেছেন মানবপ্রীতিকে। আধুনিক রুচির মানদণ্ডে রচনারীতি কথঞ্চিৎ অমার্জিত আর অচেতন হলেও এখানেই এঁদের সাহিত্যের অসংশয় সাফল্যের অভ্রান্ত সঙ্কেত নিহিত আছে বলে মনে করি। নয়তো এতদুভয়ের সমসাময়িক কত কত চতুর বিজ্ঞ ইউরোপীয় সাহিত্য মন্থন-করা লেখক ভাষার চাতুর্যে, আঙ্গিকের পারিপাট্যে আর মননশীলতার দ্যুতিতে আধুনিক সাহিত্য পাঠকের চোখ ধাঁধিয়ে দিলেন; কই, তাঁরা তো বিভূতিভূষণ তারাশঙ্করের মত জনমনে প্রবেশের দ্বিধাহীন ছাড়পত্র পেলেন না। এ আপাত-রহস্যের একমাত্র মানেই হয়, সে মানে হল মানববিদ্বেষী নৈরাশ্যবাদ তথা জীবনবিমুখতার আদর্শ যত সুনিপুণভাবেই সাহিত্যে পরিবেশিত হোক না কেন, তদ্দ্বারা জনমনের অন্তরে প্রবেশ করা যায় না। উচ্চ বর্গের শিল্পসৃষ্টির স্তরে এসে সকল প্রকার ভাবদৈন্যগোপনপ্রয়াসী চাতুর্য আর ভঙ্গী আর বুদ্ধির অসাধুতা আপনা থেকেই স্তব্ধ হয়ে যায়। উদার গম্ভীর সৎ অনুভূতি যে সাহিত্যের প্রধান উপকরণ নয়, সে সাহিত্য স্বতই শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যলোকে প্রবেশের অনধিকারী; নিম্নস্তরের সাহিত্যপিপাসার পরিতৃপ্তি-সাধনে এ সাহিত্যের আবেদন বিনিঃশেষে ক্ষয়িত, সুতরাং তা অশ্রদ্ধেয়।

আধুনিক বাংলা-কথাসাহিত্যের আর একটি অভিশাপ হল অতিরিক্ত মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ-প্রবণতা। এ প্রবণতা আমরা ইউরোপীয় মনস্তত্ত্বপ্রধান উপন্যাসের সংস্কার থেকে লাভ করেছি। বিষয়টির আভাস পূর্বে সামান্য দেওয়া হয়েছে, এক্ষনে তাকে বিস্তারিত করব। উপন্যাস-শিল্পে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ রীতি হিসাবে অগ্রাহ্য তা বলি না, বরং রচনার ভিতর এর কিঞ্চিৎ সদ্ভাব থাকলে রচনা

অধিকতর সুপাঠ্যই হয়। কিন্তু উৎকট অন্তর্নিবেশের আগ্রহের তাড়নায় প্রক্রিয়াটিকে যদি অসম্ভবের সীমায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয় তা হলে সমস্ত ব্যাপারটিই নিতান্ত হাস্যকর হয়ে পড়ে। পূর্বে মানুষের মন এত জটিল ছিল না, মনের জটিলতা অংশতঃ ইউরোপীয় নগরকেন্দ্রিক শিল্প-সভ্যতার দান। পশ্চিম-ইউরোপের শিল্পবিপ্লব মনের জগতে এ অভাবনীয় সংঘটনের মূল কারক। তারপর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সাহিত্যাশ্রিত ভাবাদর্শের খাত বেয়ে এ ঢেউ আমাদের দেশের মানুষের মনের তীরে এসে ঘা দেয়। সেই থেকে নাগরিক সভ্যতার প্রভাবে আমাদের মনও ক্রমশঃ জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। বিশেষ, নগরেই যাদের অধিষ্ঠান ও কর্মস্থল বরাবরের জন্য নির্দিষ্ট, তাদের মনে নানাবিধ ঘোরপ্যাঁচ দেখা দেয়। তারপর এক সময় সাহিত্য এই সূত্রটিকে তুলে ধরে। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের রেওয়াজ ধীরে ধীরে উপন্যাস-শিল্পে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। বর্তমানের বৈচিত্র্যহীন জীবনে ঘটনার প্রাধান্য কমে যাওয়ায় এবং তদনুপাতে মনো-জীবিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অভ্যাসটি আরও জোরদার হয়। মধ্যযুগীয় বা সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশের বর্ণনামূলক উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের প্রয়োজন হয় না; তার কারণ, তদানীন্তন মানুষের মন দিবা-লোকের মতই ছিল স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ। এখন মনের অনেক গলিঘুঁজি, অনেক তার অন্ধকার কোণ। এই অজ্ঞাত মনের উপর আলোক-সম্পাতের জন্য আধুনিক উপন্যাসকারেরা কোমর বেঁধে লেগেছেন। প্রথম-যুদ্ধোত্তর বিশ বছরের ইউরোপীয় উপন্যাসের দৃষ্টান্ত আমাদের সাম্প্রতিক লেখকদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের আগ্রহকে আরও দুর্নিবার করে তুলেছে। মনকে চিরে-ফেঁড়ে কেটে দেখাবার অসুস্থ উত্তেজনায় এক ধরনের বিকারময় অনুসন্ধিৎসা কথা-সাহিত্যিকদের লেখনীমূলে প্রশ্রয় পেয়ে চলেছে। কৌতূহল জিনিসটা জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হলেও সব কৌতূহলই সমান সুস্থ

নয়। এমন কোন কোন কৌতূহল আছে, যা পরিতৃপ্ত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হলেই বরং মঙ্গল। অতিরিক্ত মনো-বিশ্লেষণের আগ্রহ এ-জাতীয় এক কৌতূহল। কৌতূহলটির চরিতার্থতায় কারও কোন লাভ হয় বলে মনে হয় না। মনের গলিঘুঁজির নিরালায় কি কামনাবাসনা সক্রিয় বা পাত্র-পাত্রীদের কোন্ আচরণের কি সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা তা জেনে আমাদের কী লাভ, যদি না সেই বিশ্লেষণের দ্বারা রচনাকে শিল্পরসোত্তীর্ণ করার সহায়তা হয়? অথচ আমরা জানি, প্রায় ক্ষেত্রেই এ-জাতীয় প্রক্রিয়ায় উপন্যাসের আকর্ষণযোগ্যতা বৃদ্ধির কোন সহায়তা হয় না, উল্টো, উপন্যাসকে অনাবশ্যক বাক্যভারে ভারাক্রান্ত করে তোলা হয় মাত্র। প্রক্রিয়াটি শুধু যে নিরর্থক তা-ই নয়, তা শিল্প-সৌন্দর্যের হানিকরও বটে।

এইখানেই আপত্তির শেষ নয়; আমাদের আপত্তির মূল আরও গভীরে নিহিত। শুধু যে বন্ধ্যা মনোবিশ্লেষণের অভ্যাসেরই আমরা বিরোধী তা-ই নয়, আধুনিক মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে জটিল মননের সংস্কারটির উচ্ছেদেরও আমরা পক্ষপাতী। মানুষ সহজ হোক, সরল হোক, ঘোরপ্যাঁচবর্জিত হোক—এই আমরা চাই। সততা মানুষের শ্রেষ্ঠ ভূষণ হোক। অর্থাৎ সমস্যাটি আর সাহিত্যের এলাকায় সীমাবদ্ধ রইল না, এর ভিতর সমাজতত্ত্ব এসে পড়ল। বিধিবৈগুণ্যে মানুষের মন জটিল হয়েছে বলেই না সে জটিলতার গ্রন্থি উন্মোচনের জন্য আজকের দিনের সাহিত্যে কত না মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি-প্রকরণের উদ্ভব হয়েছে। মনোবিশ্লেষণরূপ দুরারোগ্য ব্যাধির সুতোয় ক্রমাগত ঢিল দেওয়ায় সে সুতো এখন গুটিয়ে আনা নিতান্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। মনোনিবদ্ধতার মূল্যে একঘেয়েমিপনা ক্রয় করে আমরা উপন্যাসশিল্পে ঘটনার স্বাদ ভুলতে বসেছি। মানুষের মন জটিলতামুক্ত হয়ে আরও বেশী বহির্মুখী হলে এ অশুভ সম্ভাবনা বহুলাংশে তিরোহিত হতে পারত।

'কল্লোল'-সাহিত্য

'সাহিত্যে বাস্তববাদ' নিবন্ধে 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকদের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করেই সে প্রসঙ্গ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে প্রসঙ্গটি বিস্তারিত করতে চাই।

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের সমালোচনা-শাখায় প্রায়ই এমন সব আলোচনার দেখা পাই যাতে মনে হয়, তথাকথিত কল্লোল-যুগ বাংলা-সাহিত্যের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়; পুরাতন ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলা-সাহিত্যকে সম্পূর্ণ নতুন খাতে চালিত করবার কৃতিত্ব যদি কোন লেখক-গোষ্ঠীর প্রাপ্য হয়ে থাকে তবে তা ষোল আনা কল্লোল-কেন্দ্রিক লেখক-সম্প্রদায়েরই প্রাপ্য; কল্লোল বাংলা-সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল; বাংলার শিল্পজগতে ভাবগত বিপ্লবের অগ্রদূত বলতে একমাত্র 'কল্লোল'-বাহিত ভাবধারাকেই বোঝায়।

এই বর্ণনা স্পষ্টতঃই আতিশয্যদোষদুষ্ট। বস্তুতঃ, স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল থেকে 'কল্লোলে'র প্রতি যে আত্যন্তিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় সে মর্যাদা তার প্রাপ্য কি না সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। শুধু তা-ই নয়, কল্লোলের সমসাময়িক এবং অব্যবহিত পরবর্তী কালকে একটি 'যুগে'র মর্যাদা দেওয়া উচিত কি না তা-ও স্থিরচিত্তে বিবেচনার বিষয়। সত্য বটে আজ থেকে কিঞ্চিদধিক তিরিশ বৎসর পূর্বে কল্লোলের আত্মপ্রকাশের কালে ওই সাহিত্য-পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে এক শক্তিশালী নূতন সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। এবং তাঁরা যে বাংলা-সাহিত্যকে কোন দিক দিয়েই কিছু দিয়ে যান নি, এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। কিন্তু শক্তিই তো শক্তিমত্তার চরম কথা নয়; ওই শক্তি যথাযথ পথে চালিত হওয়াটাও সমান জরুরী বিষয়। শক্তির

অপপ্রয়োগে হিতের চাইতে অহিতই হয় বেশী। অতিরিক্ত প্রাণপ্রাচুর্য যদি সংযমনিয়ন্ত্রিত না হয়, আদর্শ এবং উদ্দেশ্যবিহীন বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে যদি তা কেবলই নিজেকে ক্ষয় করতে থাকে, উদ্ধত আত্মবিঘোষণটাই যদি তার সকল তৎপরতার মূল লক্ষ্য হয়, সে ক্ষেত্রে কত দিক দিয়ে যে অনর্থের সৃষ্টি হতে পারে তা বলে বোঝানো যায় না। এটা কি সামাজিক আচরণ, কি রাজনীতি, কি শিল্প-সাহিত্য সকল ক্ষেত্রেই সমান সত্য। বাংলা-সাহিত্যের বেলায় নীতিটি আরও বিশেষ ভাবেই খাটে। বাংলা-সাহিত্যের প্রকৃত মঙ্গলকামীদের বিশ্বাস, 'কল্লোলে'র দ্বারা এক সময় এই রকম বহুবিধ অনর্থের সূত্রপাত হয়েছিল। কল্লোল বাংলা-সাহিত্যের হিত যত না করেছে, তার চাইতে অহিত করেছে বেশী। বাংলা দেশের তদানীন্তন তরুণ-সম্প্রদায়ের ভিতর যথেচ্ছ স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করে কল্লোল-কেন্দ্রিক লেখকগণ সাহিত্যে এমন একটা মানসিক পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করেছিলেন, যে-আবহাওয়ায় স্বাধীনতা স্বতই উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়।

সাহিত্য তথা অন্যান্য সর্ববিধ শিল্পপ্রয়াসের মূল লক্ষ্য মনের মুক্তি। প্রাত্যহিক তুচ্ছতার বন্ধন থেকে মনকে মুক্ত করে তাকে সৌন্দর্য ও আনন্দময় উর্ধ্বলোকের অভিমুখে চালিত করবার যে হৃদয়সংবেদন-ক্ষমতামণ্ডিত সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া, তাকেই বলে শিল্প-সাহিত্য। বলাই বাহুল্য, শিল্প-সাহিত্যের উপজীব্য এই মানসিক মুক্তির আদর্শ আর যথেচ্ছ স্বাধীনতার আদর্শ এক নয়। কল্লোলের আশ্রয়ী লেখকগণ মানসিক মুক্তির নামে মুখ্যতঃ এই যথেচ্ছ স্বাধীনতার আদর্শটিকেই গ্রহণ করেছিলেন এবং কার্যকালে তাকে অসম্ভবের সীমায় টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা যে তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যের মাধ্যমে অবাধ যৌন-ইচ্ছার পরিতৃপ্তির আদর্শটির উপর অতিরিক্ত ঝোঁক ন্যস্ত করেছিলেন, সেটি ভারতবর্ষীয় বিশেষ

দৃষ্টিভঙ্গী ও ঐতিহ্যের বিরোধী বলেই যে শুধু অশ্রদ্ধেয় তা-ই নয়, তদপেক্ষা বৃহত্তর মানদণ্ডের বিচারেও সে জিনিস সমান বর্জনীয়। নিছক ব্যক্তিস্বার্থের খাতিরেই এই ক্ষেত্রে কোন-না-কোন জায়গায় এসে সীমারেখা টানতে হয়। মানুষের ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে যে বস্তু সব চাইতে বেশী প্রয়োজন তা হল আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ। অবদমন যদি অস্বাস্থ্যকর ও অন্যায় হয়, তার চাইতে বহু শত গুণে অস্বাস্থ্যকর ও অন্যায় হল যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা। সুদীর্ঘ কালে প্রসারিত মানব-সভ্যতার পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার ফলে এ কথার সারবত্তার নিঃসংশয় পরীক্ষা হয়ে গেছে, হঠাৎ ফ্রয়েড কিংবা আর কেউ এসে সে সত্য রাতারাতি উল্টে দিতে পারেন না। কল্লোলীয় লেখকগণ সব চাইতে বড় ভুল করেছিলেন এইখানেই। ফ্রয়েডীয় মতবাদের প্রতি আত্যন্তিক আনুগত্য প্রকাশ করতে গিয়ে এবং তৎকালীন প্রবহমান পাশ্চাত্ত্য আদর্শের যে অংশ ভ্রান্ত, সেই অংশটাকেই সার জেনে এঁরা যৌন-মুক্তির আদর্শকে তাঁদের সকল সাহিত্য-প্রয়াসের কেন্দ্রমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বললেও অন্যায় হয় না। কিন্তু তার ফলে বাংলা-সাহিত্যের আবহাওয়া ঘুলিয়েই শুধু উঠেছে; সমাজের বা জাতির কোন প্রকার মঙ্গল এ থেকে হয় নি।

এ কথা অস্বীকার করব না, কল্লোলীয় লেখকদের দ্বারা সমাজ-চেতনার প্রসার ঘটেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত ব্যাপ্ত বাংলা কথা-সাহিত্যের ঐতিহ্যের মধ্যে সমাজের অবজ্ঞাত শ্রেণীর মানুষের কোন স্থান ছিল না। শরৎচন্দ্র তাঁর পূর্ববর্তীদের ধারার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে মধ্য এবং নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের স্তরে এসেই থেমে গিয়েছিলেন। সমাজের পশ্চাদ্ভাগে যারা অবস্থান করে, সেই সব নির্যাতিত শোষিত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-সুখদুঃখ-বেদনার চিত্রণ তখনও পর্যন্ত বাংলা-সাহিত্যে

পাংক্তেয় হয়ে ওঠে নি। এই কাজটি প্রথম কল্লোলীয় লেখকরাই করেন। তাঁরা একটি সজ্ঞান নীতি হিসাবে অবজ্ঞাত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাংলা-সাহিত্যের পবিধিব ভিতর অন্যতম মুখ্য চিত্রিতব্য বিষয়ের মর্যাদা দান করেন। কথা-সাহিত্য এবং কাব্য-সাহিত্য—এই দুই শাখাকে আশ্রয় করেই উক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর সম্প্রসারণ ঘটে। এই সম্প্রসাবণের প্রক্রিয়ায় যাঁরা অগ্রণী ছিলেন, তাঁরা একইকালে কল্লোল-আন্দোলনেরও পুরোবর্তী বটে। শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র মিত্র—কল্লোল-গোষ্ঠীর অগ্রগণ্য এই দুই সৃষ্টিক্ষমতাসম্পন্ন সাহিত্যিক তাঁদের শিল্প-দৃষ্টিকে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সঞ্চালিত করে বাংলা-সাহিত্যেব এক নতুন পথ খুলে দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু কথা হচ্ছে, দৃষ্টিভঙ্গীর সম্প্রসারণ ঘটানোটাই সব নয়, তাকে ভাবালুতার আবেগমণ্ডিত ইচ্ছার স্তর থেকে একটি সর্বপ্রকার-ক্ষয়-ক্ষতিবরণে-প্রস্তুত নিবিড় আদর্শবাদে উন্নীত করাটাই হল আসল কথা। কল্লোলীয় লেখকদের মধ্যে এই আদর্শবাদের কিঞ্চিৎ স্বল্পতা ছিল। বস্তুতঃ, কল্লোলীয় লেখকদের মানসিক গঠনের সব চাইতে বড় বিচ্যুতির যদি উল্লেখ করতে হয় তা হলে নিঃসংশয়েই আদর্শবাদের অভাবের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করতে হয়। এ আদর্শবাদ ফাঁপা হৃদয়াবেগ কিংবা মানসিক 'পোজ' মাত্র নয়, পক্ষান্তরে মহৎ মানবিক মূল্যবোধগুলির প্রতি অবিচল নিষ্ঠার উপর এর নির্ভর। সত্যিকারের জীবনবোধের দ্বারা উদ্দীপ্ত উদার-গম্ভীর মানবতাবাদ এর ভিত্তি; হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে স্বতোৎসারে উচ্ছ্রিত প্রেমে এর অভিব্যক্তি। লক্ষ্য করা দরকার, এই আদর্শবাদ দেশের ঐতিহ্য থেকে বিযুক্ত ভুঁইফোঁড় কোন বস্তু নয়, পরন্তু শ্রেষ্ঠ জাতীয় ভাবসম্পদের সঙ্গে যোগেই এর সার্থকতা। কল্লোলাশ্রয়ী লেখকদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি বড় অপূর্ণতা এইখানে ছিল যে, তাঁদের সমগ্র প্রেরণাটাই ছিল

পাশ্চাত্ত্য-নির্ভর। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার বিশেষ যোগ ছিল না। অবহেলার অন্ধকার কোণায় নিক্ষিপ্ত বাংলার নীচুতলার জীবন নিয়ে কল্লোলীয় লেখকগণ সাহিত্য রচনা করেছেন সত্য; কিন্তু সে তৎপরতার মধ্যে আন্তরিকতা যত-না ছিল তার চাইতে বেশী ছিল তৎকালীন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ফ্যাশানের আনুগত্য।

আমাদের উনিশ শতকের লেখকগণ যে অর্থে জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহক ছিলেন, সে অর্থে কল্লোলীয় লেখকগণ কখনও জাতীয়তাবাদের পরিপোষক ছিলেন না। সত্যকার জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা-অভীপ্সার সঙ্গে কল্লোল-সাহিত্যের যোগ ছিল অতিশয় ক্ষীণ। এ কথার কার্যকর প্রমাণ, মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পর্বেই যদিও কল্লোল-সাহিত্য-পত্রের উদ্ভব ও পরিপুষ্টি, অথচ আশ্চর্য এই যে এত বড় একটা আন্দোলনের ছিটেফোঁটা প্রভাবও আমরা কল্লোল-সাহিত্যের ভিতর খুঁজে পাই না। কল্লোলকেন্দ্রিক নজরুল ইসলামের কবিতা এ কথার একটি ব্যতিক্রম, তবে কাজী নজরুল ঠিক কল্লোলের প্রোডাক্ট নন, তিনি পূর্বাহ্ণে সুগঠিত একটি মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কল্লোল-আন্দোলনের উদ্বেল চাঞ্চল্যের ঢেউয়ের উপর আপনাকে প্রক্ষেপ করেছিলেন মাত্র। নজরুলের বিদ্রোহভঙ্গিম গভীর হৃদয়াবেগ ও দেশপ্রেমের মূল তাঁর ব্যক্তিজীবনে নিহিত; কল্লোল এই ক্ষেত্রে প'ড়ে-পাওয়া বস্তু আহরণ করেছিল।

দেখা গেছে, লেখকের ভিতর সত্যকার জীবন-জিজ্ঞাসা না থাকলে, সুনিবিড় সত্যান্বেষণের আকুতি না থাকলে, তৎসৃষ্ট সাহিত্য কখনও ষোল-আনা জনগ্রাহী হয় না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের মানসিক গঠনের ভিতর জীবন-জিজ্ঞাসা ছিল (শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-রচিত 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে সঙ্কলিত প্রথম যৌবনে অচিন্ত্য-

কুমারকে লিখিত প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনিন্দ্যসুন্দর চিঠিগুলিই তার প্রমাণ। পৃ. ১২-১৩, ১৪-১৬, ১৯-২৭, ২১০-১২। বস্তুতঃ, বাংলা-সাহিত্যের একটি পর্বের ইতিহাস-রচনার ভানসৃষ্টিকারী বিবিধ তুচ্ছ বিষয় নিয়ে লেখা নিতান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক এই গ্রন্থখানির অনবদ্য সম্পদ হল প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই চিঠিগুলি)। আক্ষেপ এই যে, প্রেমেন্দ্রের পরবর্তী কালের রচনায় এই জীবন-জিজ্ঞাসার তেমন কোন ছাপ পাওয়া যায় না। যে জীবন-জিজ্ঞাসা দিয়ে তিনি তাঁর সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত করেছিলেন, কল্লোল প্রবর্তিত ভঙ্গি-প্রধান সাহিত্য-আন্দোলনের সংস্পর্শে সেই সুনিবিড় আকুতি ও অন্বেষা বোধ হয় ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে এসেছিল। ৺দীনেশরঞ্জন, ৺গোকুল নাগ, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র এবং অচিন্ত্যকুমার, এই আপাতবিদ্রোহী শিল্পীপঞ্চকে মিলে বাংলা-সাহিত্যে যে অভিনব কৃত্রিম ভঙ্গিমার সৃষ্টি করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁরা নিজেরাই তার সব-সেরা বলি হয়েছিলেন। একান্তভাবে পাশ্চাত্ত্যমুখী শূন্যগর্ভ 'জীবনবাদ' নিয়ে যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে খুব বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যায় না তার সব চাইতে বড় প্রমাণ তাঁরা নিজেরাই রেখে গেছেন তাঁদের সৃষ্টিকর্মের মধ্যে।

অচিন্ত্যকুমার কল্লোল-এর সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন এই ভাবে: "'কল্লোল' বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন" ('কল্লোল যুগ', পৃঃ ৩০)। কিন্তু এই কি সেই উদ্দামতা-বিদ্রোহ-আলোড়নের পরিণাম? শুধু অচিন্ত্যকুমার প্রেমেন্দ্র শৈলজানন্দের কথাই বা বলি কেন, যে বুদ্ধদেব বসু একদা 'রজনী হ'ল উতলা' গল্প এবং 'বন্দীর বন্দনা' কবিতা দিয়ে বাংলা-সাহিত্যের প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, তিনি তাঁর সমস্ত বিদ্রোহকেই কি শেষ পর্যন্ত জল করে দেন নি রবীন্দ্রিয়ানা নামে কথিত

সাম্প্রতিক বাংলার এক কিম্ভূত দাস্যমনোভাবের নিকট প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণের প্রক্রিয়ার দ্বারা? কেন এমন হল? কেন এমন হয়? হয় এই কারণে যে, তাঁরা যথাযথ ভাবে আত্মবিশ্লেষণ না করেই, ভাল করে নিজেকে না জেনেই, সাহিত্যসেবায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দেশের সংস্কৃতি ও শিল্পগত ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ স্থাপন না করে কৃত্রিম বিদ্রোহের ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় ভেসে বেড়ালে যে পরিণাম হওয়া স্বাভাবিক, এঁদের ক্ষেত্রে সেই পরিণামই ঘটেছে। স্বজাতিপ্রীতি, স্বজাতিনিষ্ঠা কিছু নয়, দেশের সাধারণ মানুষ কল্পিত অজ্ঞতার অপবাদে বর্জনীয়, অন্যপক্ষে স্বদেশের ঠাকুর ফেলে বিদেশের কুকুর ধরে টানাটানি করলেই মোক্ষ—এই যেখানে একটি সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর প্রবহমান মনোভাব, সে ক্ষেত্রে এর চাইতে মনোহর পরিণাম আশা করা যায় না।

জানি, এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ জাতীয়তার আদর্শের অন্তর্নিহিত সঙ্কীর্ণতার প্রশ্ন তুলবেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, সত্যকার স্বাজাতিকতার আদর্শ কদাচ সঙ্কীর্ণচিত্ততার দ্যোতক হতে পারে না। যথার্থ স্বাজাতিকতা একই কালে আন্তর্জাতিকতা তথা বিশ্বদৃষ্টিরও সহায়ক বটে। জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি গভীর সম্ভ্রমবোধ এর ভিত্তিভূমি, এবং ক্রম-প্রসারমাণ আন্তর্জাতিকতায় এর উত্তুঙ্গ বিস্তার। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ বলতে যে জিনিস বোঝায় তা অসার আত্মশ্লাঘাকে আশ্রয় করে কথায় কথায় তাল ঠোকার অভ্যাসেরই নামান্তর। এর থেকে এক পা বাড়ালেই আসে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধং দেহি মনোভাব। কিন্তু সে-জাতীয় জাতীয়তার কথা এ নিবন্ধে বলা হয় নি। তেমন জাতীয়তার আদর্শের প্রতি বর্তমান লেখকেরও কোন আস্থা নেই। কিন্তু এইখানে একটি কথা আছে। উগ্র জাতীয়তাবাদ যদি অশ্রদ্ধেয় আদর্শ হয়, কপট আন্তর্জাতিকতাবাদও কম অশ্রদ্ধেয় আদর্শ নয়। কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকগণ এই কপট আন্তর্জাতিকতাবাদেরই

একনিষ্ঠ পূজারী ছিলেন। তাঁরা জাতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি তো পরের কথা, তাঁদের নিজস্ব বিচরণের ক্ষেত্র এমন যে বাংলা-সাহিত্য সেখানেও প্রাক্-রবীন্দ্র-পর্বের কোন-কিছুর অনুশীলন করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। ভাষা-ভঙ্গীকে সম্পূর্ণভাবে ইংরেজীর ছাঁচে ঢালাই করে এবং প্রকাশভঙ্গির ভিতর জ্ঞানতঃ বিদেশী আবহাওয়ার সঞ্চার করে তাঁরা ভাষার ক্ষেত্রে যে অভিনবত্বের সূত্রপাত করেছিলেন, তা একান্ত ভাবে আমাদের নিজস্ব ভাষারীতির বিরোধী। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ—ব্রিটিশ-উত্তর বাংলা-সাহিত্যের এই দুই প্রধান পুরুষও দু হাতে ইংরেজী সাহিত্য থেকে উপকরণ আহরণ করেছেন; তবে তাঁদের ক্ষেত্রে যা ছিল স্বীয়করণ—জাতীয় ভাব ও ভাষার সমৃদ্ধীকরণ—তা এঁদের বেলায় নিতান্তই হয়ে দাঁড়িয়েছিল অনুকরণ। আর, উৎকৃষ্টের অনুকরণ যদি মন্দ না হয়, সে ক্ষেত্রেও এঁদের প্রয়াসের ভিতর মস্ত বড় একটি ফাঁক ছিল। তাঁরা উপযুক্ত প্রস্তুতি ব্যতিরেকেই অনুকরণ-চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মাতৃভাষার স্বকীয় রীতিপদ্ধতির সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় সাধন না করেই তাঁরা অভিনবত্বের আশায় বিদেশী ভাষার দ্বারস্থ হয়েছিলেন। স্বদেশীয় ভাবাদর্শকে ভাল করে জীর্ণ করবার আগেই বিদেশী ভাবধারা আয়ত্ত করবার জন্যে তাঁরা কোমর বেঁধে লেগেছিলেন। এর ফল কী দাঁড়িয়েছে সে ইতিবৃত্ত সাহিত্যের যাঁরা খবরাখবর রাখেন তাঁরা সকলেই জানেন।—কল্লোলের প্রবর্তিত অনুকরণাত্মক অভ্যাসের প্রাধান্যের দরুন বাংলা-সাহিত্য আজ বিজাতীয়তার আদর্শে ভরে গেছে। আজকের প্রায় প্রত্যেকটি লেখকের মধ্যেই যে আত্যন্তিক পাশ্চাত্ত্যমুখীনতা দেখতে পাই, এই অভিশাপের জন্য মূলতঃ দায়ী কল্লোল। স্বদেশীয় ইতিহাস ঐতিহ্য ভাষা সংস্কৃতি শিল্প-সংস্কার জানবার আগ্রহ নেই, চেষ্টা নেই, সব আদাজল খেয়ে লেগেছেন বিদেশী সাহিত্যের আধুনিকতম বই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার

জন্যে। এই যে আত্মবঞ্চনা, এই যে পরানুকরণ-প্রীতি, এর কারণ অনুসন্ধান করলে কল্লোলের মধ্যেই তার মূল খুঁজে পাওয়া যাবে। নিজেকে জেনে পরকে জানায় দোষ নেই, বরং লাভ বহুবিধ। কিন্তু আত্ম-অচেতন থেকে পরের সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশের অপরাধের ক্ষমা নেই। কল্লোলীয় লেখকদের সম্পর্কে এইরূপ অনমনীয় মনোভাব অবলম্বনযোগ্য কি না সুধীজনেরা বিবেচনা করে দেখবেন।

এইখানেই আপত্তির শেষ নয়। উপরি-উক্ত বিজাতীয়তার সূত্র ধরে আর একটি দোষ সাম্প্রতিক বাংলা-সাহিত্যে বিশেষভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে—ভঙ্গিসর্বস্বতা। ভাবদৈন্যের আবরণ হিসাবে ভঙ্গিমার প্রাধান্য এখনকার লেখকদের চিত্ত অল্পবিস্তর আবিষ্ট করে রেখেছে বলে মনে হয়। এরও মূল কল্লোল-প্রবর্তিত সাহিত্যান্দোলনের ভিতর সন্ধানযোগ্য। কল্লোলীয় লেখকগণ রচনার ভাষাভঙ্গি প্রকাশরীতি এবং আঙ্গিকের ক্ষেত্রে বহুবিধ অভিনবত্বের অবতারণা করেছিলেন সন্দেহ নেই, এবং এই দিক দিয়ে তাঁদের দানের মূল্য স্বীকার না করলে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হয়, সে কথাও মানি। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন, অনেকখানি মূল্যের বিনিময়ে তবে তাঁরা তাঁদের সাহিত্যকর্মের এই বৈশিষ্ট্য বিধান করতে পেরেছিলেন। অসার ভাবের আচ্ছাদন এবং অলংকার হিসাবেই তাঁরা এই আঙ্গিকসমৃদ্ধির আদর্শের প্রতি ঝুঁকেছিলেন। কল্লোলীয় লেখকদের বিরুদ্ধে ঠিক ভাবদৈন্যের অপবাদ আরোপ করা চলে না; তাঁদের ভিতর ভাবের প্রাচুর্য যথেষ্ট ছিল। তবে সেই ভাবসমূহ বিশ্লেষণ করলে কৃত্রিম বিদ্রোহজনিত অসুস্থ উত্তেজনার বিকারটাই সর্বাগ্রে চোখে পড়বে বলে মনে করি। স্বদেশীয় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করবার অত্যুগ্র উন্মাদনায় নিত্য নূতন বক্তব্যের ছলে তাঁদের মধ্যে ভাবপ্রাচুর্য ফেনিয়ে উঠেছে, তবে বলাই বাহুল্য, সে ভাবপ্রাচুর্যের মূল

আমাদের মনের মাটিতে নিহিত ছিল না। বড় জোর শোভায় ও মনোহারিত্বে সে ভাব অর্কিডের সঙ্গে তুলনীয়, মৃত্তিকা-প্রোথিত দৃঢ়মূল প্রাণবন্ত লতিকার সঙ্গে তাকে কোন ক্রমেই এক করে দেখা চলে না।

আসলে, গোটা কল্লোল-আন্দোলনটাই হল রোমান্টিক। অভিনবত্বের আস্বাদনের প্রেরণা এর আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে—সেটি কি ভাবের ক্ষেত্রে, কি আঙ্গিকের ক্ষেত্রে। বাঁধন-ছেঁড়ার আবেগে দুর্বার গতিতে নিজের পথ নিজে কেটে চলবার তারুণ্যপ্রণোদিত নেশায় কল্লোল একেবারে উদ্দাম হয়ে উঠেছিল বললে বিশেষ বাড়িয়ে বলা হয় না। অভিনবত্বের নেশা কল্লোলীয় লেখকদের এমন ভাবে পেয়ে বসেছিল যে, ভৌগোলিক সংস্থানগত দেশজ বৈশিষ্ট্যের চেতনা পর্যন্ত তাঁদের মন থেকে অবলুপ্ত হয়ে যেতে বসেছিল। তা যদি না হত, এককালীন 'সবুজপত্র'-গোষ্ঠীর অন্যতম ভাবশিষ্য এবং সেই সুবাদে ভাবৈক্যসূত্রে কল্লোল পত্রিকার বন্ধুস্থানীয় বর্তমান বাংলার কোন একজন সুপরিচিত সাহিত্যিকের পক্ষে সেই সময় এমন উদ্ভট প্রস্তাব করা কদাপি সম্ভব হত না যে, কল্লোলের আপিস কলকাতা থেকে প্যারিসে তুলে আনা হোক ('কল্লোল যুগ', পৃঃ ২৭৭)। অন্য কোন সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রয়োজন নেই, এই অবিশ্বাস্য প্রস্তাবের দ্বারাই কল্লোল-আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ স্বয়ম্প্রকাশ হয়ে উঠেছে। এতে বোঝাচ্ছে এই কথা যে, কল্লোল-কেন্দ্রিক আন্দোলন যে আগাগোড়াই একটি পরগাছা আন্দোলন, এ সত্য উক্ত প্রস্তাবের কারক ভাল করেই জানতেন, আর তাই এ-জাতীয় উদ্ভট প্রস্তাব অজ্ঞাতসারে তাঁর লেখনীমুখ থেকে নির্গত হয়ে এসেছে।

এক সময় রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা-সাহিত্যের সর্বাগ্রগণ্য কবি মোহিতলাল মজুমদারের কিছু কবিতা ('পান্থ', 'প্রেতপুরী' ইত্যাদি) কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অচিন্ত্যকুমার

তাঁর গ্রন্থে এই ঘটনাটিকে কল্লোলের অনুকূলে একটি মস্ত বড় শক্তিযোগের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ১৩৩-৩৮), কিন্তু কেন শেষ অবধি 'কল্লোল' 'কালিকলম' 'উত্তরা' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে মোহিতলালের বিচ্ছেদ ঘটল, সে সত্য তিনি প্রকাশ করেন নি। বোধ করি, সেটি উদ্ঘাটন করা তিনি নিরাপদ বিবেচনা করেন নি। ঠিক কি কারণে কোন্ শিল্পী কেমন আচরণ করেন, বাইরে থেকে সেই দুজ্ঞের্য় রহস্যের তল খুঁজে পাওয়া কঠিন, তবে এই ক্ষেত্রে একটি অনুমান করা যেতে পারে। আমাদের মনে হয়, মোহিতলালের অব্যভিচারী ক্লাসিসিজ্ম্-নিষ্ঠাই কল্লোলপ্রমুখ হাল্কা-চটুল পত্রিকাগুলির সঙ্গে তাঁর বিভেদের মূল কারণ। কল্লোলনিষ্ঠ মোহিতলালের ভক্তগণ তৎকালীন মোহিতলালের কবিতার দেহবাদটাই শুধু দেখেছিলেন, কিন্তু এই আপাতসুখকর ভোগাদর্শের অন্তরালে কী সুদুঃসহ সংযমের শাসন প্রচ্ছন্ন আছে, সেটি তলিয়ে বোঝবার মত স্থির বুদ্ধি সম্ভবত তাঁদের কারুরই ছিল না। বল্গাহীন উদ্দামতার আবহাওয়ায় বুদ্ধির স্থৈর্য আশা করা অন্যায়, আর তাই কল্লোল মোহিতলালকে ভুল বুঝেছিল। মোহিতলালের প্রচারিত দেহভিত্তিক ভোগবাদের অন্তরালে যে একটি তাপসসুলভ কৃচ্ছ্রতার শাসন আছে, আছে আত্মনিগ্রহী বৈরাগ্য, এই সত্য রোমান্টিক ভাবালুতার বাষ্প-ভরতি ফাঁপা ফানুসদের দৃষ্টি স্বতই এড়িয়ে গিয়েছিল। মোহিতলালের কাব্যকলার প্রতি স-মনোযোগ দৃষ্টিপাত মাত্র প্রথমেই চোখে পড়বে তাঁর ভাষাভঙ্গির দৃঢ়সংবদ্ধতা, দার্ঢ্য, ঠাসবুনন কারুকর্ম। কাব্যরূপের এই বৈশিষ্ট্য ক্লাসিসিজ্মের আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা থেকে পাওয়া। বলা বাহুল্য, এই মেজাজের সঙ্গে কল্লোলের হালকা-চপল মেজাজের সাযুজ্য হতে পারে না। আর সম্ভবতঃ সেই কারণে উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ দু দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। মোহিত-

লাল কল্লোলের সংস্পর্শ ত্যাগ করে আপনাকে 'শনিবারের চিঠি'র পক্ষভুক্ত করলেন। ঠিক সদৃশ কারণে না হলেও দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ গুরুতর পার্থক্যের দরুন, আরও কিছুকাল বাদে কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের সঙ্গে তারাশঙ্করের ব্যবধান সুদুস্তর হয়ে ওঠে। তিনিও কল্লোলের সংস্রব ত্যাগ করে 'শনিবারের চিঠি'র পক্ষাবলম্বন করেন।

গত প্রায় চার দশকের বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে এ ঘটনা সুবিদিত যে, 'শনিবারের চিঠি' কল্লোল-পক্ষীয়দের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু কেন এই বিরুদ্ধাচরণ, তার যথাযথ তাৎপর্য এখনও পর্যন্ত সঠিক হৃদয়ঙ্গম হযেছে বলে মনে হয় না। তবে সান্ত্বনা এই যে, আজ প্রায় চল্লিশ বৎসরেব ব্যবধানে ওই সময়কার বাদ-বিসম্বাদের সত্যকার পবিপ্রেক্ষিতটি সাহিত্যামোদী অথচ সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের চোখে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কল্লোল কালিকলম প্রভৃতি নতুন পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে অনিয়ন্ত্রিত তারুণ্যের যে উদ্দাম অভিযান শুরু হয়েছিল তাকে অবদমিত করার চেষ্টার অপবাদে এক সময় শনিবারের চিঠির অটল মস্তকোপরি স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষ থেকে বহু নিন্দা-কটূক্তি বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোনরূপ প্রতিকূলতাই এই পত্রিকাটিকে তার সংকল্পিত লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট করতে পারে নি। আজ বহু বৎসরের ব্যবধানে আবহাওয়া যখন শান্ত হয়ে উঠেছে, তৎকালীন সাহিত্যিক মামলাকে কেন্দ্র করে দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত বাগ্‌বাত্যার ধূলো যখন বহুল পরিমাণে থিতিয়ে এসেছে, তখন সমস্ত ব্যাপারটিকে যেন তার স্ব-স্বরূপে ঠাহর করতে পারা যাচ্ছে। পরবর্তী অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত হয়েছে, কল্লোল কালিকলম প্রগতি প্রভৃতি পত্রিকার বিরুদ্ধে শনিবারের চিঠির যে প্রতিবাদ-আন্দোলন তার সবটাই নেতিবাচক ছিল না, সেই প্রতিবাদী তৎপরতার মধ্যে গঠনমূলকতারও ইঙ্গিত ছিল। তারুণ্যের যে

অংশে অমিতাচার, বুদ্ধিবিকার, ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা, সেই অংশেরই উপর শুধু শনিবারের চিঠির বিদ্রূপের কশা নির্মমভাবে আপতিত হয়েছে; কিন্তু যে অংশে শ্রদ্ধাশীলতা, ঐতিহ্যনিষ্ঠা, অসংশয় সৃষ্টিক্ষমতা ও মৌলিকত্ব, তাকে স্বীকার করবার মত ঔদার্য তার ভিতর ছিল। সে ঔদার্য যদি তার না থাকত তা হলে পরবর্তী কালে শনিবারের চিঠিকে কেন্দ্র করে এক সত্যকার সৃষ্টি-প্রতিভাসমন্বিত শক্তিশালী সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর উদ্ভব হত না—এমন এক গোষ্ঠী যার অন্তর্গত সাহিত্যিকদের সৃষ্টি-প্রয়াসের দ্বারা পরবর্তী বাংলা-সাহিত্যের গতি ও দিক প্রধানতঃ নিরূপিত হয়েছে। কল্লোল প্রভৃতি নবাগত সাহিত্য-পত্রিকাগুলির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে শনিবারের চিঠিই প্রথম বোঝাবার চেষ্টা করে—উচ্ছৃঙ্খলতা মানে মৌলিকত্ব নয়, বিদ্রোহের একটা ঠাট খাড়া করে তুললেই বিদ্রোহ হয় না, দাস্যমনোভাবপ্রসূত নির্বিচার পরানুকরণের দ্বারা স্বীয় ব্যক্তিগত এবং জাতীয় সৃষ্টি-প্রতিভাকেই শুধু অপমান করা হয়, এবং পিছনে স্থৈর্য ও সংযমের পোষকতা না থাকলে শেষ পর্যন্ত অতি বড় সৃষ্টিক্ষমতাও বন্ধ্যা হয়ে যেতে বাধ্য।

তারুণ্যের উন্মাদনার উগ্রতায় এ সব কথার প্রকৃত তাৎপর্য তখন সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম কবার চেষ্টা হয় নি, তবে পরে অনেকেই ঠেকে শিখেছেন। যাঁদের লক্ষ্য করে তিরিশের বৎসরগুলিতে শনিবারের চিঠির প্রতিবাদ-আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল, তাঁদের অনেকেই বয়োবৃদ্ধির সহিত বুদ্ধির পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন, তবে তখন বোধ করি সংশোধনের সময় ছিল না। কল্লোলীয় লেখকদের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মস্থ হতে পেরেছেন খুব কম জনাই, এবং যাঁরাও হয়েছেন তাঁরাও আবার একেবারে বিপরীত প্রান্তে গিয়ে ভালোমানুষির চূড়ান্ত করে ছাড়ছেন। একদা-বিপথগামী বর্তমানে-সম্বিতপ্রাপ্ত কল্লোলীয় লেখকদের নবীন-বয়সী বিদ্রোহের ভঙ্গিটি যেমন ছিল

কৃত্রিম, তেমনি প্রবীণ-বয়সী অ'তিরিক্ত ভালোমানুষিটাও হল অস্বাভাবিক। এ দুয়ের কোনটার মধ্যেই প্রকৃত সৃষ্টিক্ষমতার স্বাক্ষর নেই। এ রকম না হয়ে বুঝি যায় না। মানুষের রুচি ও প্রবণতা যৌবনকালের সীমার মধ্যেই নির্ণীত হয়ে যায়। বাল্যে যে গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়, যৌবনে তা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়—এটি শারীরিক এবং মানসিক দুই অর্থেই সত্য। যৌবনের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দৃষ্টিভঙ্গীব রূপান্তর ঘটে না এমন কথা বলি না, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পছন্দ-অপছন্দের মৌলিক আদলটি যৌবন-সীমাব ভিতব অপরিবর্তনীয় ভাবে স্থিরীকৃত হযে যায়। এর পরে যে পরিবর্তন ঘটে তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রুচির সম্মার্জন ও শাণিতকরণ, মূল ছাঁচের কদাচ বদল ঘটে।

কল্লোলের লেখকদের সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। তাঁদের মনোভঙ্গি পূর্বাহ্ণেই নির্দিষ্ট হযে গিয়েছে, পববর্তী কালে সে অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রমণের পথ আর ছিল না। তবু সব জড়িয়ে তদানীন্তন প্রতিবাদাত্মক সমালোচনা যে তাঁদেব উপর হিতকারী প্রভাব বিস্তান করেছে, এ কথা আশা করি সকলেই স্বীকার করবেন। আজ যে বাংলা-সাহিত্যেব ক্রমবর্ধমান পরিসরের ভিতর সুস্থতার অভিমুখে শিল্প-চেতনাব অসংশয় মোড় ঘুরেছে এবং তদনুপাতে সাহিত্যিকদের লেখনীতে অশ্লীলতার বিকৃত উত্তেজনা বহুলপরিমাণে স্তব্ধীভূত হয়ে গেছে, তার অনেকখানি কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে শনিবারের চিঠিবই প্রাপ্য। কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি-ধূপছাযার প্রারব্ধ বল্গাহীন তারুণ্যের অভিযান যদি অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাধাবন্ধহীনভাবে চলতে দেওয়া হত, তা হলে বাংলা-সাহিত্য আজ কোথায এসে দাঁড়াত ভাবতেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

পল্লীকেন্দ্রিক সাহিত্য

১

কিছুকাল পূর্বে একজন চিন্তাশীল লেখক কোন একটি সাময়িক পত্রিকায়* "নাগরিকতার প্রসার ও ভারতবর্ষ" এই শিরোনামায় ভারতবর্ষে নাগরিক মনোভাবের প্রসারের সমস্যাটি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। লেখক তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে সাধারণ প্রবন্ধকারদের অভ্যস্ত রীতি অনুযায়ী কেবলমাত্র মত বা মন্তব্য প্রকাশে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, তাকে তথ্যের ভিত্তিতেও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রবন্ধের বক্তব্যের সমর্থনে লেখক অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব-ঘটিত বহু পরিসংখ্যান (statistics) উদ্ধৃত করেছেন। সমালোচনাচ্ছলে তিনি বাংলা-সাহিত্যের প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন এবং সেই সূত্রে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, বাংলা-কথাসাহিত্যে নাগরিকতার লক্ষণ এখন পর্যন্ত আশানুরূপ প্রকট হয় নি। তিনি এটিকে বাংলা-সাহিত্যের অনগ্রসরতার একটি নিদর্শন বলতে চান।

লেখকের বক্তব্যের সঙ্গে আমি মোটামুটি একমত। লেখক তাঁর নিবন্ধে নাগরিকতা বনাম গ্রামীণতার সমস্যা সম্পর্কে সাধারণভাবে যে সকল অভিমত প্রকাশ করেছেন সে সকল বিষয়ে কিছু বলতে চাই না, শুদ্ধমাত্র বাংলা-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত অংশটির উপরই আপাতত আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করব। লেখক বিষয়টিকে সূত্র আকারে উপস্থাপিত করেই ক্ষান্ত হয়েছেন, এখানে তাকে আরও বিস্তারিত করা যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের আমল থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা গল্প-উপন্যাসের যদি একটি হিসাব নেওয়া যায় তা হলে দেখা যাবে যে, বাংলা গল্প-উপন্যাসাদিতে পল্লীর পটভূমিরই

* 'ক্রান্তি', বৈশাখ ১৩৬২

প্রাধান্য। পল্লীচিত্র, পল্লীচরিত্র এবং পল্লীকেন্দ্রিক ঘটনা এই তিন লক্ষণ বাংলা-কথাসাহিত্যকে সমাচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমাদের সাহিত্যের সব চাইতে জনপ্রিয় ও সফল উপন্যাস যেগুলি, সেগুলির প্রায় পনেরো-আনা পল্লীগন্ধী রচনা। 'জনপ্রিয়' ও 'সফল' কথা দুটি এখানে শর্তাধীন। অনেক সময় রচনার পল্লীগন্ধিতার জন্যেই জনপ্রিয়তা সহজলভ্য হয়। 'সফল' বিশেষণটিও ওই সূত্র ধরে আসে। তথাকথিত জনপ্রিয়তাই হল অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাফল্যের মাপকাঠি। পাছে এ কথায় ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় সেজন্যে বলি, রচনা পল্লীধর্মী হলেই যে তা শিল্পাপকর্ষের লক্ষণমণ্ডিত হবে এমন কোন কথা নেই। রচনার বিষয়বস্তু নগরকেন্দ্রিক হোক আর পল্লীকেন্দ্রিক হোক, রচনার উৎকর্ষ রচয়িতার শিল্পদৃষ্টি ও লিখনক্ষমতার উপরে নির্ভর করে। রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গির অনন্যতা ও অনুভূতির প্রগাঢ়তা যে ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হোক, তাকেই শিল্পগুণে ভূষিত করে তোলে। তবু যে নগরকেন্দ্রিক রচনার তুলনায় পল্লীকেন্দ্রিক রচনা বাংলা দেশের সাধারণ পাঠকপাঠিকার চিত্ত সমধিক আকর্ষণ করে তার কারণ, পল্লীর সংস্কার আমাদের চিত্তে অতিশয় বদ্ধমূল। নাগরিক মনোভাব আমাদের জীবনের বহিরঙ্গমাত্র স্পর্শ করেছে, আমাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হয় নি। এ দেশে গল্পোপন্যাসের ক্ষেত্রে যাঁরাই নাগরিক বিষয়কে রচনার উপজীব্য করবার প্রয়াস করেছেন, তাঁরাই প্রাথমিক একটি অসুবিধা নিয়ে সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত করেছেন। পল্লীপ্রাণ লেখকদের সাহিত্য-অনুশীলনের সমূহ সুবিধা। তাঁদের মন গোড়া থেকেই বাংলা দেশের শতকরা আশিজন পাঠকের মনের সুরের সঙ্গে বাঁধা। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে রুচিতে বিশিষ্ট হওয়ার সাধনাই হল শিল্পীর সাধনা। বাংলা-কথাসাহিত্যে ঠিক তার উল্টো। যে লেখক শিক্ষায় ও রুচিতে গড়পরতা সাধারণ বাঙালী পাঠকের মানসিকতার কাছাকাছি

আছেন, তাঁর সাহিত্যের সমাদর তত অবধারিত। কোন কোন মহলে পাঠক ও লেখকের এই মানসিক সমীকরণের দৃষ্টান্তকে পাঠকের সঙ্গে লেখকের আত্মীয়তাবোধের নিদর্শন মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে, এই আত্মীয়তার যুক্তিটি বিভ্রান্তিকর। পাঠকের সঙ্গে আত্মীয়তার অনুশীলন বাঞ্ছনীয় বলে শিক্ষায় ও রুচিতে পাঠকের মানসিকতার সমস্তরে নেমে আসতে হবে—এমন দিব্য বাংলা দেশের লেখকদের কেউ দেয় নি। অথচ বাংলা দেশের পল্লীপ্রাণ লেখকমাত্রই ওই বাধ্যবাধকতার চেতনার অধীন। তাঁরা নাগরিকতারূপ গুণকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন এবং মনের সবটুকু ঝোঁক দিয়ে ফেলেন গ্রামীণতার উপর। যেন গ্রামীণতা গ্রামীণতার জন্যেই বন্দনীয়, আচরণীয়। পাঠক যেহেতু অনগ্রসরতার স্তরে আবদ্ধ হয়ে আছে সে-কাবণ পাঠকের মন পাওয়ার জন্যে লেখককেও অনগ্রসর থাকতে হবে। নাগরিকতার চর্চা, মনঃপ্রকর্ষের চর্চা লেখকের পক্ষে দূষ্য। হেতু কী? না, তার ফলে বাংলা দেশের শতকরা আশিটি পাঠকের সঙ্গে আত্মীয়তার যোগ বিচ্ছিন্ন হবে। বলাই বাহুল্য, এর চাইতে আত্মপ্রবঞ্চনাকর মনোভাব আর কিছু হতে পারে না।

বাংলা-কথাসাহিত্যের অতিমাত্রিক পল্লীগন্ধিতাকে আমরা বাংলা দেশের সমাজব্যবস্থার অনগ্রসরতার প্রমাণ বলে মনে করি। সে-কারণ সাহিত্যেরও।

২

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, ভারতবর্ষের প্রাণ তার গ্রামে নিহিত। এ কথার অর্থ এই যে, ভারতবর্ষের অধিবাসী-সংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ গ্রামাঞ্চলে বাস করে। ভারতবাসীর সুখ-দুঃখ ভারতবর্ষের পল্লীবাসী জনসাধারণের সুখ-দুঃখের প্রায় সমার্থক। কিন্তু এটি

হল বাস্তব অবস্থার চিত্রণ। আদর্শ অবস্থার চিত্রণ এ থেকে স্বতই ভিন্নতর হওয়া উচিত। ভারতরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গঠনের পরিকল্পনার কাজে যাঁরা নিয়োজিত আছেন তাঁরা সকলেই বিচক্ষণ ব্যক্তি। ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার কৃষিকেন্দ্রিক তথা পল্লীকেন্দ্রিক কাঠামো স্বীকার করে নিয়েও তাঁরা সকলেই গ্রামাঞ্চলের উত্তরোত্তর নাগরিকীকরণের পক্ষপাতী (progressive urbanisation of the countryside)। এই উদ্দেশ্যের চেতনা থেকেই পয়লা দফা পাঁচ-সালা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের (The Community Projects) উদ্ভব। বড় বড় বাঁধ, সেচ, জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনাগুলির মূলেও আছে এই লক্ষ্য। ভারতরাষ্ট্রের পল্লীবাসী সাধারণ মানুষের জীবনে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা যত বেশী পরিমাণে অধিগম্য করে তোলা হবে, তত ভারতের উন্নতি বাঞ্ছিত পথ ধবে অগ্রসর হচ্ছে বলে মনে করা হবে। আমরা আমাদেব পাঁচ লক্ষাধিক গ্রামকে পূর্বাবস্থায় ফেলে রাখতে চাই না, গ্রামকে যতদূর সম্ভব নগরেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্করণে পরিণত করে তুলতে চাই। ভাবতবর্ষ যদিও মূলতঃ কৃষিকেন্দ্রিক দেশ, তা সত্ত্বেও এ কথা আজকের দিনে কেউ বলবেন না যে, শিল্পায়িতকরণেব আদর্শ ভাবতের পক্ষে অগ্রহণীয়। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষেব বিশেষ অবস্থার কথা মনে রেখে এ দেশের জন্যে মিশ্র শিল্পনীতির সুপারিশ করেছেন। বড় বহরের শিল্প ও কুটিরশিল্প এতদুভয়কেই ভারতবর্ষে পাশাপাশি চলতে দিতে হবে। গান্ধীজীর স্বপ্ন অনুযায়ী গ্রামগুলিকে যতদূর সম্ভব স্বয়ংনির্ভর করে তুলতে হবে, কিন্তু এই স্বয়ংনির্ভবতার অর্থ পুরাতন সমাজব্যবস্থার পোষকতা নয়। গান্ধী-সমর্থিত বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতির (decentralised economy) সীমার মধ্যেই গ্রামগুলিতে নগরের সুযোগ-সুবিধাদি পৌঁছে দিতে হবে। নবীন ভারতবর্ষ অশিক্ষা ও কুসংস্কার-সমাচ্ছন্ন পুরাতন গ্রামীণ

সমাজব্যবস্থার আমূল রূপান্তর কামনা করে। ইতোমধ্যেই এই রূপান্তরের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। পল্লীর চেহারার আমূল রূপান্তর সাধিত না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।

৩

এই যদি আদর্শ পল্লীর রূপ সম্বন্ধে ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মনোভাব হয় এবং সে মনোভাব সমাজের চিন্তাশীল মানুষের সমর্থন পেয়ে থাকে, তবে কেন আমরা অদ্যাবধি সনাতন পল্লীগন্ধিতার সংস্কার আঁকড়ে থাকব? কেন সাহিত্যে আর-সব বিষয়বস্তুকে পরিবর্জন করে পল্লীকেন্দ্রিক বিষয়কেই প্রাধান্য দেওয়া হবে? বাংলা গল্প-উপন্যাসে ঘেঁটুফুলের বর্ণনা আর 'মা শেতলার থানের' অলৌকিক মাহাত্ম্যের কীর্তন যথেষ্ট হয়েছে, এখন থেকে এ সব বিষয়ের উপর হতে মনোযোগ প্রত্যাহার করে তাকে অন্যত্র স্থাপন করতে হবে। ভিন্ন এক নিবন্ধে আমি বলেছি, বাংলা গল্প-উপন্যাসে বৃহতের বেগ সঞ্চালিত হওয়া দরকার। বর্তমান প্রসঙ্গে সে কথার পুনরুক্তি করি। আমরা যে চিন্তা ও কল্পনার দিক দিয়ে বিশ্ববাসীর অগ্রসর পদক্ষেপের সঙ্গে সমতালে পা ফেলে চলতে জানি আমাদের বাংলা-ভাষার গল্পোপন্যাসের ভিতর তার প্রমাণ দিতে হবে। গ্রামেতর নূতন নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করে দেখাতে হবে, সনাতন চণ্ডীমণ্ডপ আর বুড়ী বটতলাই আমাদের মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য অনুভবের একমাত্র স্থান নয়, নাগরিক আবহাওয়াতেও আমরা সমান স্ফূর্তি অনুভব করতে পারি। বাংলা-সাহিত্যে যতদিন না বিষয়ের পরিধির সম্প্রসারণ হচ্ছে, ততদিন আমাদের মানসিক মুক্তি বিশেষ ভাবে পরাহত হয়ে থাকবে।

কেউ কেউ বলবেন, রচনার বিষয়নির্বাচনে লেখকের অভিজ্ঞতা একটা বড় জিনিস। লেখক তাঁর স্বকীয় অভিজ্ঞতার গণ্ডীর মধ্যেই

তাঁর রচনার উপজীব্য বিষয়ের নির্বাচনক্রিয়া সীমাবদ্ধ রাখবেন, এইটেই প্রত্যাশিত। যিনি যা দেখেছেন তাকে রূপায়িত করে তুলতে চাওয়াই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কোন লেখক যদি মূলতঃ পল্লীর চিত্র চরিত্র এবং ঘটনাবলীব অভিজ্ঞতার শরিক হয়ে থাকেন তবে নিতান্ত সঙ্গতভাবেই তিনি পল্লীর অভ্যস্ত এবং পরিচিত পরিবেশটিকেই তাঁর রচনার পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করার দাবি করতে পারেন। শুধু তাই নয়, তাঁর পক্ষে নাগরিকতার চর্চা সে ক্ষেত্রে ঘোরতর অনধিকার চর্চা বলে গণ্য হবে। স্বধর্মে সংস্থিত থেকে বরং অপযশ কুড়নো ভাল তবু পরধর্ম ভয়াবহ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পল্লীধর্মী সাহিত্যিক মাত্রই আঞ্চলিক সাহিত্যিক। ইংরেজী সাহিত্যে এর উজ্জ্বল উদাহরণ টমাস হার্ডি ও আর্নল্ড বেনেট; বাংলা-সাহিত্যে বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র পল্লীপ্রাণ সাহিত্যিক হলেও আঞ্চলিক সাহিত্যিক নন। তবে তাঁর মানসিক পক্ষপাত যে মুখ্যতঃ পল্লীর উপরেই ন্যস্ত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। বাংলা-সাহিত্যের নূতন-পুরাতন অন্যান্য উপন্যাস-লেখকগণের অধিকাংশ হলেন পল্লীর ধারাশ্রয়ী লেখক। খোদ বঙ্কিমচন্দ্রে নামতালিকার শুরু; তার পর বহু বহু লেখক এই ধারাটিকে পুষ্ট করেছেন। 'স্বর্ণলতা'র লেখক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সামাজিক উপন্যাসের' প্রণেতা রমেশচন্দ্র দত্ত, পণ্ডিত দামোদর মুখোপাধ্যায়, 'রায় পরিবারের' লেখক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, গার্হস্থ্য উপন্যাসাবলীর লেখক সুরেন্দ্রমোহন ও নারায়ণ ভট্টাচার্য, 'মেজ বউ'য়ের শিবনাথ শাস্ত্রী, অনুরূপা দেবী, শরৎচন্দ্র, জলধর সেন, এবং এ যুগের বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মনোজ বসু, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—সবাই প্রধানতঃ পল্লীধর্মী লেখক। এর ব্যতিক্রম হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, প্রমথ চৌধুরী, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, পরশুরাম, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর

আতর্থী, বনফুল, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সুবোধ ঘোষ প্রভৃতি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দুই ক্ষেত্রেই সঞ্চরণের অভ্যাস আছে। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির পটভূমি পল্লী, তবে উপন্যাসশিল্পে তিনি তাঁর দৃষ্টি প্রধানতঃ শহরের উপরই অর্পণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ—সম্ভবতঃ বাংলা সাহিত্যেরও শ্রেষ্ঠ—উপন্যাস 'গোরা' নাগরিক উপন্যাস।

উল্লিখিত নামতালিকার ভিতরের কথাটা হল এই যে, পটভূমি এবং পরিবেশ-নির্বাচন লেখকের ব্যক্তিজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। যিনি যে অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ অংশভাক্ নন তাঁর পক্ষে সেই অভিজ্ঞতা চিত্রিত করতে যাওয়া সঙ্গত নয়, শোভনও নয়। অবশ্য কল্পনা ও মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তি এ ক্ষেত্রে কথাকারকে কিছু পরিমাণে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা যে-কল্পনার ভিত্তি নয় তার জোর খুব বেশী নয়। রূপকথা-উপকথারও একটা বাস্তব ভিত্তি থাকে। এখানে কথা তা নয়। কথা হচ্ছে, বাঙালী নগরকেন্দ্রিক এবং পল্লীকেন্দ্রিক কথাকারের অন্য সব দিক দিয়ে ক্ষমতা যদি সমান সমান থাকে, তা হলে দুইয়ের তুলনামূলক বিচারে পল্লীকেন্দ্রিক সাহিত্যিকেরই জিত। তিনি সমধিক জনপ্রিয় হন। সাধারণ বাঙালী পাঠকের সহজাত মানসিক গঠনের জন্যেই পল্লীকেন্দ্রিক সাহিত্যিকের এই বিশেষ সুবিধাভোগ। তিনি নগরকেন্দ্রিক ঔপন্যাসিকের মাথা ডিঙিয়ে অনুচিত এবং অযৌক্তিক ভাবে এই সুবিধা ভোগ করেন। নগরকেন্দ্রিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক উদারতা বেশী, চিত্তের সচলতা বেশী, তাঁদের বুদ্ধিও তদনুপাতে প্রখর। নূতন নূতন ভাবধারা স্বীয়করণে তাঁদের গ্রহিষ্ণুতার ক্ষমতা প্রত্যক্ষ। তাঁদের সমাজ-সচেতন মনোবৃত্তি রচনার ভিতর স্পষ্টতর রেখায় চিহ্নিত, যদিও এ-ক্ষেত্রে ঋজু-কঠিন একটি নিয়ম বেঁধে দেওয়ার বিপদ আছে। প্রায় সব নগর-

কেন্দ্রিক লেখকই সংস্কৃতিবান লেখক, বিদগ্ধ লেখক। কিন্তু এইখানেই যত বিপত্তি। যে-হেতু তাঁরা বিদগ্ধ লেখক সেই হেতুই তাঁরা দগ্ধভাগ্য। পোড়া বাংলা দেশের পাঠক-সম্প্রদায়ের নিকট তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য সমাদর পান না।

কথাটা অপ্রীতিকর হলেও বলা প্রয়োজন, আমাদের গড়পরতা সাধারণ পাঠকের চিন্তা অপরিণত, রুচি অমুন্নত। তাঁদেব একটি অংশ শহরে বাস করেন সত্য, কিন্তু মনের দিক দিয়ে তাঁরা এখনও তাবিচ কবচ মাদুলি রক্ষাকালী মা-শেতলা ওলাবিবির যুগে বাস করেন। বাবা-তারকেশ্বরের কাছে 'হত্যে' দেওয়া আর গ্রামের জাগ্রত দেবীর নিকট জোড়া পাঁঠা মানত করার কুঅভ্যাস অধিকাংশ মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে লেপ্টে আছে। আমাদের দেশের শতকরা পঁচানব্বুইটি মানুষের মনোজীবনের উপর আঁচড় কাটলে দেখা যাবে, পল্লীর সংস্কাব দ্বারা তাঁবা অতিমাত্রায় আচ্ছন্ন। এ কথা কি পল্লীবাসী কি শহরবাসী সকলের সম্বন্ধেই সমান প্রযোজ্য। আমরা যারা শহরে বাস কবি তাদের দেহটা শুধু শহরের সীমায় আবদ্ধ, আমাদেব মন পড়ে আছে পল্লীর বহুকালের পুঞ্জীভূত জঞ্জালস্তূপেব মধ্যে। এ দেশের বিশেষ কৃষিকেন্দ্রিক গঠনেব জন্যে নাগরিকতা আজও আমাদের মনের ভিতর শিকড় গেড়ে বসতে পারে নি। ইংবেজী শিক্ষার যেটি উদার সাংস্কৃতিক দিক, তা ভারতেব সাকুল্য অধিবাসী-সংখ্যার এক ভগ্নাংশকে মাত্র স্পর্শ করেছে এবং তাও ভাসা-ভাসা ভাবে। জমিদার পাইক পেয়াদা নাযেব তহশীলদার মুহুরি গমস্তা ইত্যাদি নিয়ে যে গ্রাম্যজগৎ, তার প্রতি এখনও আমাদের মনে এক ধরনের রোমান্টিক আকর্ষণ আছে, যাকে 'মোহ' আখ্যা দেওযাই উচিত এবং যার নিরাকরণের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে না। আমরা সত্যি সত্যি পল্লীর উন্নয়ন চাই না, পল্লীকে আজও ঘনসংবদ্ধ বাঁশবনের অন্ধকারে আর এঁদো ডোবার পচা

জলে নিমজ্জিত রেখে পুণ্য ভিটামাটির কৌলিক মহিমা সংরক্ষণের বিমল আনন্দ অনুভব করতে চাই। শিক্ষাহীনতা আর কুসংস্কারের প্রতি আমাদের প্রাণের মমতা গভীর এবং দুরতিক্রম্য।

এই যেখানে অবস্থা সেখানে পল্লীকেন্দ্রিক কথা-সাহিত্যিক বাঙালী পাঠকসমাজের নিকট সমধিক কল্কে পাবেন তাতে আর আশ্চর্য কী। এবং সেই সঙ্গে নগরকেন্দ্রিক কথাকারের আপেক্ষিক অনাদরের কারণ বোঝাও দুঃসাধ্য নয়। পাঠকের রুচি যদি আশানুরূপ মার্জিত হত, বৃহৎ এবং মহতের ধারণার দ্বারা যদি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুপ্রাণিত হত, তা হলে নাগরিক সাহিত্যের সুরের সঙ্গে তাঁদের নিজেদের সুর বাঁধা কঠিন হত না। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই দেখি, পাঠকের অনগ্রসরতার দোষ, রুচিহীনতার দোষ ভুল করে লেখকের উপর চাপানো হয়। যেন গড়পরতা পাঠকের মানসিক মাপের চাইতে অনেকখানি বড় হয়ে উঠতে চেয়ে সংশ্লিষ্ট লেখক মহাপাতক করেছেন, যেন পাঠকসম্প্রদায়কে বাধিত করবার জন্যে তাঁদের মানসিক স্তরে থেকে যাওয়াই লেখকের উচিত ছিল। জনপ্রিয়তার মাপকাঠি এ সমাজে বড় সস্তা আর নড়বড়ে। সফল উপন্যাস তাকেই আমরা বলি, যার বিষয়বস্তু গড়পরতা সাধারণ পাঠকের মনোজীবনের স্তরে সংস্থিত এবং সেই সুরে বাঁধা। সমালোচকের নিরপেক্ষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কিছু নয়, রসিকের অনুমোদন লাভ কিছু নয়, পাঠকসমাজ কর্তৃক আদৃত হওয়া নিয়ে কথা। এই শেষোক্ত পরীক্ষায় যে বই পাসমার্কা পেল, তার শিল্পগত উৎকর্ষাপকর্ষ নিয়ে আর সংশয় প্রকাশের কারণ ঘটে না। পুস্তকের সংস্করণসংখ্যার কমি-বেশি প্রচণ্ড একটা কুসংস্কারের মত বাঙালী সাহিত্যসমাজকে আবিষ্ট করে রেখেছে। প্রকাশকদের এ বাবদে আত্মপ্রসাদ তবু মার্জনীয়, গ্রন্থকারদের আত্মশ্লাঘা মোটেই মার্জনীয় নয়। পাঠকসমাজের অনগ্রসরতার উপর এ আত্মপ্রসাদের নির্ভর, সুতরাং তা অশ্রদ্ধেয়। যে সাহিত্য-

প্রয়াসের আসল জোর পাঠকসম্প্রদায়ের রুচিহীনতার মধ্যে নিহিত, তার উৎকর্ষ যাচাইয়ের বেলায় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের কোনও একজন সমালোচক শরৎচন্দ্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "Popularity is malodorous." অর্থাৎ কিনা জনপ্রিয়তা বস্তুটি দুর্গন্ধযুক্ত। তৎকালে এই মন্তব্যটি নিয়ে সাহিত্যমহলে বিশেষ সোরগোল উঠেছিল। কিন্তু সমালোচক এই মন্তব্যটি উচ্চারণ করে এমন কী মহাপাতক করেছিলেন বোঝা যায় না। সত্যই তো জনপ্রিয়তা বস্তুটি সন্দেহজনক। কুরুচি আর কুসংস্কারের রূঢ় হস্তাবলেপের দ্বারা এতদ্দেশীয় জনপ্রিয়তার আপাদমস্তক অবলিপ্ত। সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের ক্ষেত্রে আমরা গণতন্ত্রের আদর্শের অব্যভিচারী সমর্থক হলেও সাহিত্যোপভোগের ক্ষেত্রে আমবা মাথা-গুনতির নীতিতে বিশ্বাসী নই। সেখানে আভিজাত্য এবং রসকৌলীন্যের আদর্শটিই মান্য। সত্যিকারেব উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মর্ম উপলব্ধি করতে হলে বিশেষ শিক্ষা, রুচিবোধ ও গ্রহিষ্ণুতা থাকা চাই। সকলের সে মানসিক প্রস্তুতি থাকে না। রসবোধ বস্তুটি অনুশীলনসাপেক্ষ, সেটি অনায়াসলভ্য নয়। কাজেই সাহিত্যের মূল্যবিচারে জনতার ভাল-লাগা মন্দ-লাগা দিয়ে লেখকের সাফল্য-অসাফল্য নিরূপণের মত বিভ্রান্তিকর মানদণ্ড আর কিছু নেই। অথচ দেখতে পাই, বাংলা গল্প-উপন্যাসের মূল্যায়নে এই মানদণ্ডটিরই সমধিক প্রয়োগ হয়ে থাকে। পাঠকের মানসিক প্রস্তুতির অভাব এতদ্দেশীয় কথাসাহিত্যিকের প্রতিষ্ঠা-লাভের সব চাইতে বড় সহায়ক।

৪

বাংলা-সাহিত্যে সত্যিকার নাগরিকতার সূত্রপাত হয়েছিল ব্রিটিশ অভ্যুদয়ের পরবর্তী কালে। বাংলা-সাহিত্যের প্রাক্-

ব্রিটিশ যুগ পল্লীগন্ধিতার দ্বারা সমাচ্ছন্ন। কেবল এর ব্যতিক্রম ছিলেন কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র, রামনিধি গুপ্ত ও ঈশ্বর গুপ্ত। ইংরেজী সভ্যতার সংস্পর্শ ও সংঘাতের ফলেই এদেশে প্রথম যথার্থ নাগরিকতার উদ্ভব হয়। নাগরিকতার, সুতরাং আধুনিকতারও। ইংরেজী সভ্যতার সঙ্গে বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতির সংঘাত ও সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ সুফল হলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ। এঁদের মধ্যে যদিও সকলে সাহিত্যব্রতী নন, তা হলেও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, পল্লীগন্ধিতা এঁদের কারুরই মনোজীবনের বৈশিষ্ট্য নয়। এঁরা সকলেই নাগরিক সংস্কৃতির মানস সন্তান। এঁদের প্রত্যেকেই পল্লীর উন্নতিকামী ছিলেন, তাই বলে পল্লী-বাসীর সস্তা আত্মীয়তা অর্জনের জন্যে নিজেদের মনোজীবনকে পল্লীবাসীর স্তরে নামিয়ে আনেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র পল্লীকেন্দ্রিক উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তার ভিতর নাগরিকতার সুরটিই প্রধান। বস্তুতঃ বাংলা-সাহিত্যে সার্থক নাগরিক সংস্কৃতির আবহাওয়া সঞ্চারে বঙ্কিমচন্দ্রের দান সর্বস্বীকৃত ও বিশাল। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন প্রখর মনস্বী ও সুপণ্ডিত, সুতরাং স্বভাবতঃই তাঁর পল্লীগন্ধী হওয়ার যো ছিল না। গ্রামীণতার অনুশীলনে তাঁর না ছিল উৎসাহ, না ছিল ইচ্ছা। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এই মন্তব্য সর্বাংশে প্রযোজ্য। আরও বেশী প্রযোজ্য এই জন্যে যে, তাঁর জীবনদর্শনের ভিতর বাঙালীর স্বকীয় ঐতিহ্যনিষ্ঠার সঙ্গে দুটি বাহিরের ধারার মিলন ঘটেছিল। শেষোক্ত দুটি ধারাই নগরমুখী। এক ইংরেজী শিক্ষা, দুই নাগরিকতাগর্ভ মুসলিম সংস্কৃতি। আমীরজনসুলভ মুঘল আভিজাত্যের সংস্কারের প্রতি ঠাকুরবাড়ির সহজ পক্ষপাত ছিল। কবির এই সহজ নাগরিকতার ধারার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছিল

তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র শিল্পিগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে এবং আত্মীয়াগ্রগণ্য বিশিষ্ট প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে। বর্তমান প্রসঙ্গে কতকটা অবান্তর হলেও বলি, অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পকলার ভিতর পল্লীর বিষয়বস্তুকে সামান্যই মর্যাদা দিয়েছেন, অথচ তাঁরই কৃতী শিষ্য শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর চিত্রাবলীর মধ্যে পল্লীপ্রাণতার জয়জয়কার। এইখানেই এঁদের মনোভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য, এবং এই মনোভঙ্গীর তারতম্যের জন্যে এঁদের চিত্রকলার রসবস্তুরও যে কত পার্থক্য তা দুজনার ছবি পাশাপাশি মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যপ্রয়াসের ভিতর নাগরিকতা স্পষ্ট-উচ্চারিত। তাঁর বৈদগ্ধ্য সর্বস্বীকৃত। চৌধুরী মহাশয়ের এই মানসিক বৈশিষ্ট্য আমাদের অপছন্দ এমন কথা বলতে পারি না।

শরৎচন্দ্র বিষয়বস্তুর নির্বাচনে পল্লীর প্রতি পক্ষপাতযুক্ত, কিন্তু তাঁর ভাষাশিল্প, গল্পকথনরীতি বৈদগ্ধ্যের চেতনার পরিচায়ক। তিনি অতিশয় সজ্ঞান শিল্পী, ভাষার সৌন্দর্যবিধানে তাঁর তুল্য সচেতনতা খুব কম লেখকের মধ্যেই দেখা যায়। শরৎচন্দ্রের এই মানসিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতঃই তাঁকে অচেতন পল্লীকেন্দ্রিক সাহিত্যিকদের থেকে কিঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট করে রেখেছে।

মোদ্দা কথা, সাহিত্যে নাগরিকতা দোষ নয়, একটি গুণ। এই গুণের যত বেশী অনুশীলন হবে ততই চিত্তের মুক্তির ক্ষেত্র প্রশস্ততর হবে। বাংলা-সাহিত্যে অনগ্রসর পল্লীর চিত্র-চরিত্র নিয়ে যথেষ্ট ঘাঁটাঘাঁটি হয়েছে, সেই প্রক্রিয়া কিয়ৎ পরিমাণে অবরুদ্ধ হওয়া দরকার। যেমন শিল্পায়িতকরণ কৃষিব্যবস্থার পরবর্তী উন্নত ধাপ, তেমনি নাগরিকতা গ্রামীণতার তুলনায় নিঃসন্দেহে উন্নততর অবস্থা। কাজেই নাগরিকতার চর্চায় বাংলা-সাহিত্যের লাভ বই ক্ষতি হবে না।

'বস্তি' সাহিত্য

আজকাল আমাদের সাহিত্যের কোন কোন সমালোচক এই একটা রব তুলেছেন যে, সাহিত্যে 'রকের' ভাষা, বস্তির ভাষা এবং খিস্তির ভাষাকে তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। এই সব সমালোচকদের প্রতিপাদ্য এই যে, আধুনিক বাংলা-সাহিত্য ভাষা-প্রয়োগের ব্যাপারে শালীনতার চেতনার দ্বারা অতিমাত্রায় আবিষ্ট; ভাষার আত্যন্তিক শালীন ব্যবহারেব ভিতর রুচির সূক্ষ্মতা প্রকাশ পায়, কিন্তু জীবনের প্রাণবন্ততা প্রকাশ পায় না; যে শিক্ষিত-জনের ভাষা বাংলা-সাহিত্যে ব্যবহার হয়, সেই শিক্ষিত সম্প্রদায় সমগ্র বাঙালী সমাজের এক অকিঞ্চিৎকর ভগ্নাংশ মাত্র, কাজেই তাদের ভাষায় বাঙালী সমাজের প্রকৃত রূপ উদ্‌ঘাটিত হওয়া সম্ভব নয়; সর্বোপরি, ভাষা-ব্যবহারে বাঙালী লেখকদের এই অতিরিক্ত শুচিবাইগ্রস্ততা পূর্বে ছিল না, এটি ইংরেজী সাহিত্যের খাত বেয়ে আসা 'রোমান্টিক ভিক্টোরীয়' ঐতিহ্যের কুফল, যার দরুণ আমাদের সমগ্র আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের আন্দোলন শ্লীলতা-চর্চার নামে জীবনের স্বাভাবিকতা থেকে একেবারেই ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে এবং ঘটনা ও চরিত্রচিত্রণে প্রচণ্ড এক কৃত্রিমতার জন্ম দিয়েছে। এই সব বিবেচনায় উক্ত সমালোচকদের সিদ্ধান্ত হল এই যে, বাংলা-সাহিত্যকে যদি বাস্তবানুগ এবং প্রকৃত জীবন-বোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হয় তা হলে বাঙালী লেখকদের ভাষার এই অতিরিক্ত খুঁতখুঁতেপনা ছাড়তে হবে, প্রাণশক্তিকে অশ্লীলতা-ভীতির ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে, তথাকথিত নীতির দাবিকে সত্যের দাবির অনুগত ও অধীন করতে হবে। আধুনিক বাংলা-সাহিত্য কৃত্রিম এক জীবনদর্শন-প্রসূত শালীনতার পাণ্ডু-

রোগে ভুগছে, স্বাভাবিকতার রক্তসঞ্চারেই শুধু এই ব্যাধির প্রতিকার হতে পারে।

আলোচ্য সমালোচকদের মতে বাংলা-সাহিত্যে এই অতিরিক্ত শালীনতার সংস্কারের প্রাধান্যের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ দায়ী। তাঁরাই হলেন বাংলা-সাহিত্যে রোমান্টিক ভিক্টোরীয় ঐতিহ্যের প্রধান ধারক ও বাহক। বিশেষ, রবীন্দ্রনাথ জোড়া-সাঁকো ঠাকুরবাড়ির আবহাওয়ায় বলবৎ ধর্মীয় তথা সুনীতিবাদী প্রভাবের কারণে এই ভাষাগত শালীনতার সংস্কারকে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত পরিমাণে যত্ন-পরিচর্যা করেছেন। পূর্বে ঠিক এই অবস্থা ছিল না। ভারতচন্দ্র এবং ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়, দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে এবং 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় বঙ্কিম-রবীন্দ্র-পোষিত সাহিত্যিক সংস্কারের বিপরীত মনোভাবের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত লেখকদের রচনাবলীতে শালীনতার অভাব হয়তো কিঞ্চিৎ উগ্র রকমেই আছে, কিন্তু জীবনপ্রীতিতে ও সজীবতায় সেই বিচ্যুতির পূরণ হয়েছে। দেহবাদ সম্পর্কে তাঁদের কোনরূপ নাক-সিঁটকানো মনোভাব ছিল না। তাঁরা জেনে-শুনে বাস্তব সঙ্গতির আদর্শকে তাঁদের রচনার ধারার ভিতর গ্রথিত করেছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সধবার একাদশী' ও 'নীলদর্পণ' নাটকে তথাকথিত ইতরজনোচিত খিস্তি-খেউড়ের ভাষা ব্যবহারে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন নি। ফলে তদ্‌রচিত সাহিত্য হয়তো এখনকার কালের রুচিতে পরিপুষ্ট কুলীন পাঠকদের পাতে দেওয়ার যোগ্য হয় নি, কিন্তু তা বাস্তবানুসারী হয়েছে, জীবনধর্মের সঞ্জীবনীস্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে টেকচাঁদী ও হুতোমী ভাষায় রুচিবৈদগ্ধ্যের প্রমাণ না থাকতে পারে, কিন্তু অগণিত সাধারণ মানুষের মুখের কথার আদল তাতে ঠিক ঠিক প্রতিফলিত হওয়ায় সাহিত্যের পরিধির সম্প্রসারণ ঘটেছে, তার ভিতর বহু-আকাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক চেতনার সুর লেগেছে। শুধু ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত,

দীনবন্ধু মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ কেন, উক্ত সমালোচকবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষারীতিকে পর্যন্ত তাঁদের নজিররূপে দাঁড় করাতে চান। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর কতিপয় হাল্কা রচনায় একাধিক আরবী ফারসী এবং দেশজ শব্দ ব্যবহার করেছিলেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনতঃ আপাত-অরুচিকর ভাষা ব্যবহারেও পশ্চাৎপদ হন নি—এই যুক্তিতে এঁরা ঈশ্বরচন্দ্রকে সাহিত্যে বাস্তবতার সমর্থক বলতে চান। ব্রিটিশ-উত্তর বাংলা সাহিত্যের প্রাথমিক অধ্যায়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনায় যে বাস্তবতার সূত্রপাত, দীনবন্ধু মিত্রে তার পরিপুষ্টি এবং কালীপ্রসন্ন সিংহে তার পরিণতি। পরবর্তী কালের বাংলা-সাহিত্য বঙ্কিম-রবীন্দ্রাদর্শের প্রভাবে এই naturalism থেকে বিচ্যুত হয়ে অবাস্তব রুচিবৈদগ্ধ্যের কল্পিত আভিজাত্যকে আশ্রয় করে ভাষায় ও ভাবে অস্বাভাবিকতারই পোষকতা করেছে মাত্র।

প্রথমে সুপণ্ডিত কবি-সমালোচক ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয় দীনবন্ধু মিত্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের বিরুদ্ধে এই আত্যন্তিক শালীনতার অভিযোগ উত্থাপন করেন। পরে তিনি তাঁর সম্পাদিত 'বাংলা প্রবাদ' গ্রন্থে এই অভিযোগের সূত্রটিকে আরও কিঞ্চিৎ সম্প্রসারিত করেন। এক্ষণে অন্যান্য কতিপয় সমালোচকও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ডক্টর দের মতের প্রতিধ্বনি করে বাংলা-সাহিত্যকে জীবনধর্মী করে তোলবার সাধনায় মেতেছেন। এই আন্দোলনের পোষকতা করতে গিয়ে একজন লেখক সেদিন কোনও একটি পত্রিকায় ফরাসী সাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে এমন পর্যন্ত বলেছেন যে, "কাব্যের এবং দর্শনের ভাষার সঙ্গে খিস্তির ভাষার ব্যবধান বড়জোর একচুল এবং খিস্তির ভাষার মধ্যে কাব্য বা দর্শনের ভাষার চাইতে কম ব্যঞ্জনা লুকিয়ে নেই।" উক্তিটির বৈপ্লবিকত্ব এতই

ঘোরতর চমক-লাগানো যে, এর পরিপূর্ণ অর্থবোধ হতে কিঞ্চিৎ সময় লাগে। কিন্তু বৈপ্লবিক উক্তিমাত্রই গ্রহণযোগ্য মনে করবার কারণ নেই। এক-একটি চমক ধরানো কথা এমন যে, অতি-মাত্রায় আধুনিকতাভিমানীর পক্ষেও তা হজম করা শক্ত। বোধ হয় আলোচ্য উক্তিটিও এই পর্যায়ে পড়ে।

তথাকথিত জীবনধর্ম ও স্বাভাবিকতার খাতিরে সাহিত্যে অশালীন ভাষা ব্যবহারের স্বপক্ষে এই যুক্তিজাল বিস্তারপ্রয়াসকে আমরা পশ্চাদ্‌গতির নিদর্শন বলে মনে করি। এটি ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেবার প্রয়াসেরই নামান্তর। নানা বর্বরজনোচিত বিশ্বাস ও আচরণকে বর্জন করতে করতে যেমন মানবসভ্যতার ক্রমিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তেমনি বহু অশালীন ও অমার্জিত শব্দ-ব্যবহারের অভ্যাস ত্যাগ করতে করতেই ভাষা ক্রমশঃ সৌন্দর্য ও সৌকুমার্যের পথে এগিয়ে চলেছে। সভ্যতার অগ্রগতি ও ভাষার অগ্রগতির প্রক্রিয়া একই পথ বেয়ে চলে, কেন না সভ্যতা এবং ভাষার উচ্চাবচ অবস্থার মধ্যে সর্বদাই আনুপাতিক সম্পর্ক বিদ্যমান। বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির প্রাথমিক স্তরগুলিতে তৎকালীন লেখকদের রচনায় অশালীন ভাষা ব্যবহারের অভ্যাস যদি কিঞ্চিৎ উগ্ররকমেই প্রকাশ পেয়ে থাকে, বুঝতে হবে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের অনগ্রসরতার জন্যই সেই সেই কালের লেখকদের পক্ষে ওইরূপ উচ্ছৃঙ্খল হওয়া সম্ভব হয়েছে। এটি জীবনধর্মের আদর্শের প্রতি অনুরাগ নয়, nuturalism-এর প্রতি মমত্বের প্রশ্নও এক্ষেত্রে ওঠে না; এটি নেহাতই লেখক মনের অপরিণত অবস্থার দ্যোতক। দীনবন্ধু মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের যুগের পর বাংলা ভাষা আরও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এবং অন্যান্য আরও বহু লেখকের চেষ্টায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আজ এমন এক পরিণত স্তরে এসে উপনীত হয়েছে, যে আবহাওয়ায় রুচির

স্থূলত্ব তথা অশালীনতা কোন সাহিত্যসেবীরই মনঃপূত হতে পারে না। পূর্ববর্তী লেখকদের বিচারপ্রবণতা, গ্রহণবর্জনক্ষমতা ও নানা মূল্যবান অভিজ্ঞতার সুফল বর্তমান লেখকেরা উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করেছেন। পূর্ববর্তীরা শালীন-অশালীনের পার্থক্য নিরূপণে যে বিচারশক্তি প্রয়োগ করতেন সে শক্তি তাঁরা আয়াসের দ্বারা অর্জন করেছিলেন, কিন্তু বর্তমান বাঙালী লেখকদের জীবনে তা একান্ত সহজাত। দীর্ঘকালীন ভাষাচর্চার ঐতিহ্য পশ্চাতে বিলম্বিত থাকায় বর্তমান বাঙালী লেখকদের কান মন স্বভাবতঃই এমন স্পর্শকাতর হয়েছে যে, যে-কোন একটি অশালীন শব্দের প্রয়োগে তাঁদের সহজ শিল্পবোধ আকস্মিক আঘাতে যেন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সুস্থ প্রভাবে পুষ্ট যে কোন আধুনিক বাঙালী লেখকের কলম অমার্জিত শব্দ ব্যবহার করতে গিয়ে অবধারিতভাবে হোঁচট খায়। 'সধবার একাদশী'র সংলাপের ধরনে আজকের দিনের কোন বাঙালী নাট্যকার যদি তাঁর রচনায় খিস্তি-খেউড়ের ভাষা অবতারণার চেষ্টা করেন তা হলে তাঁর কলমের কালি স্বাভাবিক দ্বিধাবশতঃই লজ্জায় লাল হয়ে উঠবে। পুনরায় বলি, এটি জীবনধর্ম বনাম কৃত্রিম শালীনতার দ্বন্দ্বের প্রশ্ন নয়, শুচিবাইগ্রস্ততার অপবাদও এ প্রসঙ্গে অবান্তর; এটি নিছকই পরিমার্জিত রুচির কথা। অনেক দিনের অভ্যাসে এ রুচি গড়ে উঠেছে, আজ ইচ্ছা করলেই আমরা এ রুচিবোধকে আমাদের সাহিত্য থেকে—সুতরাং জীবন থেকে—বিদায় দিতে পারি না। যেমন শিক্ষিত জনের কথাবার্তায় তেমনি লিখিত সাহিত্যের বর্ণনায় ও সংলাপে আজ অশ্লীল বা অমার্জিত শব্দের প্রয়োগ কদাচ হয়ে থাকে। আধুনিক কালের রুচিতে বাধে বলেই এ রকমটি হয়। তবু বরং লোকে বাস্তব জীবনের শ্লথ মুহূর্তের সংলাপে অশালীন শব্দব্যবহার গ্রাহ্য ও সহ্য করে, কিন্তু ভাষার লিখিত রূপের ভিতর এ-জাতীয়

শৈথিল্য কেউ ক্ষমা করে না। মানুষের মন পরিণত হয়েছে, সুতরাং তার বোধও তীক্ষ্ণতর হয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী ভাষাচর্চায় অনুভূতির স্পর্শকাতরতাও দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ এমন হয়েছে যে, কেউ মুখের কথায় এবং লিখিত ভাষায় রূঢ় কিংবা অমার্জিত একটি শব্দ ব্যবহার করলে খট্ করে তা কানে লাগে; অশালীন মনোভাবেব প্রকাশক বাক্যবিন্যাসের দৃষ্টান্তে অন্তর পীড়িত হয়। পূর্ববর্তী শক্তিমান বাঙালী লেখকদের সদ্দৃষ্টান্তপ্রভাবেই যে আধুনিক বাঙালী লেখক ও পাঠকসম্প্রদায়ের ভিতর এ-জাতীয় সুন্দর কমনীয়তার বোধ গড়ে উঠেছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। আনাদের অন্যতন ভাষাগত সৌন্দর্য ও রুচিবোধ যদি রোমান্টিক ভিক্টোরীয় ঐতিহ্যের পরিণামফল হয়ে থাকে তবে তা নিয়ে বিবাদ করবার কাবণ দেখি না। বরং ঐতিহ্যটিকে তার জন্য স্বাগত জানাতে হয়। বঙ্কিম৲ন্দ্র রবীন্দ্রনাথ আমাদের মাথায় থাকুন যে তাঁবা তাঁদের সাহিত্যের সৎ ও সুস্থ প্রভাবের দ্বারা বাংলা-সাহিত্য থেকে খিস্তি-খেউড়ের ভাষাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছেন। আজও যদি আমরা টেকচাঁদী ও হুতোমী ভাষার সংস্কারের ভিতব আবদ্ধ হয়ে থাকতাম, তাতে এ কথাই শুধু প্রমাণ হত যে, অশালীনতা আমাদের স্বভাবে বদ্ধমূল, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ বৃথাই আমাদের ভিতর আবির্ভূত হয়েছিলেন। তেমন অপবাদ মেনে নিলে প্রচণ্ড কলঙ্কের বোঝা মাথায় করে নেওয়া হয়। আশা করি এ কালের কোন সংস্কৃতিনিষ্ঠ বাঙালীই তা নিতে চাইবেন না।

প্রতিবাদীরা প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম এই প্রসঙ্গে অযথা উত্থাপন করেছেন। তিনি প্রাকৃতজনসুলভ ভাষায় গুটিকয়মাত্র প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, তাঁর সমগ্র সাহিত্যের তুলনায় এর পরিমাণ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তা ছাড়া লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সৃষ্টিপ্রেরণা বা শিক্ষাবিস্তারের তাগিদ এই

রচনাগুলির উৎস নয়, নিতান্ত সাময়িক প্রয়োজনের তাড়না থেকে তাদের উদ্ভব। প্রতিপক্ষের কোন বিপরীত মতের যুক্তি-খণ্ডনকালেই প্রধানতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় এ-জাতীয় রচনারীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সৃষ্টির তাগিদ অপেক্ষা স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাটাই এ সকল রচনার মূল কথা। ফলে এ-জাতীয় রচনার সমাদরের আয়ুও খুব দীর্ঘ হয় নি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাস' কিংবা 'শকুন্তলা' ভাষার বিশুদ্ধি গাম্ভীর্য ও প্রসাদগুণে চিরকাল বাঙালী পাঠকের মনোহরণ করবে, কিন্তু তাঁর প্রাকৃত ভাষাশ্রিত চটুল ধরনের ওই কয়টি রচনার কথা আজ আর কারও মনে নেই। নিতান্ত সে-সব 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী'র পাতায় সন্নিবদ্ধ থেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনীর সচলতার প্রমাণ দিচ্ছে, তার বেশী কিছু নয়। বাংলা-গদ্যের অন্যতম স্রষ্টারূপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে প্রতিষ্ঠা, সে তাঁর সংস্কৃত-ধ্বনিময় দৃঢ়সংবদ্ধ গভীর-গম্ভীর ভাষারীতির জন্য, কোথায় তিনি তাঁর রচনায় 'তাকত্' 'বেহুদা', 'ফাজিল', 'ছরকট্' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন সে জন্য নয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শেষোক্ত রচনারীতির স্মৃতি দেশবাসীর মন থেকে মুছে গেছে, কিছু সংখ্যক ভাষা-গবেষকের গবেষণার খোরাক জোটানো ছাড়া অন্যকার দিনে তার আর কোন সার্থকতা নেই।

এইখানে ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে একটি মূল প্রশ্নের উত্থাপন করব। আশা করি বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা বিষয়টি ধীর চিত্তে বিবেচনা করে দেখবেন।

ভাষাপ্রয়োগের ব্যাপারে যাঁরা স্বভাববাদী, তাঁরা মুখের ভাষার আদল অনুযায়ী লিখিত ভাষাকে গঠিত করতে চান। মৌখিক এবং লিখিত ভাষার মধ্যে ব্যবধানকে তাঁরা কৃত্রিমতার নিদর্শন মনে করেন, কাজেই এই কৃত্রিমতার বিলোপে তাঁরা কৃতসংকল্প। কিন্তু যতই তাঁরা চেষ্টা করুন, লিখিত ভাষা কোন

কালেই কি মুখের ভাষার হুবহু প্রতিরূপ হতে পারে? অতিবড় গণতান্ত্রিক সমাজেও আমাদের মনে হয় মুখের ভাষা আর কলমের ভাষায় কিছু না কিছু প্রভেদ থেকে যাবে। দুইয়ের রীতি আলাদা, সুতরাং তাদের বাগ্‌ভঙ্গিও আলাদা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মানুষ কথা বলে একভাবে, আর তাকে লিখিত রূপ দিতে গেলেই রীত্যন্তরের আশ্রয় গ্রহণ করে। কেন করে? করে এই জন্য যে, মুখের কথা অসংলগ্ন, প্রায়শঃ অর্ধসমাপ্ত ও ব্যাকরণ-বিরোধী এবং ব্যক্তিভেদে নানারূপ অঙ্গভঙ্গি ও মুদ্রাদোষেব দ্বারা ব্যঞ্জিত কিংবা বিকৃত। মানুষের মুখের কথাকে কলমের মুখে হুবহু রূপ দিতে গেলে সাহিত্যে নৈরাজ্য অবশ্যম্ভাবী। বাস্তববাদ কিংবা স্বাভাবিকতার খাতিরে এই অরাজকতাকে কোন ক্রমেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। মানুষেব লেখনীর ভাষা সংযমের ভাষা, শৃঙ্খলার ভাষা, অপিচ শোভনতা ও শালীনতার ভাষা। লেখকের শিল্পী-সুলভ সৌন্দর্য ও রুচিবোধের জন্যই এই ভাষাগঠনের বেলায় তাঁকে সর্বপ্রকার অশালীনতা ও কুরুচিকে সযত্নে এড়িয়ে চলতে হয়। রিয়ালিজ্‌মের খাতিবে দেহবাদকে তবু বরং সাহিত্যে উত্থাপিত করা চলে, কিন্তু এই দেহবাদের চিত্রণে ভাষাব্যহার কোন ক্রমেই রুচিবিগর্হিত হওয়া চলবে না। দেহবাদসম্পর্কিত রচনা কোনটি যে সাহিত্যের পর্যাযে উন্নীত হয়, কোনটি হয় না, সে কেবল ভাষা-ব্যবহারে এই শিল্প ও রুচি-বোধের তারতম্যের জন্যই। দেহবাদী ভাবকল্পনাব প্রকাশ স্থূলতামণ্ডিত তথা ব্যঞ্জনাহীন হলে তা হয় পোর্নোগ্রাফি। পোর্নোগ্রাফিকে রিয়ালিজ্‌ম বলে ভুল করবার কোনই কারণ নেই। বাস্তব-সঙ্গতির আদর্শের খাতিরে, জীবনবাদেব খাতিরে আমরা সাহিত্যে দেহবাদী বিষযবস্তুব অনুপ্রবেশ ঘটাতে দিতে রাজী আছি, কিন্তু তার রূপায়ণে সর্বাবস্থায় সুমিত ব্যঞ্জনার আশ্রয় লওয়া চাই। অশালীন ভাষা অসুন্দর বলেই পরিত্যাজ্য। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ

উপন্যাসরচনায় দেহবাদী বিষয়কে বর্জন করেছেন এমন কথা বলা যায় না ('কৃষ্ণকান্তের উইল,' 'বিষবৃক্ষ', 'চোখের বালি', 'চতুরঙ্গ' 'ঘরে-বাইরে' ও 'যোগাযোগ' এ কথার বিপরীতে সাক্ষ্য দেবে); কিন্তু তাঁদের পরিমার্জিত শিক্ষালব্ধ সূক্ষ্ম রুচিশীল মন কোন সময়েই ভাষাগত অশ্লীলতাকে বরদাস্ত করতে পারে নি। আর শুধু বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথই নন, এমন যে শরৎচন্দ্র, যাঁকে বাঙালী সাহিত্যিক সমাজ রিয়ালিস্ট লেখক বলে জানেন, তিনিও কোথাও দেহবাদী চিত্র-চরিত্রের রূপায়ণে শালীনতার গণ্ডী অতিক্রম করেন নি। 'গৃহদাহে'র যেখানটায় অলকা ও সুরেশের জীবনে একান্ত স্বাভাবিক দেহগত বিভ্রান্তির কথা আছে, শরৎচন্দ্র জীবনবাদের নজিরে ইচ্ছা করলেই সেখানে প্রগল্‌ভ হতে পারতেন, কিন্তু তাঁর সহজাত শিল্পবোধ তাঁকে বাধা দিয়েছে। তিনি দু-একটি ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যঞ্জনাঘন বাক্য সংযোজন করেই তথায় গল্পকারের কর্তব্য সমাপন করেছেন।

পুনরায় বলি, বস্তির ভাষা, খিস্তির ভাষা বহুজনকথিত বলেই তা সাহিত্যগ্রাহ্য হতে পারে না। ভাষাপ্রয়োগের বেলায় সংখ্যাবহুলতার যুক্তি অপেক্ষা শিল্পের যুক্তি অনেক বেশী গ্রাহ্য ও মান্য। আমরা বিষয়বস্তুর গণতান্ত্রিকীকরণের পক্ষপাতী, এমন কি ভাষাকে যতদূর সম্ভব জীবনানুসারী করে তোলার নীতিও আমরা স্বীকার করি; কিন্তু ভাষার অশালীন ও কুরুচিকর প্রয়োগ কোন সময়েই বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নই। সাহিত্যের ভিতর যে রকম সমাজব্যবস্থারই প্রতিফলন ঘটুক না কেন, হোক সাহিত্য গণতান্ত্রিক সাম্যবাদী বা আর কিছু, ভাষার আভিজাত্য বিশুদ্ধি ও গাম্ভীর্য সর্বথা রক্ষিতব্য। বাস্তব-জীবনের সহিত সঙ্গতির অজুহাতে আমরা যদি ভাষায় শৈথিল্যের প্রশ্রয় দিই তা হলে বাংলা-সাহিত্যের এত-দিনের সযত্নে গড়া ঐতিহ্যের ধ্বংস সুনিশ্চিত।

প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি মুখের ভাষাকে নির্বিচারে কলমের ভাষা করে তুলব? কিংবা, কলমের ভাষার দ্বারা মুখের ভাষার আংশিক নিয়ন্ত্রণের নীতি স্বীকার করব? আমার তো মনে হয়, আমরা যদি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আদর্শে (এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কথাই বিশেষভাবে মনে পড়ছে) আমাদেব মৌখিক সংলাপের ভাষাকে কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করতাম, তা হলে অনেক রূঢ়তা ও অসৌন্দর্যের পীড়ন থেকেই বোধ হয় আমাদের সুকুমার অনুভূতিকে রক্ষা করতে পারতাম। সাহিত্য জীবনের দর্পণ-স্বরূপ—এ রকম বলা হয়ে থাকে। উক্তিটি একতরফা। কেন না, সাহিত্যই যে শুধু জীবনকে অনুসরণ করে তা নয়, জীবনের পক্ষেও সাহিত্যকে অনুসরণ করবার অবকাশ আছে, থাকা উচিত। পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ছন্দে সাহিত্য জীবনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, জীবন সাহিত্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সাহিত্য জীবন থেকে দু হাতে উপাদান আহরণ করে, জীবন সাহিত্য থেকে সৌন্দর্য ও সত্যের অনুপ্রেরণা লাভ করে আপনাকে উন্নীত করে।

তা যদি হয়, তবে কেন 'রকে'র ভাষা, বস্তির ভাষা, খিস্তির ভাষাকে সাহিত্যে পাংক্তেয় করা হবে? এগুলির উপর সংখ্যা-গরিষ্ঠতার তকমা আঁটা আছে বলেই কি? জীবনকে যথাযথভাবে, অবিকৃতভাবে সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে—এই যুক্তিই কি এই ক্ষেত্রে একমাত্র যুক্তি? যুক্তিটি ধোপে টিকবে বলে মনে হয় না। সত্য বটে বস্তিবাসী জনসাধারণ আমাদের সমাজের সমগ্র জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ, দেশের অনক্ষর নিপীড়িত মানুষ প্রায় সকলেই কোন না কোন আকারের বস্তিবাসকে তাদের বিধিলিপি বলে মেনে নিয়েছে। তাদের ভাগ্যের উন্নয়ন আমরা সর্বতোভাবে কামনা করি, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয়ে তথাকথিত ভদ্র মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের সঙ্গে তাদের মানসিক প্রভেদ

সম্পূর্ণ ঘুচে যাক—এ আমাদের একান্ত অন্তরের কথা। তাদের মুখে খিস্তি-খেউড়ের ভাষা আমরা শুনতে চাই না, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বৈদগ্ধ্যের প্রসাদে তাদের ভাষা একদিন শালীন ও সুন্দর হয়ে উঠবে—এইটেই আন্তরিকভাবে সকলের কাম্য। কিন্তু যতদিন না এই বাঞ্ছিত লক্ষ্য বাস্তবায়িত হচ্ছে ততদিন তাদের মুখের ভাষার সঙ্গে কলমের ভাষার পার্থক্য বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। সাহিত্যে মাথাগুনতির জোর অপেক্ষা মাথার জোর বড়, এই মাথার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। লেখকের সহজাত সৌন্দর্যবোধ ও রুচিকে কোনমতেই সংখ্যা-গরিষ্ঠতার পায়ে বিকিয়ে দেওয়া চলবে না। ফুটবল-খেলার মাঠের ভাষা ফুটবল-খেলার মাঠেই থাকুক, রোয়াকের ভাষা রোয়াকেই থাকুক, ব্যারাকের ভাষা ব্যারাকেই থাকুক, স্বাভাবিকতার অজুহাতে তাদের সাহিত্যে পাংক্তেয় করবার যুক্তি বাংলা-সাহিত্যের বহুকষ্টে-গড়ে-তোলা শালীন আবহাওয়াকে কলুষিত করে তোলবারই অপপরামর্শ মাত্র। আমরা বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য সাহিত্যিকদের কল্যাণে হুতোমী যুগ ছাড়িয়ে এসেছি, naturalism-এর ভ্রান্ত আদর্শের বশবর্তী হয়ে সে যুগে আর ফিরে যেতে চাই না। বাঙালীর একান্ত ভাগ্য, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্যের অন্যান্য দিক্‌পালগণ তাকে বর্তমান স্তরে সমুত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। আজ বঙ্কিম-রবীন্দ্র ঐতিহ্য অস্বীকার করে আমরা যদি পুনর্বায় হুতোমী ঐতিহ্য গ্রহণে আগ্রহ প্রদর্শন করি, তাতে শুধু আমাদের বিচারবুদ্ধির ভ্রান্তিরই প্রমাণ হবে, আর কিছুর প্রমাণ হবে না। সাহিত্যে বৈচিত্র্যের আস্বাদনের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে হয়তো 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র ভাষার শরণ নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাকে যদি আদর্শ এক ভাষারীতি হিসাবে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়, সর্বসাধ্য উপায়ে তাতে বাধা দেওয়া উচিত বলে মনে করি।

আসলে বস্তি বলুন, ব্যারাক বলুন,—এগুলি অসম সমাজব্যবস্থার অন্যায় শোষণের ফল মাত্র। পুঁজিবাদী সমাজের এগুলি বিকার। বিকৃতির শোধন সর্বাংশে কাম্য, তা বলে বিকৃতির আবহাওয়ায় পুষ্ট অসুন্দর ভাষারীতির সমর্থন কোনক্রমেই করা চলে না— এমন কি, স্বাভাবিকতার খাতিরেও নয়। "কাব্যের এবং দর্শনের ভাষার সঙ্গে খিস্তির ভাষার ব্যবধান বড়জোর একচুল"—এ কোন্ দেশের খিস্তির ভাষা জানতে একান্ত সাধ হয়। মনে হচ্ছে কাব্য ও দর্শন সম্পর্কে আমাদের নতুন করে পাঠ নেওয়া দরকার, অন্যথায় এই-জাতীয় সমীকরণ ধাতস্থ হবার নয়। বর্তমান প্রচলিত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন না করে যাঁরা সমাজব্যবস্থার অনুচিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে সাহিত্যে বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে যুক্তি দেন, তাঁরা অজ্ঞাতসারে প্রতিক্রিয়াশীলতারই পোষকতা করেন মাত্র।

সাহিত্য ও সমাজচেতনা

(সাহিত্যেব সহিত সমাজচেতনার যোগ অতি নিগূঢ়। সাহিত্য সমাজমনের দর্পণ, সেই কারণে সাহিত্যের উপর সমাজভাবনার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী ও বাঞ্ছনীয়।) সাহিত্যের বাজারে 'বিশুদ্ধ সাহিত্য' বলে যে একটি কথার প্রচলন আছে তার বাস্তব ভিত্তি কিছু আছে কিনা সন্দেহ। কেন না, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কোনও কালে সমাজ-নিরপেক্ষ ছিল না, আজও নেই, আর ভবিষ্যতেও যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না সে কথা বলাই বাহুল্য। মহাকবি বাল্মীকি বা কবি কালিদাসের কাব্য-নাট্যাদি আপাতবিচারে নিছক সৌন্দর্যায়ণ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাদের তলায় তলায় গভীর সমাজভাবনার স্রোত প্রচ্ছন্ন ধারায় প্রবাহিত। প্রাচীন কবিদের এই বৈশিষ্ট্য স্থূলদৃষ্টি পাঠকের চোখে ধরা না পড়তে পারে, কিন্তু যাঁদেরই রচনাব বাহ্য অক্ষরসজ্জা ভেদ করে গভীরে দৃষ্টিসঞ্চালনের ক্ষমতা আছে তাঁরাই এ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাবেন। অমর মহাকাব্য মহাভারতের কথা এখানে উল্লেখ করব না, কেন না, মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী, কল্পনা ও চিন্তার মধ্যে যে তৎকালীন সমাজভাবনা ওতপ্রোত হয়ে আছে— এ কথা সাহিত্যেব প্রাথমিক ছাত্রও জানেন। মহাভারত প্রাচীন ভারতের একটি বিশেষ যুগের প্রবহমান সমাজচৈতন্যের বহিরভিব্যক্তি —এটি একাধারে কাব্য, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র। মহাভারতকে যদি মহাকাব্যের উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে গণ্য করা যায়, সাহিত্যে সমাজচৈতন্যের অবতারণার সার্থকতা সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

মধ্য এবং আধুনিক যুগের সাহিত্য থেকেও সমাজচেতনাসম্পৃক্ত সাহিত্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যায়। কবিকুলচূড়ামণি দান্তের

'ডিভিনা কমেডিয়া' মূলতঃ প্রেমকাব্য, কিন্তু এ কাব্যের অন্তরালে আছে সুস্পষ্ট সমাজচৈতন্যের দ্যোতনা। দান্তে তাঁর দেশের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের পুরোধায় ছিলেন, শুধু তা-ই নয়, অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য তাঁকে স্বদেশ থেকে নির্বাসন বরণ করে নিতে হয়েছিল। এ হেন কবির কাব্য বিশুদ্ধ সাহিত্যে স্থিতমতি হলেও শেষ পর্যন্ত তা সমাজভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে বাধ্য, বস্তুতঃ দান্তের বেলায় তা-ই হয়েছিল। শেক্‌স্‌পীয়রের সাহিত্যের উপর এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের সমাজ-চিন্তার ছাপ অতি স্পষ্ট। ইংরেজ জাতির বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যবাদী প্রসারের মুখে শেক্‌স্‌পীয়বের উদ্ভব। তৎকালীন ইংলণ্ডের ভাবের পরিমণ্ডল অমিত আশাবাদে পূর্ণ। এই আশাবাদ আর উৎসাহ স্বতঃই শেক্‌স্‌পীরীয় সাহিত্যের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ বিষয়ে অধিক কিছু বলবার অবকাশ এখানে নেই; তবে অনুসন্ধিৎসু পাঠকেব পক্ষে বিষয়টি চমৎকারিত্বপূর্ণ ও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। একটা যুগের ভাবধারা, ধ্যানধারণা, আদর্শ কি ভাবে সেই যুগাশ্রিত সাহিত্যকে প্রভাবিত করে, উনিশশতকীয় ইংরেজ সমালোচক সার্ ওয়াল্টার র‍্যালে এলিজাবেথীয় সাহিত্যের উপর তৎকালীন নাবিক-পর্যটকদের প্রভাব-বর্ণন প্রসঙ্গে সে কথা অতি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েছেন। কৌতূহলী পাঠককে তাঁর সেই প্রতীতিমূলক নিবন্ধটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

অন্যপক্ষে, কবিগুরু গ্যেটে সংগ্রামবিক্ষুব্ধ সমাজভাবনার তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে শেষ অবধি চিত্তস্থৈর্য ও শান্তির উপকূল-রেখার সন্ধান পেয়েছিলেন। আর্টকেই তিনি জীবনের চূড়ান্ত আশ্রয় জ্ঞান করেছিলেন। রোমান্টিক আন্দোলনের শীর্ষাধিপতি হিসাবে গ্যেটের সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ; তখনও ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়নি, কিন্তু ওই অশান্ত ঝটিকার পূর্বাভাস ইউরোপের সর্বত্র

পরিস্ফুট। সাহিত্যের মাধ্যমে এই অশান্ততারই নায়কত্ব করেছিলেন গোটে তাঁর প্রথম জীবনের রচনায়। কিন্তু গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গ্যেটে এ-জাতীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আলোড়নের সার্থকতায় সন্দিহান হয়ে পড়েন এবং ক্রমশঃ তাঁর মন রোমান্টিসিজমের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে প্রত্যাহৃত হয়ে ক্লাসিকাল আদর্শের অন্তর্নিহিত সংযম, স্থিতি ও স্থৈর্যের সংস্কারটিকেই গভীরতর নিষ্ঠায় আঁকড়ে ধরবার জন্য উন্মুখ হয়েছিল। বিদ্রোহী ভাবুকসুলভ বল্গাহীন আবেগাকুলতা থেকে ঋষিসুলভ আত্মসমাহিত প্রশান্তির স্তরে উত্তরণ গ্যেটের জীবনে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আত্মজিজ্ঞাসা, সমাজবীক্ষণের মধ্য দিয়ে সংসাধিত হয়। এ জন্যে তাঁকে যে মানসিক যন্ত্রণা সইতে হয়েছিল শিল্পীর ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ইতিহাসে তার বুঝি তুলনা নেই। গ্যেটের জীবনে এই যে গভীর বিক্ষোভ ও প্রক্ষোভ, যার দরুন তিনি এক শিল্পাদর্শ থেকে আর এক শিল্পাদর্শে উত্তীর্ণ ও আশ্রয়প্রাপ্ত হয়েছিলেন—এ শুধু সম্ভব হয়েছিল গ্যেটের তীব্র সমাজচেতনার জন্য। তাৎকালিক সমাজজীবনের গতি ও প্রকৃতি গোটে নিবিড় অভিনিবেশের সহিত লক্ষ্য করেছিলেন বলেই তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে বিষয়বস্তুর মহিমার সঙ্গে সঙ্গে মননের এমন প্রগাঢ়তা, অনুভূতির এমন প্রাবল্য পরিদৃষ্ট হয়।

দূরের দৃষ্টান্তে কি প্রয়োজন, হাতের কাছে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। ওই নজীরের সাহায্যেও একই প্রতিপাদ্যে উপনীত হতে পারা যায়। কবি বাংলা দেশের প্রবহমাণ সমাজভাবনার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন-আলোড়নের ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে রবীন্দ্রমানসও অনুরূপ ঢঙে বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যজীবনের মধ্যবর্তী স্তরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ পুরাপুরি স্বদেশী

মন্ত্রে দীক্ষিত রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু দেখা গেল, জাতীয়তাবাদী সংস্কার রবীন্দ্র-কল্পনাকে স্বীয় গণ্ডীর ভিতর বেশীদিন ধরে রাখতে পারল না, কবির উদার বিশাল ভাবনা জাতীয়তাবাদের সঙ্কীর্ণ বন্ধন অতিক্রম করে আন্তর্জাতিকতায় মুক্তি পেল। শুধু তাই নয়, সনাতন ভারতের ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রতি গভীর অনুরাগ দিয়ে যে কবি-জীবনের শুরু, সেই কবিজীবন সমসাময়িক কালের প্রবহমাণ সমাজভাবনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলতে দুলতে সমাজতন্ত্রবাদে এসে নির্ভরযোগ্য মানসিক আশ্রয় পেল। কবির মন ছিল অতিশয় সচল, কোথাও তাঁর ভাবনা স্থির হয়ে থাকেনি, ক্রমাগত নিজেকে রূপান্তরিত করতে করতে জীবনের শেষ ধাপে এসে তিনি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর জীবনভঙ্গির গুরুতর মৌলিক ভেদ সাধিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের মানসিকতা আর শেষ বয়সের মানসিকতায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য। প্রথম বয়সে কবি রক্ষণশীল, শেষ বয়সে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত। কবির মানসিকতায় এই-যে বৈপ্লবিক পবিবর্তন, এ পরিবর্তন গ্যেটের মানসিক জীবনের রূপান্তর অপেক্ষা কোন অংশে কম দূরপ্রসারী নয়। গ্যেটে রোমান্টিক আদর্শ থেকে ক্লাসিকাল আদর্শে সমুত্তীর্ণ হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সংস্কারবদ্ধতা থেকে সংস্কারমুক্তিতে সমাসীন হয়েছিলেন। খতিয়ে দেখতে গেলে এই দুই মহাকবির মানসিক রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে বিপরীতমুখী প্রক্রিয়া বলতে হয়, তবে দুইয়ের বেলাতেই যে পরিবর্তনের মূলে গভীর সমাজচেতনার পোষকতা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। কবিরা স্বভাবতঃ কল্পনাবিলাসী বটে; কিন্তু অব্যাহতিবাদের গজদন্ত-মিনারে আত্মগোপন করে কল্পনায় শান দিলে সে কল্পনায় ধার ওঠে না—এ একটি পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা। সমসাময়িক সামাজিক-রাষ্ট্রিক আলোড়ন-বিলোড়নের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থেকে অনেক জিজ্ঞাসা অনেক সংশয় অনেক বেদনার লবণাক্ত

সমুদ্র সাঁতরে পার হলে তবেই শুধু কবিকল্পনা যথার্থ শিল্পরসোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পারে। বৃহত্তর জীবনের অভিজ্ঞতার রঙে যে কল্পনা ছোপানো নয়, সে কল্পনা শিকড়বিহীন সুতরাং অসাড়। কল্পনার রঙ পাকা করতে হলে জীবনের গভীরে ডুব দিতেই হবে।

(আমাদের সুনিশ্চিত অভিমত এই, আজকের দিনের প্রতিটি শিল্পী সাহিত্যিক ভাবুকের পক্ষে গভীরভাবে সমাজ-সচেতন হওয়া দরকার। নইলে একালের পরিপ্রেক্ষিতে বাস করে শিল্পচর্চার অধিকার কারও জন্মায় না। বর্তমান যুগ দ্বিধা সংশয় জিজ্ঞাসা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব-সমাচ্ছন্ন যুগ, বহু বিচিত্র পরস্পরবিরোধী ভাবাদর্শের সংঘাতে আধুনিক মানুষের মন আলোড়িত। এই আলোড়ন-বিলোড়ন দ্বারা যে মন স্পন্দিত হয় না, সে মন শিল্প-চর্চার ক্ষেত্রে অন্ততঃ প্রবেশাধিকার লাভের অনুপযুক্ত। এ কালে বাস করব অথচ এ কালের দাবি মানব না—শিল্প-সাহিত্যের অনুশীলনে নিযুক্ত থেকে অন্ততঃ এ প্রকার জেদ শোভা পায় না। শিল্পী সাহিত্যিক ভাবুক শ্রেণীর মানুষের পক্ষে সমাজচেতনার দ্বারা লালিত হওয়ার আবশ্যকতা বরাবর ছিল, বর্তমানে সে প্রয়োজন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।) যুগ-প্রভাবের জন্যই এ রকম হয়েছে। তাই যদি হয়, তবে কোন্ যুক্তিতে আমরা বৃহত্তর রাষ্ট্রিক-সামাজিক উপপ্লবময় পরিস্থিতি সম্পর্কে অচেতন থাকব, এবং সেই অচৈতন্যের অহঙ্কারকে প্রকাশ করব 'বিশুদ্ধ সাহিত্য'রূপ অবাস্তব এক বস্তুর ততোধিক অবাস্তব জয়ঘোষণার দ্বারা? সাহিত্য কি শুধুই (কাব্যে) আত্মকেন্দ্রিক প্রেমের বিঘোষণ, (কথা-সাহিত্যে) পদীপিসি আর নকুড়মামার তুচ্ছাতিতুচ্ছ দিনগত পাপক্ষয়ের কাহিনী, (নাটকে) তরুণ-তরুণীর দেখা-মাত্র-প্রেম-উপজিল গোছের ঘটনার নাট্যরূপায়ণ, (প্রবন্ধে) সমাজভাবনা-নিরপেক্ষ আত্মজিজ্ঞাসাহীন তথাকথিত রম্যরচনা বা সাহিত্য-

সন্দর্ভ সংরচন, এবং (সমালোচনায়) রাজনীতি ও সমাজনীতি-অচেতন প্রগতিবিমুখ নিছক সাহিত্য-সমালোচনা? এ রকম খণ্ডিত ধারণা বাংলা-সাহিত্যে বারে বারেই প্রশ্রয় পেয়েছে বলে বাংলা-সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের নিরলস সেবা সত্ত্বেও আজও পর্যন্ত মূলতঃ কূপমণ্ডুক রয়ে গেছে, দেশের ও মহাদেশগুলির বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে আজও অবধি তার জীবন্ত যোগ সাধিত হতে পারল না।

(বাংলা কথা-সাহিত্যের বিস্তৃত পরিসরের ভিতর এক ধরনের রচনা আছে, যা পড়লেই অন্তরাত্মা বৃহতের সঙ্গে মহতের সঙ্গে যোগ হারিয়ে ক্ষুদ্র সংস্পর্শ-প্রভাবাৎ সংকুচিত হয়ে ওঠে। বৃহত্তর জীবনের ছন্দের উত্থানপতনের সঙ্গে যে মন ওঠানামা করে তেমন মনের অধিকারী নায়ক চরিত্রের (যেমন গোরা) জীবনে ভালবাসার মাহাত্ম্য বুঝি, কিন্তু যে নায়ক বহির্বিশ্বের যোগস্পর্শহীন পরগাছা-সমাজের একজন প্রতিনিধি মাত্র, কিংবা বৈচিত্র্যহীন নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান, তার প্রেম কত আর মহত্ত্বমণ্ডিত হতে পারে? আধুনিক কথা-সাহিত্য পারিবারিক বা ব্যক্তি-জীবনের নিখুঁত বাস্তবনিষ্ঠ প্রতিরূপ হওয়াই যথেষ্ট নয়, তার মধ্যে বৃহৎ জীবনের বেগ সঞ্চালিত হওয়া দরকার। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক স্তরে চিন্তার যে সকল স্রোত ও প্রতিস্রোত গণমনকে আলোড়িত করে বহমান, তার অন্ততঃ একটা স্পষ্ট আভাস রচনায় উদ্ভাসিত হওয়া দরকার। তা নয়তো স্বীকৃত লিপিকুশলতা সত্ত্বেও সাহিত্যরচনা তুচ্ছতার পাকে জড়িয়ে পড়ে এবং তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।)

আজকাল একটা কথা উঠেছে, সাহিত্য রাজনীতির রাহুর দ্বারা গ্রস্ত হবার উপক্রম হয়েছে, সাহিত্যকে রাজনীতির কলুষস্পর্শ থেকে বাঁচানো দরকার। এ-জাতীয় ভীতিগ্রস্ত রব তাঁরাই উত্থাপন করেন যাঁদের মনের উপর বৃহত্তর সমাজজীবনের আলোড়ন-

বিলোড়নের ছন্দ দাগ কাটে না, এবং যাঁরা স্বীয় মনোমত ব্যাখ্যা অনুযায়ী সাহিত্যকে একটি বিশেষ কলাকুশল শ্রেণীর ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ বিহারক্ষেত্র বলে মনে করেন। এঁদের চোখে দৃশ্যতঃ সাহিত্য হল ক্রমাগত অভ্যাসের দ্বারা লিখনক্ষমতা পরিমার্জন ও শাণিতকরণের একটি সংরক্ষিত এলাকা, এই এলাকায় সমাজভাবনা তথা রাজনীতিমনস্কতার অনুপ্রবেশ যত কম ঘটে তত সাহিত্যের শুচিতারক্ষার পথ প্রশস্ততর হয়। এটিও এক ধরনের অসার আত্মবিলাস। তৈলতণ্ডুলবস্ত্রেন্ধনচিন্তালাঞ্ছিত দৈনন্দিন রাজনীতি তুচ্ছ প্রাত্যহিকতার আবেশ দ্বারা শিল্পী-মানসকে নিম্নগামী করে সে কথা মানব, কিন্তু রাজনীতির একটি উদারতর দিকও আছে। সেই দিক দিয়ে রাজনীতি আধ্যাত্মিক অভীপ্সাযুক্ত এবং মহত্তর সমাজকল্যাণ-ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত। গূঢ় অর্থে রাজনীতি শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদেরই একটি অংশ মাত্র।

রাজনীতির এই তাৎপর্য সম্পর্কে শিল্পী-সাহিত্যিকদের অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। রাজনীতির যেটি হাতে-কলমে পরীক্ষণের দিক, সেই প্র্যাকটিকাল সমাজসেবামূলক তৎপরতায় সাহিত্যিকের উদ্যম ক্ষয়িত না হওয়াই বাঞ্ছনীয় (অবশ্য যাঁর সেদিকে সহজ প্রবণতা আছে তাঁকে বাধা দেবারও কোন যুক্তি দেখি না), তবে রাজনীতির জাতীয়, আন্তর্জাতিক, সামাজিক তাৎপর্য সম্পর্কে অনবহিত থাকা একালীন আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস-গ্রহণকারী শিল্পী সাহিত্যিকের কোন মতেই শোভা পায় না। শিল্পী যে পরিমাণে নিজেকে বৃহত্তর জীবনের স্রোতোধারা থেকে বিযুক্ত রাখবে, সে পরিমাণে তার কল্পনা ও মনন দরিদ্রতর হবে। তৎসৃষ্ট শিল্পকর্মও তদনুপাতে শূন্যগর্ভ থেকে যাবে। রাজনীতিক ভাবনাকে বাদ দিয়ে যেমন জীবনে চলা যায় না, তেমনি সাহিত্যেও চলা সম্ভব নয়।

রাজনৈতিক তৎপরতায় শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিকর্মীর প্রত্যক্ষ

অংশ গ্রহণের কতকগুলি বাস্তব অসুবিধা আছে। এতে লেখক-মন বিক্ষিপ্ত হয়, বাধাগ্রস্ত হয়। শিল্পীর একনিবিষ্ট চিন্তন-মনন-অনুধ্যানের জন্য যে শান্ত অনাহত পরিবেশ দরকার, দৈনন্দিন রাজনীতির সঙ্গে কাঁধ-ঘেঁষাঘেঁষির ফলে তা প্রায়শঃ অনায়ত্ত থেকে যায়। চিন্তা-কল্পনাকে সংহত করবার জন্যেই শিল্পীর পক্ষে দৈনন্দিন রাজনীতি থেকে কিয়ৎ পরিমাণে দূরে থাকা দরকার। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, প্রবহমাণ রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি অনুধাবনের ক্লেশ স্বীকার না করে শিল্পী স্বয়ংরচিত আত্মকেন্দ্রিক বিবরের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকবেন। আমাদের কথা হল—শিল্পী, তুমি রাজনৈতিক মিছিলের ভিড়ের মধ্যে মিশে যেয়ো না, কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়িয়ে মিছিলের প্রকৃতি, গতিবেগ, চলার ছন্দ পর্যবেক্ষণ কর। তোমার হাতে ঝাণ্ডা বিলম্বিত না থাকলেও ক্ষতি নেই, কাঁধে হাতিয়ার উদ্যত না হয় নাই রইল; তোমার লেখনীই তোমার হাতিযার, আর সেই হাতিয়াবেরই অন্যনিরপেক্ষ ব্যবহার তোমার কাছে আমরা প্রত্যাশা করব। কিন্তু সে লেখনী যেন মসীজীবী কেরানীর হস্তধৃত কলম না হয়, সুন্দর অথচ বোধবুদ্ধিহীন হাতের লেখাতেই যেন তাব সমস্ত কৃতিত্ব নিঃশেষিত না হয়ে যায়।

কিন্তু আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিক-ভাবুকের দল কয়জনা এ কথা স্মরণ রাখেন? বাক্যটি কিঞ্চিৎ রূঢ় হলেও যোগ না করে পারছি না যে, এখনও পর্যন্ত আমাদের অধিকাংশ শিল্পীর চেতনা ক্ষীণবল মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন, ব্যক্তি ও পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে তাঁদের কল্পনা প্রসারিত হতে দেখা যায় না।

আমাদের কম্যুনিস্ট শিল্পী-বন্ধুদের রচনারীতি সম্পর্কে দুই-একটি কথা এই স্থলে বলা আবশ্যক। কম্যুনিস্ট শিল্পীদের রচনাদর্শের প্রায়ই যে আমরা সমালোচনা করি সে এজন্যে নয় যে, তাঁরা

রাজনীতিসচেতন; সে এজন্যে যে, তাঁদের রচনায় শিল্পের স্বকীয় সৌন্দর্যোৎকর্ষের দাবি প্রায়শঃ অপরিপূরিত থাকে। শিল্পের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে, রাজনৈতিক প্রয়োজনসিদ্ধিব উগ্র তাড়ানায় তাকে বিস্মৃত হওয়ার যুক্তি নেই। ভারতীয় কম্যুনিস্টদের রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে আমাদের বিভেদ আছে। কিন্তু কথাটায় পাছে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় সেজন্যে বলি, রাজনৈতিক মতাদর্শের ভালমন্দের ক্ষেত্রেই এ বিভিন্নতা সীমাবদ্ধ, খোদ রাজনীতি বস্তুটির সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ নেই। ববং এই বললেই আমাদের মনোভাব পরিষ্কার করে বলা হবে যে, রাজনৈতিক সচেতনতাকে আমরা মনের সচলতার প্রমাণ বলে মনে করি এবং সে-কারণ কতিপয় শর্তসাপেক্ষে প্রগতিমুখী গতি জ্ঞান করি। দেশের নির্যাতিত শোষিত অবমানিত শ্রেণীর মানুষের সুখ-দুঃখ বেদনা-ব্যথা আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ সাহিত্যের মাধ্যমে যত বেশী নিষ্পন্ন হবে, তত সাহিত্যের বিষয়বস্তুর পরিধির সম্প্রসারণ ঘটবে এবং তত সাহিত্যের কল্যাণ। শুধু দেখা দরকার, এই রূপায়ণ যেন শিল্পের স্বধর্মনির্দেশিত সৌন্দর্যোৎকর্ষের মানদণ্ড-উত্তীর্ণ হয়। শিল্পরসোত্তীর্ণ না হলে কিছুই কিছু নয়।

এইখানে একটি আপাত-অদ্ভুত কথার অবতারণা করব, কিন্তু কথাটির যৌক্তিকতায় আমি মনে প্রাণে বিশ্বাসী। সেটি এই যে, শিল্পীর ভিতর প্রগতিশীলতা ও ঐতিহ্যনিষ্ঠ সংরক্ষণশীলতার পাশাপাশি অস্তিত্ব সম্ভব, এবং একমাত্র এই সহ-অস্তিত্বের ভিত্তিতেই বোধ হয় শিল্পীর শিল্পকর্ম যথার্থ সার্থকতামণ্ডিত হয়ে ওঠার শক্তি রাখে। মন্তব্যটির আরও ব্যাখ্যা দরকার। সমাজ-ভাবনার ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক মতবাদের দিক দিয়ে আমরা প্রগতিশীল আদর্শের সমর্থক, কিন্তু আদর্শের সুষ্ঠু শিল্পসম্মত রূপদানের প্রশ্নে আমবা ঐতিহ্যচর্চার পক্ষপাতী। শিল্পের সার্থক প্রকাশক্ষমতা সশ্রদ্ধ ঐতিহ্যচেতনা ব্যতিরেকে অধিগম্য হবার নয়।

প্রগতিশীল ভাবাদর্শ অন্তরে পোষণ ও লালন করাটাই শিল্পীর পক্ষে যথেষ্ট নয়. তাকে উপযুক্ত শিল্পরূপদানের কলা-কৌশলটিও আয়ত্তের মধ্যে থাকা চাই। পূর্বসূরীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা ভাবপ্রকাশের উপযোগী যে ভাষাভঙ্গি ও শিল্পবোধ আয়ত্ত করেছি তাকে বিধিমতে অনুশীলন না করলে অতি বড় বিপ্লবাত্মক প্রগতিশীলতাও দুর্বল প্রকাশরীতির চড়ায় ঠেকে বানচাল হয়ে যেতে বাধ্য। হয়েও থাকে।

এইখানেই কম্যুনিস্ট শিল্পী-বন্ধুদের যত গেরো। তাঁরা ঐতিহ্যচর্চা না করেই রাজনীতি নিয়ে দাপাদাপি শুরু করেন। পুনরায় বলি, তাঁদের রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে আমার প্রত্যয়গত বিভিন্নতা আছে, কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক চেতনারূপ মানসিক বৈশিষ্ট্যটিকে আমি দোষাবহ মনে করি না। বরং হেঁজি-পেঁজি মধ্যবিত্ত লেখকদের সমাজভাবনা-নিরপেক্ষ পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় তাঁদের এই বৈশিষ্ট্যটিকে আমরা আশার লক্ষণ বলে মনে করি। মেয়েরা যেমন শাড়ি-গয়না পেলেই খুশি, আর কিছুতে তাঁদের মন ওঠে না, তেমনই আমাদের সাহিত্যে কিছু সংখ্যক প্রবীণ ও নবীনবয়সী লেখক আছেন যাঁরা বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্ত্রীজাতির এই তুচ্ছ বস্তু-প্রীতির অনুরূপ মানসিকতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। আটপৌরে পরিবার-জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার চিত্রণে শক্তিক্ষয় করা ছাড়া তাঁরা তাঁদের সাহিত্যিক উদ্যম নিঃশেষিত করার আর কোন পথ খুঁজে পান না। হতে পারে তাঁদের রচনা ভাষায় ও প্রকাশভঙ্গিতে শিল্পরসান্বিত, কিন্তু নারীগাত্রশোভিত গহনার মতই তা উজ্জ্বল, অথচ প্রকৃত বিচারে মূল্যহীন। সহুমাসির ছেলের অন্নপ্রাশনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা কিংবা সেজঠাকুরপোর বিয়েয় পাঠানো তত্ত্বের দীর্ঘ ফিরিস্তি দাখিল বাংলা গল্প-উপন্যাসে ঢের হয়েছে, আধুনিক বাঙালী পাঠক এ-জাতীয় অকিঞ্চিৎকরত্বের অত্যাচার থেকে মুক্তিলাভ করে বাঁচতে চায়।

সেই দিক দিয়ে কম্যুনিস্ট লেখকদের সংস্কারমুক্তির প্রয়াস অভিনন্দনের যোগ্য। কিন্তু প্রথমেই বলে নিয়েছি, একটা বড় রকমের মূল্যের বিনিময়ে তাঁরা এই প্রগতিশীলতার বোধ অর্জন করেন। তাঁদের ঐতিহ্য-চেতনা দুর্বল। তাঁদের শিল্পবোধ খণ্ডিত। তাঁরা আদর্শের ক্ষেত্রে পরনির্ভর। তাঁরা জাতির পরম্পরাগত ও সাহিত্যের পুরাতন সংস্কারটিকে ভাল করে আত্মস্থ না করেই প্রগতিশীলতার ধ্বজা বহনের আকুলতা প্রকাশ করেন। পূর্বোল্লিখিত লেখকদের যেখানে শক্তি, সেখানে এঁদের অপূর্ণতা। প্রথমোক্তদের শিল্পবুদ্ধি পাকা, দ্বিতীয় দলের শিল্পবোধ পল্‌কা। অন্য পক্ষে প্রথম দল ভাবজীবনের ক্ষেত্রে কূপমণ্ডুক, গৃহবদ্ধ, নিতান্ত মধ্যবিত্ত; দ্বিতীয় দল তুলনায় অনেক বেশী সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির গৌরব দাবি করতে পারেন। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, এ দুই দৃষ্টিকোণের কোনটিতেই সম্পূর্ণতা নেই, আংশিক বিচ্যুতির দোষে দুই-ই সমান দুষ্ট। উভয় দৃষ্টিভঙ্গির সার্থক সমন্বয়ের মধ্যেই একমাত্র শিল্পকর্মের প্রকৃত উৎকর্ষ নিহিত। প্রগতিশীল সমাজ-ভাবনার সঙ্গে ঐতিহ্যচেতনাকে যুক্ত করতে পারলে শিল্পসৃষ্টির আর মার নেই।

প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজভাবনা দুর্বল ছিল, সেটা তাঁর সাহিত্যের এক মস্ত বড় অপূর্ণতা। তিনি সহজাত কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন এবং সে কবিত্বশক্তি ছিল অতি উচ্চস্তরের। স্বর্গস্খলিত দেবশিশুর ন্যায় নিষ্পাপ নিষ্কলুষ শিল্পী-মনের প্রকাশ দ্বারা তিনি তাঁর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। সমাজের শতকরা নিরেনব্বুই জন মানুষের অনায়ত্ত এক ধরনের সরল মৌলিক সৌন্দর্যবোধ তাঁর মানসিক গঠনের ভিতর সহজাত ছিল এবং এই সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে যথার্থ মানবপ্রীতি যুক্ত হয়ে তাঁর রচনাকে রসিকসুজনদের উপভোগের বস্তুতে পরিণত করে তুলেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথা

বিস্মৃত হলে চলবে না, বিভূতিভূষণের শিল্পী-মানসের সঙ্গে একালীন ধ্যানধারণার যোগ ছিল না। তাঁর শিল্পদৃষ্টির ভিতর এক ধরনের পাপবোধশূন্য কিশোরসুলভ naivete ছিল, যা তাঁর সাহিত্য-জীবনে শিল্পকৃতিত্বের বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। কি এক দুর্নিরীক্ষ্য লীলায়, যা তাঁর শিল্পী-মানসের সব চাইতে বড় বিচ্যুতি, তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইংরেজীতে একটি ধরতাই কথা আছে, ignorance is bliss। এই মহাজনবাক্যের সত্যতা প্রমাণ করে বিভূতিভূষণ তাঁর সহজাত মানসিক অপূর্ণতাকে আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ বর্মে পরিণত করে তুলেছিলেন। অপরে যেখানে আধুনিক-যুগোচিত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয় জিজ্ঞাসার দ্বারা পীড়িত হয়ে শিল্পের ক্ষেত্রে কেবলই পথ হাতড়ে ফিবছে, সেখানে এই দেবকল্প শিল্পী কোন্ এক মায়ামন্ত্রবলে সমস্ত দ্বিধাগ্রস্ততা আর অনৈশ্চিত্য আর হতাশা দু হাতে দূরে সরিয়ে দিয়ে আত্মমগ্ন সৌন্দর্যায়ণের নেশায় বুঁদ হয়ে ছিলেন। বিভূতিভূষণ দুর্লভ কবিত্বশক্তির অধিকাবী। কিন্তু কাব্যের মানদণ্ডে কথা-সাহিত্যকে পরিমাপ করলে সংশ্লিষ্ট শিল্পেব মূল্যায়নে ভ্রান্তিকবলিত হবার সম্ভাবনা থাকে। আধুনিক উপন্যাস জীবনবেদস্বরূপ। তা সমাজভাবনার দ্বারা, যুগোচিত বৈশিষ্ট্যলক্ষণেব .চতনার দ্বারা মণ্ডিত হলে তবেই শুধু তার আধুনিক মহাভারত নামের সার্থকতা প্রতিপাদিত হয়। কিন্তু শেষোক্ত দিক দিয়ে বিভূতিভূষণ ঈশ্বরের পরম আশীর্বাদস্বরূপ আশ্চর্যরূপে নিশ্চেতন। সমাজভাবনা তথা রাজনৈতিক চিন্তাদর্শের সংঘাত বিভূতিভূষণের রচনায় বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারে নি, এ বিশ শতকের কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে এক অত্যাশ্চর্য সংঘটন। বিভূতিভূষণ যেন একালের পরিবেশে বাস করেও ঠিক একালের মানুষ ছিলেন না। কোন্ দূর দেশে দূর কালে যেন তাঁর শিল্পকল্পনা বিসর্পিত। এই দৈবশক্তিধর স্বভাবশিল্পীর সকল চিন্তাভাবনার স্রোত উচ্ছ্রিত

হয়েছে কোন্ এক সুদূরবর্তী অদৃশ্য কল্পলোকের উৎস থেকে। বিভূতিভূষণের রচনার যেটি সব চাইতে বড় বৈশিষ্ট্য, সেটি একই কালে তাঁর সব চাইতে বড় দুর্বলতাও বটে।

বরং সেই দিক দিয়ে অগ্রগণ্য জীবিত কথা-সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক বেশী সমাজসচেতন, অনেক বেশী পরিমাণে আধুনিক যুগের দাবি পূরণে সচেষ্ট। বাংলার সমাজের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত কতকগুলি অবহেলিত শ্রেণী—যথা হাড়ী, বাগদী, কাহাব, বাউরী, সাঁওতাল, বেদে, সাপুড়ে সম্প্রদায়ের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তিনি সাহিত্যে যুগোচিত মর্যাদা দান করেছেন। সাহিত্যেব গণতান্ত্রিক পংক্তিসজ্জায় এদের তিনি পাংক্তেয় করেছেন। তারাশঙ্করের শিল্পী-মানস সমাজসচেতন বলেই অভিজাত এবং মধ্যবিত্ত জীবনের গণ্ডী অতিক্রম করে তাঁর পক্ষে কল্পনাকে সমাজের নিম্নতম স্তরে সম্প্রসারিত করা সম্ভব হয়েছে। এই-যে তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতি দরদ ও সচেতন মনোভাব, এটি যুগেব প্রত্যাশার পরিপূরক।

সমাজচেতনার প্রসঙ্গে আব দু-একটি কথা বলে আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করব। প্রাচীনপন্থী কোন কোন সমালোচক কথা-সাহিত্যে ও কাব্যে বুদ্ধিবাদের সংস্কারকে আদৌ গুরুত্ব দিতে চান না। তাঁদের এই রক্ষণশীল মনোভাব সমর্থনের কাবণ দেখি না। বুদ্ধিবাদের সহিত সমাজচেতনার যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। বোধ হয় সেটি একটি হেতু, যার জন্যে পুরাতন ধারার সমালোচকগণ বুদ্ধিবাদকে কথঞ্চিৎ সন্দেহের চক্ষে দেখে থাকেন। কিন্তু বুদ্ধিবাদ বস্তুটি সুপ্রযুক্ত হলে তার বিরুদ্ধে আপত্তির যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। রচনায় বুদ্ধিবাদের আমেজ থাকা কিছু দোষের নয়, বরং আধুনিক পাঠকের পক্ষে তা সমধিক রুচিকর। খোদ বুদ্ধিবাদ বস্তুটি একটি গুণ, তার কম-বেশিতেই যা শিল্পকর্মের উৎকর্ষাপকর্ষের ধারণায় তারতম্য

হয়ে থাকে। রচনা শিল্পের নিজস্ব উৎকর্ষের দাবিপূরণে তৎপর হবে তাতে সন্দেহ কি, কিন্তু উপরন্তু হিসাবে তাতে যদি কিঞ্চিৎ বুদ্ধিবাদের মিশাল দেওয়া যায়, মননশীলতার দীপ্তির দ্বারা রচনাদেহকে প্রোজ্জ্বল করে তোলা যায়, তবে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয় বুঝি না। চটচটে আবেগের কাদা দিয়ে কাব্যোপন্যাসকে ক্লেদাক্ত করে তোলার চাইতে বুদ্ধিবাদের পালিশ কিয়ৎপরিমাণে থাকা ভাল। সেটি আরও বাঞ্ছনীয় এই কারণে যে, ওই বুদ্ধিবাদের হাত ধরেই সচরাচর সমাজভাবনামূলক শিল্প-পরিকল্পনা শিল্পীর চিন্তায় আত্মপ্রকাশ করে।

আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যের স্বরূপলক্ষণ

আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যের ধারা পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, শরৎচন্দ্রের পর থেকে কথা-সাহিত্য বাংলা ভাষায় উত্তরোত্তর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে অনেকানেক লেখক শুদ্ধমাত্র কথা-সাহিত্যের চর্চায় নিয়োজিত আছেন এবং ওই একনিবিষ্ট চর্চার দ্বারা খ্যাতি অর্জন করেছেন। কথা-সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলন এবং তৎপ্রতি পাঠকসাধারণের একটি বৃহৎ অংশের সাগ্রহ মনোযোগের ফলে কোন কোন মহলে এমন একটা ধারণা গড়ে উঠেছে যে, কথা-সাহিত্য আর সাহিত্য বুঝি সমার্থক; কথা-সাহিত্যের বাইরে বুঝি সাহিত্যের কোন অস্তিত্বই নেই। কিন্তু এই ধারণা যে ভ্রান্ত সে কথা বলাই বাহুল্য।

কথা-সাহিত্য সৃজনমূলক সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট আর গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলেও তা কখনও নিজের অনুকূলে সবটুকু মনোযোগ আকর্ষণের দাবী করতে পারে না, করলে নিজের প্রতি অনুপাত-অতিরিক্ত প্রাধান্য আরোপ করা হয় এবং সাহিত্যের অপরাপর শাখার প্রতি অবিচার করা হয়। অবিচারের একটি বড় দৃষ্টান্ত কাব্যের প্রতি অবহেলা। আধুনিক বাংলা কবিতা আঙ্গিক আর ছন্দবৈভবের দিক দিয়ে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেলেও তার পঠন পাঠন উপভোগ একান্তভাবেই নিছক কাব্যোৎসাহী নাগরিক পাঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে, সাধারণ পাঠকসাধারণের মধ্যে তা বিস্তৃত হতে পারেনি। আধুনিক বাংলা কবিতার আত্যন্তিক ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা আর দুর্বোধ্যতা কবিতার

প্রতি এই ঔদাসীন্যের অন্যতম প্রধান কারণ হলেও সেইটেই একমাত্র কারণ নয়। মনে হয় এই ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান প্রভাব-বিস্তারকারী কথা-সাহিত্যেরও কিঞ্চিৎ ভূমিকা আছে। কথা-সাহিত্যের আতিশয্যের তলায় কবিতার প্রতি অনুরাগ কিছু পরিমাণে চাপা পড়ে গেছে বললে বোধ হয় অসত্য বলা হয় না। তথাকথিত সৃজনধর্মী কথা-সাহিত্যের প্রতি অতিরিক্ত-মাত্রিক পক্ষপাত ন্যস্ত হওয়ার ফলে যে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি ব্যাহত হয়ে রয়েছে সে বিষয়ে সচেতন হবার সময় হয়েছে বলে মনে করি।

কথা-সাহিত্যের বেলায়ও দেখতে পাই, আমরা কথা-সাহিত্যে সেই ধারারই অনুসরণ করে চলেছি, যা আমাদের দুরারোগ্য মধ্যবিত্ত মানসিকতার কথা বারেবারেই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। এক ধরনের ভাবালুতাসর্বস্ব আদর্শবাদবিহীন মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তির গণ্ডী থেকে আমরা আজও নিষ্ক্রান্ত হতে পারলুম না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মাধ্যমে আমরা আকণ্ঠ রোমান্তিকতার (romanticisim) রস পান করেছি, শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের রোমান্তিকতার দ্বারাও আমরা এ-যুগের পাঠক পুষ্ট হয়েছি কম নয়। ফলে আমাদের মনোভঙ্গীর ভিতর রোমান্তিকতা শিকড় গেড়ে বসেছে। আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যে লেখকগণ যে ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলেছেন তা একান্তরূপেই রোমান্তিকতার ঐতিহ্য; বুদ্ধিবাদের সঙ্গে তার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতর প্রজ্ঞা, মনীষা আর আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত রসবুদ্ধির যে সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটেছিল, সেই সমন্বয়ের আদর্শ একালের লেখকদের চিত্ত অধিকার করতে পারে নি। লেখকদেরই যখন এই অবস্থা তখন পাঠকদের কথা আর নাই বা বলা হল। বুদ্ধিবাদ তথা মননশীলতার প্রতি অনীহার ফলে বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে বাংলা কথা-সাহিত্যে, এখন পর্যন্ত এক ধরনের তরল

মানসিকতারই আধিপত্য চলেছে, যা বাংলা সাহিত্যের উন্নতির পক্ষে সবিশেষ ক্ষতিকর হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়।

বাংলা কথা-সাহিত্যের এলাকায় বুদ্ধিবাদের একেবারেই কোনরূপ চর্চা হচ্ছে না এ কথা বলা অবশ্য ঠিক নয়। কেউ কেউ এই ধারাটিকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা অন্নদাশঙ্কর রায়, ৺ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, দীপক চৌধুরী প্রমুখ মননশীল লেখকদের নাম করতে পারি। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, রোমান্তিকতার ধারাবাহী, ভাবালুতার রসপরিবেশনকারী লেখকগণ পাঠকসম্প্রদায়ের উপর যে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছেন, প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এঁরা তার সিকিভাগ প্রভাবও পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করতে পারেন নি। উল্লিখিত লেখকগণ জ্ঞানে গুণে বিদগ্ধ হলেও, বাংলা দেশে বিদগ্ধ লেখকের কপালেই দগ্ধ ভাগ্যের লাঞ্ছনা ঘটে বেশী। কোন লেখক কথা-সাহিত্যের পরিধির ভিতর যদি মননশীলতার আবহাওয়া সঞ্চারে সচেষ্ট হন তা হলে অচিরেই আমরা আধুনিক বাঙ্গালী পাঠক হাঁসফাঁস করতে শুরু করি, আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হয়। কিন্তু কাহিনী সৃষ্টির নামে কেউ যদি জবজবে রসের থালা আমাদের সামনে এগিয়ে ধরে অমনি আমরা হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করি।

সহজ ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শকে গ্রহণ করি নি, আমরা শরৎচন্দ্রকেই আমাদের আত্মার আত্মীয় করে নিয়েছি। প্রমথ চৌধুরী এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের আওতার মধ্যে বাস করেও মূলতঃ যুক্তিবাদী আদর্শের প্রচারণায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি বুদ্ধিবাদকে একটি সক্রিয় জীবন্ত আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং যাতে বাংলার লেখক ও পাঠকসমাজে ওই আদর্শের প্রভাব বিস্তৃত হয় তদুদ্দেশ্যে 'সবুজ পত্র' মাসিক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি নূতন আন্দোলন

পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল, এ আন্দোলনের প্রতি আমাদের মনের সায় নেই, বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে আমাদের মন প্রদীপ্ত হলেও আমরা ভাবাবেগের জগতে বাস করতেই সমধিক ভালবাসি। যুক্তিবাদের প্রতি আমাদের চিত্তের স্বাভাবিক স্ফূর্তি নেই, বুদ্ধিকর্ষিত রচনায় আমাদের মন ভরে না। যদিও এই বঙ্গদেশেই নাকি এক সময়ে নব্যন্যায়ের চর্চা হয়েছিল, বাংলাদেশ জ্ঞানানুশীলনের জন্য বিখ্যাত ছিল। একেই বলে ইতিহাসের গতির পরিবর্তন। যে বাংলাদেশে একদা নৈয়ায়িকতার চূড়ান্ত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল সেই বাংলাদেশেরই মানুষ এখন নৈয়ায়িকতার তথা যুক্তিবাদের পথ ছেড়ে ভাবালুতার পঙ্কে গড়াগড়ি যাচ্ছে। আমাদের সাহিত্যের সকল বিভাগের উপরই এই পঙ্কতিলক লিপ্ত রয়েছে, তবে কথা-সাহিত্যেই যেন ওই কালিমার প্রলেপ বেশী।

শরৎচন্দ্রের পর বাংলা কথা-সাহিত্যের সৃজনী তৎপরতা দুটি খাত বেয়ে চলবার চেষ্টা করেছিল। এক—প্রমথ চৌধুরী প্রদর্শিত মননশীলতার লক্ষণ মণ্ডিত রসসাহিত্যের খাত; দুই—বাংলাদেশের জল-মাটি-মানুষের সহিত সম্পর্কযুক্ত জাতীয় সংস্কারের খাত। প্রথমোক্ত পথে অভিযানে বেরিয়েছিলেন ৺ধূর্জটিপ্রসাদ, অন্নদাশঙ্কর, সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রমুখ মুষ্টিমেয় লেখক সম্প্রদায়; দ্বিতীয় দলে ছিলেন তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, বনফুল, প্রেমেন্দ্র, মনোজ, অচিন্ত্য, প্রবোধ সান্ন্যাল, মানিক প্রমুখ শক্তিশালী লেখকবর্গ। দুই দলের তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়, প্রথম দলের লেখকগণ বাংলার সাধারণ পাঠকসমাজে তেমন কল্কে পান নি, তাঁদের সাহিত্যের আবেদন প্রধানতঃ নগরবাসী ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে বলা চলে। তার অর্থ, যে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, বুদ্ধিবাদের ধারা আধুনিক বাঙালী পাঠক মেনে

নেয় নি। আধুনিক বাঙ্গালী পাঠকের মনের ঝোঁক হৃদয়ধর্মী তথা ভাবাবেগপ্রধান সাহিত্যের উপর সুস্পষ্টরূপে ন্যস্ত।

অবশ্য এই মন্তব্য করার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বুদ্ধিবাদী সাহিত্যের প্রতি বাঙালী পাঠকের ঔদাসীন্য সবটুকু বুদ্ধিবাদের কারণে নাও হতে পারে, এর সঙ্গে সৃজনী ক্ষমতার তারতম্যের প্রশ্নও জড়িত থাকা অসম্ভব নয়। বুদ্ধিবাদ ভাল জিনিস সন্দেহ নেই, কিন্তু বুদ্ধিবাদী লেখক হলেই তো শুধু হল না, বুদ্ধিবাদের দীপ্তির সঙ্গে সৃজনী ক্ষমতাও সমপরিমাণে যুক্ত থাকা চাই। এই শেষোক্ত দিকে ঘাটতি থাকলে আর কোন উপায়েই সেই ঘাটতি পূরণ হওয়ার নয়। মনে হয় এই দিক দিয়ে আমাদের এ কালের বুদ্ধিধর্মী লেখকদের কিঞ্চিৎ অপূর্ণতা থাকা সম্ভব। তাঁরা যে পাঠকসমাজে ব্যাপক স্বীকৃতিলাভে অসমর্থ হয়েছেন তার হেতু তাঁদের বুদ্ধিবাদের মধ্যে যত না লুকিয়ে আছে বোধ হয় তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে লুকিয়ে আছে তাঁদের রসসৃষ্টির ক্ষমতার অভাবের মধ্যে। অন্ততঃ এ কথা তো খুবই স্পষ্ট যে, একজন তারাশঙ্করের তুলনায় একজন ধূর্জটিপ্রসাদ সৃজনী প্রতিভার বিচারে অনেক কম ক্ষমতা সম্পন্ন লেখক। ধূর্জটিপ্রসাদে মননশীলতার অভাব নেই, তা বলে তিনি কি তারাশঙ্কর কিংবা বিভূতিভূষণের সমপংক্তির কৃতিত্ব অর্জন করতে পেরেছেন? মোটেই তা নয়। মনোগঠনের ভিতর সৃজনী আবেগের আপেক্ষিক দৈন্যই এই অসামর্থ্যের কারণ।

আমরা বুদ্ধিবাদের সমর্থক বটে, কিন্তু তার মানে এ নয় যে, সৃজনী আবেগ বর্জিত বুদ্ধিবাদ সমর্থনযোগ্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান দুর্ভাগ্য এইখানে যে, বর্তমান লেখকদের মধ্যে সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত অভাব। একদেশদর্শিতার অপবাদ তাঁরা কোনক্রমেই এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাঁদের মনের পাল্লা হয় এদিকে ভারী নয় তো ওদিকে ভারী।

তাঁদের মানসিক তৌলদণ্ডের একমুখী পক্ষপাতিত্ব কোন সময়েই নিরাকৃত হতে পারল না। হয় তাঁরা আবেগপ্রাচুর্যের দিকে ঝুঁকছেন, নয় তো সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী শুষ্ক বুদ্ধিবাদের দিকে ঝুঁকছেন। দুইয়ে মিলে যে অখণ্ড শিল্পদৃষ্টি, তা সকল স্তরের আর সকল শ্রেণীর লেখকদেরই অনায়ত্ত হয়ে রইল। মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে শিল্পবুদ্ধি আর মনীষার যে গভীর-গূঢ় সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়, সে সামঞ্জস্যের বোধ অধিকাংশ একালীন লেখকের আয়ত্তের মধ্যে নেই, সেই সামঞ্জস্য অর্জন করা তো অনেক পরের কথা। ভবিষ্যতের সার্থক সাহিত্য-শিল্পী হবেন তিনিই, যিনি তাঁর শিল্পসৃষ্টির মধ্যে হৃদয়বত্তা আর মনীষার সুসমঞ্জস ঐক্য বিধানে সমর্থ হবেন। রবীন্দ্রনাথের পর আর এই সামঞ্জস্যের দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে মেলে নি, সে কথা বলা দরকার।

প্রমথ চৌধুরীর রচনারীতির ভিতর প্রশংসনীয় মননশীলতার তথা পাণ্ডিত্যের তথা বৈদগ্ধ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও তাঁর আপেক্ষিক সৃজনক্ষমতার দৈন্যই তদ্‌রচিত সাহিত্য উৎসাহের সঙ্গে গৃহীত না হবার অন্যতম প্রধান কারণ। প্রমথশিষ্যদের সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। তাঁরা শুধু নিরবচ্ছিন্ন বুদ্ধিবাদেরই চর্চা করে গেছেন বা এখনও করছেন; তাঁদের সাহিত্যে গভীর সৃজনী আকূতির বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমরা নিছক রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপোষক নই বটে, তাই বলে নিছক বুদ্ধিবাদেরও পরিপোষক নই। দুইয়ের নিবিড় মিলনেই যে শুধু প্রকৃত শিল্পদৃষ্টি গড়ে ওঠা সম্ভব, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

কল্লোল সাহিত্য-পত্রের আশ্রয়ী লেখকদের মধ্যে বুদ্ধিবাদের অভিমান প্রচুর ছিল; কিন্তু তাঁরাও মূলতঃ শরৎচন্দ্রের প্রদর্শিত রোমান্তিকতার সংস্কারটিকেই অনুসরণ করেছেন। অসার মধ্যবিত্ত

মানসিকতার দ্বারা তাঁদের রচনা ভরপুর বললেও চলে। সংস্কার-মুক্তি আর প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একটা ঠাট মাত্র তাঁরা খাড়া করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাঁদের পায়ের তলার মাটি নরম আর নড়বড়ে ছিল। সত্যিকার ব্যক্তি-স্বাধীনতা আর চিত্তের মুক্তির বাণী তাঁরা তাঁদের লেখনীমুখে সামান্যই অভিব্যক্ত করেছেন। তাঁদের সে প্রস্তুতিও ছিল না। তাঁরা শৌখীন বিদ্রোহের প্রচারক ছিলেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার খাত-বেয়ে-আসা এক ধরনের তরল মানসিকতার আবেশে তাঁরা জাতীয় ট্র্যাডিশনকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই অস্বীকৃতির প্রয়াসের দ্বারা তাঁরা শুধু নিজেদেরই খণ্ডিত করেছিলেন। কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের বিদ্রোহের মনোভঙ্গীটি যে আসলে ঠুনকো আর পলকা ছিল তা তাঁদের অধিকাংশের পরবর্তীকালের রচনার ধারা লক্ষ্য করলেই বেশ বোঝা যায়। বিদ্রোহ, বিপ্লব আর অস্বীকৃতির মনোভাব নিয়ে যাঁদের সাহিত্যজীবনের শুরু, তাঁরাই দেখা গেল দুই দশক পরে নিতান্ত goody-goody 'ভদ্রলোক' লেখকে রূপান্তরিত হয়ে বসে আছেন। তাঁদের আপাত-বিদ্রোহের পিছনে মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রাবল্য ছিল বলেই এরকমটা হতে পেরেছে বলে মনে হয়। তাঁদের তথাকথিত বৈদগ্ধ্যপ্রীতি আর বুদ্ধিবাদী অভিমানের অন্তঃসারশূন্যতার কথা তো পূর্বেই বলা হয়েছে।

আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যের স্বরূপলক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে আর একটি যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে তা হল—বাংলা কথা-সাহিত্য এখনও পর্যন্ত বহুলাংশে পল্লীভিত্তিক। পল্লীর চিত্র-চরিত্রই এখনও অবধি বাংলা গল্প-উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য হয়ে আছে। জীবিকার প্রয়োজনে পল্লীর পরিবেশ ছেড়ে শহরে আশ্রয়লাভকারী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভিতর ছেড়ে আসা পল্লীগ্রামের প্রতি যে পেছুটান থাকে, সেই আকর্ষণই গল্প-উপন্যাসকারদের

মূলতঃ ব্যাপকভাবে পল্লী-চিত্রণে প্ররোচিত করেছে। কিন্তু এই লক্ষণটিকে আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যের প্রশংসনীয় লক্ষণ বলা চলে না। এটিকে অন্যকার পরিস্থিতিতে একপ্রকার কালবারিত দোষ (anachronism) বলা যেতে পারে। কালের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এর সংযোগ নেই। স্বাধীনতা প্রাপ্তির ফলে জমিদারী প্রথা রদ, দ্রুত শিল্পবিস্তার, পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রয়োগ, গ্রামজীবনের নাগরিকীকরণ ইত্যাদির ফলে দেশের চেহারা দ্রুত পালটে যাচ্ছে; অথচ উপন্যাসে-গল্পে এই পরিবর্তনের কোন ছাপ নেই। এখনও আমরা সনাতন চণ্ডীমণ্ডপের আবহাওয়াতেই বাস করবার চেষ্টা করছি। এটি যদি কালবারিত দোষ না হয় তো কাকে কালবারিত দোষ বলে বোঝা দুষ্কর।

এ সম্বন্ধে 'পল্লীকেন্দ্রিক সাহিত্য' প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, সুতরাং এখানে সে বিষয়ের বিশদ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মৌলিকতার বিচার

সাহিত্য-আলোচনায় 'মৌলিকতা', 'সৃজনধর্মিতা' কথাগুলির বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে। এমন অবলীলাক্রমে এই শব্দগুলি প্রযুক্ত হয় যে তাদের সংজ্ঞা পুরাপুরি নিরূপিত হয়ে গেছে বলে আমরা ধরে নিই। কিন্তু সত্যই কি শব্দগুলির সংজ্ঞা চূড়ান্তরূপে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে? নূতন করে তাদের অর্থ পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করবার এতটুকু অবকাশও কি আর অবশিষ্ট নেই? এই প্রশ্নটি বিচারের জন্যই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

সাধারণতঃ মৌলিক বা সৃজনধর্মী রচনা বলতে কাব্য নাটক গল্প উপন্যাস প্রভৃতিকে বোঝানো হয়ে থাকে। এই সব রচনার উপজীব্য বিষয়বস্তু যেহেতু কল্পনা থেকে উদ্ভাবন করতে হয়, তার কোন হুবহু পূর্ব-নজীর বাস্তব-জীবনের ঘটনার ধারায় উপস্থিত থাকে না, সেই কারণে সেই সকল রচনার বিশিষ্টতা বোঝানোর জন্য আমরা তাদের উপর 'মৌলিক', 'সৃষ্টিধর্মী', 'সৃজনাত্মক' প্রভৃতি বিশেষণের প্রয়োগ করি। 'মৌলিক' অর্থাৎ মূলোৎপন্ন, মূলগত, আদিম। স্বকীয় কল্পনা আর ভাবনার বাইরে রচনার উপজীব্য বিষয়ের অস্তিত্ব এখানে অনুপস্থিত। মৌলিকতা বললেই সঙ্গে সঙ্গে নিজস্বতা তথা স্বাধীনতার ধারণা মনে আসে।

এই পর্যন্ত বেশ বোঝা যায়। কিন্তু তাই বলে স্বকীয় কল্পনা উদ্ভূত বস্তুমাত্রকেই 'মৌলিক' অভিধায় ভূষিত করা চলে কি না সে বিষয়ে সঙ্গতভাবেই সন্দেহ করা চলে। কাব্য নাটক গল্প উপন্যাস প্রভৃতি রচনা মূলতঃ সৃজনাত্মক তাতে সংশয় নেই, কিন্তু তাদের সৃজনাত্মক প্রকৃতি স্বীকার করে নিয়েও তাদের মূল্যবিচারে আমাদের সর্বদা গভীর বিচারবোধের দ্বারা চালিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। মৌলিক রচনা শুধুমাত্র মৌলিকতা-

গুণেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেত পারে না; যে বিষয়টিকে অবলম্বন করে মৌলিকতাগুণের প্রয়োগ হয়েছে সেই বিষয়েরও বিচার আবশ্যক। বিষয় যদি তুচ্ছ হয়, নগণ্য হয়, বিচারশীল পাঠকের মনোযোগের অযোগ্য হয় তা হলে যতই কেন না সেই বিষয়াবলম্বনে মৌলিকতা লীলায়িত হয়ে উঠুক, খুব বেশী উৎসাহ বোধ করা যায় না। মৌলিকপদবাচ্য রচনাসমূহের বিচারক্রিয়ায় এই কারণে বিষয়ের বিচার একটি মুখ্য স্থান জুড়ে আছে। মৌলিক-আখ্যাধারী রচনা শুধুমাত্র মৌলিকতার জন্য বরণীয় নয়, তার বিষয়-বিন্যাসও আমাদের মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। যাঁরা বলেন—সাহিত্যে রূপটাই আসল বিষয় কিছু নয়, তাঁরা বিশুদ্ধ মৌলিকতাগুণের উপর বড্ড বেশী মূল্য আরোপ করে থাকেন। এত বেশী মর্যাদা নিছক মৌলিকতার বুঝি প্রাপ্য নয়। সাহিত্য মূলতঃ রূপকর্ম তাতে সন্দেহ কি। কিন্তু তুচ্ছ বিষয়ের উপর রূপারোপের সার্থকতা স্বীকার্য নয়। মৌলিকতার রন্ধ্রপথে কত সময়ে যে এই তুচ্ছ বিষয়ের উপর মনোযোগ অনুচিতভাবে গিয়ে পড়ে তার লেখাজোখা নেই।

ধরুন একজন মৌলিকতার অভিমানী লেখক সম্পূর্ণ স্বকপোল-কল্পিত একটি গল্প ফাঁদলেন। সেই গল্পের বিষয় কী? না, একটি আঠারো বছরের ছেলে তার পাশের বাড়ির ষোড়শী কন্যার সঙ্গে, ওই যাকে বাজার-চলতি গল্প-উপন্যাসের ভাষায় 'প্রেমে-পড়া' বলে, তাই পড়েছে। হা-হুতাশ দীর্ঘশ্বাস আশা-নৈরাশ্যের আলোড়ন বুক-ভাঙা বেদনার মন্থন ইত্যাদি প্রত্যাশিত অধ্যায়-গুলির বিন্যাস পরের পর যেমন ঘটে থাকে লেখক এই ক্ষেত্রেও ঘটনা তেমনই ভাবে সাজাতে কসুর করলেন না। শেষ পর্যন্ত গল্পের কী পরিণাম দেখা গেল? দেখা গেল যে, মেয়েটির অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেল, ছেলেটি ইণ্টারমিডিয়েট ফেল করে অভিভাবকের কানমলা খেয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য ইণ্টারমিডিয়েট ফেল করবার

উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হতে লাগল। প্রেমপর্বে অনন্তকালীন ছেদ ঘটল। কিংবা, এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের গল্প। নিত্য অভাব-অনটনের সংসার। পান্তা আনতে লবণ ফুরায় লবণ আনতে পান্তা ফুরায় ভাব। গেরস্থালী সামলাতে গিয়ে গিন্নী হিমসিম খেয়ে যান। একদিন বাজার থেকে পচা কুঁচো চিংড়ি আনার ব্যাপার নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল কলহ বেঁধে গেল। গিন্নী তিতি-বিরক্ত হয়ে "রহিল তোমার এ ঘর-তুয়ার" বলে কর্তার সঙ্গে অসহযোগ করে পিত্রালয়ে প্রস্থান করলেন। কর্তা কিছুদিন হাত পুড়িয়ে রান্না করে খেয়ে তারপর যথারীতি শ্বশুরালয়ে গমনপূর্বক স্ত্রীর মানভঞ্জনের প্রয়াস পান। প্রথমে "পায়ে ধরে সাধা রা নাহি দেয় রাধা"-গোছের ভাব। তারপর উদ্‌ভ্রান্ত স্বামী পা ছাড়তেই অনুতাপবিদ্ধা গৃহিণীর চৈতন্যোদয়। অতঃপর আপোস মিলন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি।

এই যে গল্পের বুনুনি, এ তো একান্তরূপেই লেখকের স্বকীয় কল্পনার উদ্ভাবনী-নৈপুণ্যের দান। সৃজনের আবেশে 'বিভোর' হয়ে মৌলিকতাপ্রয়াসী লেখক সম্পূর্ণ নিজের মগজ থেকে গল্পের বিশেষ বাঁধুনি আর ছাঁদটুকু আবিষ্কার করেছেন। স্বকীয়তার প্রাথমিক শর্তগুলি এই গল্পে বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছে। তবু কোথায় যেন এই-জাতীয় রচনাকে 'মৌলিক' বিশেষণে বিশেষিত করতে বাধে। এ সকল গল্পের বিষয় এত তুচ্ছ এত অকিঞ্চিৎকর এত খুঁটিনাটিপরায়ণ যে তার তথাকথিত মৌলিকতা সত্ত্বেও তাকে সৃজনাত্মক রচনার পর্যায়ভুক্ত করতে মোটেই উৎসাহ জাগে না। মনে রাখা দরকার, এই ধরনের মৌলিকতাপ্রয়াসী রচনায় যে মৌলিকতাশক্তির ব্যবহার হয়ে থাকে তা অতি অপকৃষ্ট স্তরের মৌলিকতা—এই মৌলিকতায় মনের শ্রেষ্ঠ অভিনিবেশক্ষমতা, গাম্ভীর্য আর চিন্তাশক্তিকে সংহত করবার আদৌ প্রয়োজন হয় না। শুধু একটা মৌলিকতার ঠাট খাড়া রাখলেই কাজ চলে যায়।

তাকেই আমরা শ্রেষ্ঠ মৌলিকতা বলব, যে গুণ লেখকের উদ্ভাবনী নৈপুণ্যের প্রমাণ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চূড়ান্ত অভিনিবেশকেও আকর্ষণ করে। হেলাফেলার মনোভাব সহকারে তুচ্ছ বিষয়ের ভিত্তির উপর মৌলিকতার সৌধ উত্তুঙ্গ করলে দুদিনেই সে সৌধ তাসের ঘরের মত হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। এমন মৌলিকতার ধারা ও ধরন সম্পর্কে সমালোচকদের মধ্যে সংশয়াপন্ন মনোভাব দেখা দিলে তাঁদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

অথচ মুশকিল হয়েছে এই যে, এ-জাতীয় রচনারই বাজার-দর আজকাল বেশী। ব্যাবসাবুদ্ধিসার প্রকাশকের দল হন্যে হয়ে আছেন কে কার আগে এমন একটি 'মৌলিক' রচনা ছোঁ মেরে লুফে নেবেন। "আগে কেবা দাম করিবেক দান তারি লাগি কাড়াকাড়ি।" লেখাটি যখন লেখকের স্বকপোলকল্পিত আর 'মৌলিকতা'র লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত, তখন আর-কিছু দেখবার প্রয়োজন নেই। পাঠকদের গোগ্রাসে গেলবার ক্ষমতার উপর বিশ্বাস রেখে 'দুর্গা' বলে ঝুলে পড়লেই হল। 'দুর্গা' বলে ঝুলে পড়বার আগে প্রকাশকেরা অবশ্য সামান্য একটু কাজ করেন। তাঁরা জবরজঙ ছবিতে বইয়ের মলাটটিকে চিত্রবিচিত্র করে মনের ভিতর যুগপৎ পাঠকের প্রতি কল্পিত দায়িত্বপালনের আত্মপ্রসাদ আর শিল্পপ্রীতির সুড়সুড়ি অনুভব করেন। "একা রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর।" অর্থাৎ প্রকাশকেরা 'মৌলিক' সাহিত্য আর মলাট-সাহিত্য দুই-ই একসঙ্গে পরিবেষণ করেন। খতিয়ে দেখতে গেলে, মলাট না হলে যেন এই সব মৌলিক রচনার ঠিক খোলতাই হয় না। আমাদের আজকালকার অধিকাংশ লেখকেরই ললাট মলাটের সহিত গভীরভাবে যুক্ত। মলাটের দ্বারাই তাঁদের ললাট-লিখন মুখ্যতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়। মৌলিকত্বে আর মলাটত্বে মিলে বাংলা সাহিত্যে স্বর্ণযুগের সূত্রপাত হয়েছে।

কেন এ রকম হয়? কেন আজও আমরা মৌলিকতা সৃষ্টির

নামে তুচ্ছ আর অকিঞ্চিৎকরের বন্ধন অতিক্রম করে উঠতে পারছি না? কেন রঙ-বেরঙের অসার জৌলুস আর চেকনাই আজও আমাদের মনোযোগ দখল করে রয়েছে? প্রশ্ন কটির উত্তরের জন্য খুব বেশী মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। যে-কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি অচিরাৎ এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থার কারণ নির্দেশ করতে পারবেন। সে কারণটি হল এই—বাংলা সাহিত্য এখনও পর্যন্ত ছোকরা পড়ুয়া,, স্ত্রীজাতি, কেরানীকুল এবং সাধারণভাবে অর্ধ-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রুচি-পছন্দের দ্বারা পরিচালিত। এঁদের গল্প গেলবার ক্ষমতা অপরিসীম; মৌলিক সৃষ্টির নামে ছাইভস্ম যা-কিছু হোক, এঁরা গলাধঃকরণ করতে প্রস্তুত। সেই ছাইভস্মের উপরে যদি একটু শর্করার আবরণ থাকে তা হলে তো আর কথাই নেই। অর্থাৎ মলাটটি যদি বেশ রঙচঙে আর বাহারে দেখতে হয় তা হলে সোনায় সোহাগা। এই যে আজকাল বিবাহের উপহার হিসাবে তথাকথিত গল্প-উপন্যাস গ্রন্থের সবিশেষ প্রচলন হতে আরম্ভ করেছে এবং পুস্তকের বিষয়বস্তু-নির্বাচন থেকে শুরু করে পুস্তকের নামকরণ মলাটশোভা ইত্যাদি সেই বিশেষ লক্ষ্যের প্রতি চোখ রেখে সম্পাদিত হচ্ছে—এ বাংলা সাহিত্যের প্রচণ্ড নাবালকত্ব সূচনা করে। এই অবস্থার দ্বারা বোঝাচ্ছে এ কথাই যে, আমাদের বর্তমান সাহিত্য-অনুশীলনকারীদের উপর বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী শরৎচন্দ্র প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের দিক্‌পালদের প্রভাব একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে। আমরা একটা ঘোরতর বৈশ্যযুগের ভিতর প্রবেশ করেছি। এমন এক যুগ, যেখানে বই 'মাল' হিসাবে কাটে, বই বিক্রি হয় ওজন দরে, মলাটের জৌলুসের দ্বারা বইয়েব গুণাগুণ স্থিরীকৃত হয়, যেমন-তেমন একটা গল্প বানাতে পারলেই লেখকরা কৃতকৃতার্থ হয়ে যান, সর্বোপরি স্থূল আর ভোঁতাবুদ্ধি প্রকাশকের দল রসজ্ঞ আর বিচারকদের নিছক রজতকৌলীন্যের জোরে হটিয়ে দিয়ে নিজেরা আসর জাঁকিয়ে

বসেছে। এখন জ্ঞানীগুণীরা আর আমল পান না, কলেজ স্ট্রীটের হোঁতকা বইওয়ালারাই আজ সাহিত্যের রক্ষক, চালক আর অভিভাবকের পদে উন্নীত হতে চলেছেন। যে-সকল পত্র-পত্রিকার কোন সাহিত্যিক ঐতিহ্য নেই, নিছক ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আর দৈনিক পত্রিকার লেজুড়-হিসাবে যে-সকল পত্র-পত্রিকা পরিচালিত হয়ে থাকে, গুচ্ছের লেখা আর রকমারী লেখা সংগ্রহ করে এনে নিয়মিত ছাপিয়ে বার করা যে-সকল পত্রিকার সম্পাদকদের সম্পাদকীয় দক্ষতার একমাত্র নিশানা, যে-সব পত্র-পত্রিকার সম্পাদনায় বিচারশক্তি আর রচনাশক্তির আদৌ প্রয়োজন হয় না, সেই সব পত্র-পত্রিকা বুলেটিন ম্যাগাজিনই আজকাল পাঠকরুচির মূল নির্দেশক হয়ে বসেছে। এর দ্বারা সুসমৃদ্ধ ঐতিহ্য সমন্বিত বাংলা সাহিত্যের যে কত বড় অধঃপতন সূচিত হচ্ছে তা বলে বোঝানো যায় না।

আমাদের নিরাশ হলে চলবে না। বাংলা সাহিত্যের পুরাতন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের উচ্চ আদর্শ সামনে রেখে আমাদের নূতন আশায় বুক বেঁধে বর্তমানের এই লঘু-সাহিত্যের জোয়ার ঠেকাবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। মৌলিক রচনাসৃষ্টির নিদর্শনমাত্রেই আমরা উল্লসিত হব না, তার ভিতর আরও কিছুর সন্ধান করব। যে মৌলিকতার সঙ্গে মননশীলতার যোগ নেই, বিদ্যাবত্তার যোগ নেই, আদর্শবাদী আকূতির যোগ নেই, গভীর রুচি ও সৌন্দর্য দ্বারা যে মৌলিকতা অনুপ্রাণিত নয়, অসার মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বারা যে মৌলিকতা দুরারোগ্য-রূপে আচ্ছন্ন ও আবিষ্ট, তেমন মৌলিকতাকে আমরা প্রথম দৃষ্টিতেই সন্দেহের চক্ষে দেখব, তাকে মূল্যহীন বলে বর্জন করব।

হালকা-সাহিত্যের অনুরাগী, তথাকথিত সৃজনাত্মক রচনার নিদর্শনমাত্রে মূর্ছাপন্ন পাঠকের সংখ্যাই আজ বেশী। বই কেনবার যাঁদের সঙ্গতি আছে তাঁদের বেশীরভাগ এই কোঠাতেই পড়েন।

সুতরাং একপ্রকার অবধারিতভাবেই তাঁদের রুচির দ্বারা সাহিত্যের রুচি মূলতঃ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সেই সব লেখকেরই আজ বাহ্বাস্ফোট বেশী, যাদের পিছনে এই অপরিণতমনা পাঠকসম্প্রদায়ের সঙ্ঘ-শক্তির সমর্থন রয়েছে, আর যেহেতু প্রকাশক সম্প্রদায় তাঁদের অস্তিত্বের জন্য ক্রেতৃ-শ্রেণীর উপর সম্পূর্ণাংশে নির্ভরশীল, সেই কারণে প্রকাশকদের পাঠকশ্রেণীর হাতে-ধরা জীব বললেও অত্যুক্তি হয় না। ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী, সাহিত্যের তথাকথিত পৃষ্ঠপোষক পাঠক-সাধারণ যে পরিমাণে অজ্ঞ, প্রকাশক-সম্প্রদায় সেই পরিমাণে অর্থলোলুপ, আদর্শবুদ্ধিবিবর্জিত। সৎ-সাহিত্যের কোনরূপ বিচারক্ষমতাই এঁদের নেই, যদিও মুখে অনেকেই সৎ-সাহিত্য প্রচারের ভড়ং করে থাকেন। পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখা তো দূরের কথা, চোখের দেখাও দেখবার এঁদের প্রয়োজন হয় না। সংশ্লিষ্ট লেখকের সম্পর্কে বাচাল লোকদের মুখে মুখে যে সব কথা চালু হয় তারই উপর নির্ভর করে তাঁরা বইয়ের গুণাগুণ এবং লেখকের মর্যাদা নিরূপণ করেন। এই যেখানে অবস্থা, সে স্থলে যথার্থ সৎ-সাহিত্যের পক্ষাবলম্বনকারীকে খুব ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে, ধৈর্য হারালে চলবে না। দেশে যতই শিক্ষার বিস্তার হতে থাকবে ততই পাঠকের রুচি উন্নত হবে, নূতন-শ্রেণীর পাঠকের অভ্যুদয়ে পুরাতন-রুচির পাঠক কোণঠাসা হয়ে পড়তে বাধ্য হবে। দেশে নতুন সাহিত্যের চাহিদা সৃষ্টি হলে নতুন মূল্যমানের সৃষ্টি হবে, সাময়িক সাহিত্য-বিচারের নতুন মাপকাঠিরও সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে। তেমন অবস্থার উদ্ভব হলে গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গীযুক্ত পাঠক নিছক রুচির প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়েই পালাবার পথ খুঁজে পাবে না। আজকের দিনের অধিকাংশ তথাকথিত 'সাকসেসফুল' লেখক আর প্রকাশকের বড় খুঁটি হল পাঠকশ্রেণীর অনগ্রসরতা। পাঠকেরা অনুন্নত স্তরে আছে বলেই ঠুনকো মধ্যবিত্ত ভাবের কারবারী লেখক

আর প্রকাশকদের সবিশেষ সুবিধা হয়েছে। সংখ্যায় গরিষ্ঠ অথচ রুচিতে অপকৃষ্ট পাঠকদের পৃষ্ঠপোষকতার লগিতে ভর করে ভরা পালে এঁরা এঁদের সাফল্যের তরণী তরতর করে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছেন। হাওয়া এখন এঁদের পক্ষে অনুকূল, তাই এঁদের নর্তন-কুর্দনের অন্ত নেই। কিন্তু হাওয়া পালটাতে কতক্ষণ! হাওয়ার গতি ঘুরলেই ভরাপাল চুপসে এই এতটুকুন হয়ে যাবে, তখন "ভরাপালে চলে যায় কোন দিকে নাহি চায়" রূপ অহঙ্কার আর থাকবে না। আমরা সেই দিনেরই প্রতীক্ষা করছি।

তথাকথিত সৃজনাত্মক বিভাগগুলি বাদে সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে যাঁরা কর্মরত আছেন—যেমন প্রাবন্ধিক সমালোচক ইতিহাসকার সমাজবিজ্ঞানী লেখক ঐতিহাসিক রাজনীতিবিদ্ প্রভৃতি—তাঁদের এক্ষণে নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হচ্ছে। সবচেয়ে বড় বাধা হল পাঠকসাধারণের একটি বৃহৎ অংশের ঔদাসীন্যের বাধা। কী এক দুর্জ্ঞেয় যুক্তিপরম্পরা-হেতু আমাদের সাহিত্যের অধিকাংশ পাঠকের মনে এইরূপ একটি ধারণা শিকড় গেড়ে বসেছে যে, যেহেতু উল্লিখিত শ্রেণীর লেখকেরা মূলতঃ তথ্য নিয়ে কাজ করেন, চিন্তা আর বিচারের ফল পরিবেশন করেন, অধ্যয়ন আর বিদ্যাচর্চায় কালাতিপাত করেন কিন্তু সঙ্কীর্ণ অর্থে মৌলিকতার চর্চা করেন না; সুতরাং তাঁদের কাজ নিম্নস্তরের কাজ, মৌলিক লেখকদের মত মর্যাদা এবং গুরুত্ব তাঁরা কোনক্রমেই দাবি করতে পারেন না। কিন্তু এর চেয়ে ভ্রমাত্মক ধারণা আর কিছু কি হতে পারে? মৌলিক লেখকদের মধ্যে যাঁরা সত্যিকার মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী, যাঁদের কল্পনাবৃত্তি অতিশয় সমৃদ্ধ এবং তীক্ষ্ণ, তাঁদের দ্বারা সাহিত্যের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়ে থাকে, তাঁরা সব সময়েই নমস্য, তাঁদের সঙ্গে কারও কোন বিবাদ থাকতে পারে না। কিন্তু সেই

যুক্তিতে যে-কোন হেঁজিপেঁজি মৌলিক লেখকই কি শেষোক্ত লেখকদের তুলনায় সমধিক যোগ্যতার দাবি করতে পারেন? একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক কিংবা সমাজবিজ্ঞানী লেখক কিংবা প্রাবন্ধিককে গোটা জীবনের অধ্যয়ন আর চিন্তাসাধনার দ্বারা ধীরে ধীরে তাঁর সাফল্যের প্রাকার উত্তুঙ্গ করতে হয়। সেই সাফল্যের পিছনে কত ধৈর্য কত সহিষ্ণুতা কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা কত চিন্তন-মননের দীর্ঘস্থায়ী ইতিহাস লোকচক্ষুর অগোচরে সুগুপ্ত থাকে। ব্যক্তিত্বের সমগ্র অভিনিবেশ-ক্ষমতা আর চিন্তাশীলতাকে সুসংহত করে তবে তাঁরা তাঁদের চিন্তা আর রসবুদ্ধির উপযুক্ত প্রকাশরীতি আয়ত্ত করে থাকেন। সেই কৃতিত্বের দাম নেই, দাম আছে কুঁচো চিংড়ি আর নেত্য ঝি আর আঁশবটি আর সজনে ডাঁটার চচ্চড়ি নিয়ে যাঁরা স্বকপোলকল্পিত গল্প ফাঁদেন তাঁদের? এর চেয়ে মূঢ়তা আর কিছু কল্পনা করা যায় না।

কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, যে কথা আগেই বলেছি, এই সজনে ডাঁটা চচ্চড়ির ভোক্তা পাঠক সংখ্যাই আমাদের সমাজে বেশী। মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার কাহিনীর একটু গন্ধ পেলেই এঁদের রসনা রসসিক্ত হয়ে ওঠে, এমনি নীরন্ধ্র এঁদের মধ্যবিত্ত মানসিকতা। আমাদের প্রত্যেক বাংলা সিনেমা-ছবিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দু দর্শকদের লৌকিক ধর্মবিশ্বাসকে কাতুকুতু দেবার জন্য, বিশেষতঃ দর্শকদের মধ্যে যাঁরা গিন্নীবান্নী-শ্রেণীর জীব তাঁদের ভক্তিভাবকে চাগিয়ে তুলতে যেমন একটি করে নাড়ুগোপালের বিগ্রহের আমদানি করা হয়, তেমনি বাংলা গল্প-উপন্যাসেও পাঠকের মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে সুড়সুড়ি দেবার জন্য নানাবিধ তুচ্ছ প্রক্রিয়ার আশ্রয় লওয়া হয়। এই সব স্বীকৃত প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে আঁশবটি কলতলার ছাই এঁটো বাসন, উনুনের ধোঁয়া জ্বালানি আর ঘুঁটে, গয়লার মাসকাবার হিসাব, ধোপার ফর্দ,

অয়েল ক্লথ ফীডিং বটল শিশুর মুতুড়ে কাঁথা, চিরুনী তরল আলতা সিঁদুরের কৌটো খোঁপার কাঁটা ইত্যাদি প্রধান। এই সব রচনা পড়তে পড়তে বৃহত্তর জগতের পরিপ্রেক্ষিত থেকে প্রত্যাহৃত হয়ে দৃষ্টি ছোট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, মন মধ্যবিত্ত মানসিকতার নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে আর সঞ্চরণক্ষেত্র খুঁজে পায় না। সাহিত্যের প্রধান কাজ মনের উদ্বোধন, মনের প্রসারণ; তাকে ছোট গণ্ডিতে আবদ্ধকরণ নয়। অথচ অপরিমিতমাত্রিক মধ্যবিত্ত মানসিকতার কারবারী গল্প-উপন্যাসের দ্বারা শেষোক্ত অপ-উদ্দেশ্যেরই পোষকতা করা হয়ে থাকে। কিন্তু সে বিষয়ে আর সচেতন কয়জনা? ভাল হোক মন্দ হোক, হিতকারক হোক চাই অনিষ্টকারক হোক, আমরা গল্প গিলতে পারলে আর কিছু চাই না। ঘুম-পাড়ানো মনকে জাগিয়ে তোলার জন্য আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই, বরং মধ্যবিত্ত মানসিকতার আফিংয়ের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকাতেই আমাদের সমধিক আনন্দ। এই তুচ্ছ আনন্দ-সন্ধানের দ্বারা সাহিত্যের সুর যে কত নেমে যাচ্ছে সেদিকে কারও খেয়াল নেই।

অন্যদিকে গ্রামজীবনের গল্প যাঁরা লেখেন তাঁরা অন্তহীন পুনরাবৃত্তির ঢঙে ঘেঁটুফুল, মা শেতলার 'থান', রক্ষাকালী ওলাবিবি বাঁশঝাড় এঁদো ডোবা, জমিদার-কাছারির মুহুরী আর গোমস্তা, মুদীর দোকানের চাল-ডাল-লঙ্কা-লবণ, ঝাড়ফুঁক তুকতাক, ওঝা বৈদ্য সন্ন্যেসী, গাজনের মেলা আর ষষ্ঠিতলার বারোয়ারী বৈঠক, তাবিজ কবচ মাতুলি জলপড়া আর বাটীচালান, বটগাছের বেহ্মদত্যি আর খিড়কির পুকুরের পচা পানা ঘাঁটাঘাটি করেই সারা জীবন কাটিয়ে দেন—কুসংস্কার আর মামুলী জীবনের ছবির এক সারিবদ্ধ মিছিল। যাঁরা এই সব বিষয়ের আশ্রয়ে গল্প-উপন্যাস রচনা করেন তাঁরা এই বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন যে, তাঁরা বাংলা দেশের মাটি আর মানুষকে সাহিত্যের

ভিতরে রূপ দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু মাটির সোঁদা গন্ধ কি এতই মূল্যবান যে, তার জন্য অভ্যস্ত গতানুগতিকতাকে চিরকাল আঁকড়ে ধরে থাকতেই হবে? মৌলিকতা সৃষ্টির নামে এই সনাতন বিষয়বস্তুর উপর বিরামবিহীন ভাবে দাগা বুলিয়ে যাওয়ার অর্থ কী! এর দ্বারা যে মনের মুক্তি ঘটে না বরং মন আরও বেশী মাত্রায় সঙ্কীর্ণতার পাকে জড়িয়ে পড়ে—আমাদের পল্লীকেন্দ্রিক কথা-সাহিত্যিকের দল সে কথা কবে উপলব্ধি করবেন? বেশীর ভাগ শহুরে পাঠকেরই পল্লীর সঙ্গে পরিচয় ভাসা-ভাসা, অনেক ক্ষেত্রে পরিচয় নেই বললেই চলে; এই অনভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণে পল্লীকেন্দ্রিক লেখকদের তরফে কখনও তৎপরতার কমতি দেখা যায় না। তাঁরা পল্লীর পরিবেশ সৃষ্টি করবার অছিলায় গ্রাম-জীবনের হেন বিষয় নেই যা তাঁদের লেখায় না আমদানি করেন—ইস্তক জমিদারী করচা দলিল তমসুক খত পর্যন্ত। ভাবখানা এই যে, আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য জমিদারী সেরেস্তারই একটি লেজুড়, বাংলার পাঠকসাধারণ যেন খত-তমসুক রেহান আর ডিক্রিজারির আবহাওয়াতেই চিরটা কাল বড় হয়ে উঠেছেন। স্বীয় অভ্যস্ত বিষয়ের সঙ্গে পাঠকেরও অভ্যস্ততা কল্পনা করে নেওয়ার মধ্যে এক প্রকারের কল্পনার দৈন্য প্রকাশ পায়, যা অনেক লেখকেরই মাথায় ঢোকে না।

সাহিত্যে যাঁরা আলোচনা-সমালোচনা-চিন্তার ধারাটি বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁরা আর কিছু পারুন আর না পারুন, এই অভ্যস্ত সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি থেকে পাঠকমনকে মুক্ত করার কাজে অনেকখানি পরিমাণে সহায়তা করছেন। তাঁরা সাহিত্যের একঘেয়ে আবহের মধ্যে জ্ঞানচর্চার হাওয়া সঞ্চালিত করে সাহিত্যকে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের গ্রহণীয় আর ভোগ্য করে তোলেন। তাঁরা জাতির চিন্তার অভ্যাসটি জাগ্রত রাখেন, পাঠকের জিজ্ঞাসা আর কৌতূহলকে কখনও ঝিমিয়ে পড়তে দেন না। সংকুচিত সংজ্ঞার্থ

বিচার করলে তাঁদের মধ্যে সকলেই হয়তো মৌলিকতার কারবারী নন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সুস্পষ্টভাবেই মৌলিকতার কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কমলাকান্তের দপ্তর’, রবীন্দ্রনাথের ‘প্রাচীন সাহিত্য’, মোহিতলালের সমালোচনা-প্রবন্ধ কি মৌলিক সাহিত্য নয়? প্রমথ চৌধুরীর পরম-উপভোগ্য নিবন্ধসমূহের আকর্ষণ তথাকথিত মৌলিক গল্প উপন্যাসের আকর্ষণের চাইতে কম, না, বেশী? আমরা আগেও যে কথা একবার বলেছি সে কথার পুনরাবৃত্তি করে বলি, পাঠকের গ্রহিষ্ণুতার উপরেই শেষ পর্যন্ত সব-কিছু নির্ভর করে। পাঠকের রুচি যদি অনুন্নত হয়, মনের ঘাঁট যদি সুলভ সাহিত্যের সুরে বাঁধা থাকে, তা হলে মধ্যবিত্ত সাহিত্যেবই বাজার-দর বেশী হওয়ার কথা। কিন্তু মনের সর্বাঙ্গীণ প্রকর্ষসাধন যদি সাহিত্যের লক্ষ্য হয়ে থাকে, তা হলে আলোচনা সমালোচনা প্রবন্ধ নিবন্ধ সন্দর্ভ ইত্যাদি মিলিয়ে সাহিত্যের যে পূর্ণাঙ্গ রূপ, সেই পূর্ণাঙ্গ রূপেরই ধ্যান করতে হবে। এই কাজটি এখনও পর্যন্ত শোচনীয়রূপে অবহেলিত আছে: আমাদের অধিকাংশেরই মনোযোগ তথাকথিত সৃজনধর্মী রচনার উপর অনুপাত-অতিরিক্ত ভাবে ন্যস্ত রয়েছে। প্রবন্ধ নিবন্ধ সন্দর্ভ সমালোচনা অর্থাৎ বিশ্লেষণাত্মক সাহিত্য-রচনায় যাঁরা ব্যাপৃত আছেন তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা তাঁরা পাচ্ছেন না।

সে মর্যাদা তাঁদের দিতে হবে, তাঁরা যাতে তাঁদের কাজের সার্থকতার চেতনা সহ নিজ নিজ কাজে তন্ময় হয়ে ডুবে থাকতে পারেন তদনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করে তাঁদের সাধনার সহায় হতে হবে। শুধু আপাতমৌলিকতা নিয়ে তৃপ্ত থাকলেই চলবে না, মৌলিকতার স্তরভেদ স্বীকার করতে হবে এবং অভ্যস্ত ক্ষেত্র ছাড়াও অন্যত্র মৌলিকতার সন্ধান করতে হবে। বুদ্ধিচর্চায় সর্বসাধ্য উৎসাহ দিতে হবে। বাংলা সাহিত্যের সত্যিকারের প্রগতি একমাত্র এই পথেই হওয়া সম্ভব।

কথা-সাহিত্য ও দেহবাদ

১

আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে বাংলা সাহিত্যে কল্লোল-কালিকলম-ধূপছায়া প্রভৃতি পত্রিকাকে আশ্রয় করে একটা নয়া আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সেই আন্দোলনের মূল কথা হল—ভোগের স্বেচ্ছাচার, যৌন আকাঙ্ক্ষার মুক্তি, দেহজ বাসনা-কামনাকে প্রেমের একমাত্র লক্ষণজ্ঞানে প্রেমের অতীন্দ্রিয়ত্ব অস্বীকার। আধুনিক বৈদেশিক সাহিত্যের ভাবধারায় পুষ্ট, দেশীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যের সহিত সম্পর্করহিত, তারুণ্যের উন্মাদনায় টলমল কতিপয় নবীনবয়সী শক্তিশালী কিন্তু বিপথগামী লেখক ওই প্রমত্ত আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। তাঁরা দেহবাদী কামনার স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও দুর্বার বেগকে সাহিত্যের অন্যতম প্রধান (কারও কারও দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রধানতম) মৌলিক বিষয় বলে প্রচার করতে থাকেন। বাংলা সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খলতা আর অসংযমের বাঁধভাঙা বন্যা দেখা দেয়। তারুণ্যের জয়পতাকা ওড়াবার নামে শালীনতা, শোভনতা ও সুমার্জিত রুচিবোধকে ধূলায় কাদায় টেনে নামিয়ে আনা হয়। কিন্তু বন্যা ঘোলা জলেরই হোক আর যারই হোক তার ধর্মই হল এই যে, তা এক সময়ে না এক সময়ে থিতিয়ে আসে, বন্যাবেগ প্রশমিত হয়ে স্রোতোধারায় স্বাভাবিক গতির পুনঃসঞ্চার হয়। আলোচ্য আন্দোলনের বেলায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের হিতবাক্যের প্রভাবেই হোক আর জাতীয় চিত্তে সহজাত শুভবুদ্ধির আধিক্যের জন্যই হোক কিংবা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেখকদের নিজেদেরই মনোভাব পরিবর্তনের ফলেই হোক, কল্লোল-পত্রিকাশ্রয়ী ওই অশান্ত আন্দোলনের তীব্রতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়ে আসতে থাকে এবং,

এক সময়ে তা সম্পূর্ণ মন্দীভূত হয়। বাংলা সাহিত্য বিকারগ্রস্ত ভাবনা আর অস্থিরচিত্ততার কবল থেকে মুক্তি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

কিন্তু মনে হয় কোন আন্দোলনেরই বোধ হয় জড় একেবারে সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না। বিশেষ, যে সকল আন্দোলনের ভিতর অশুভ প্রবৃত্তির সুস্পষ্ট প্ররোচনা বিদ্যমান সেগুলির বোধ হয় চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে আসার একটা প্রবণতা থাকে। তা যদি না হয়, তা হলে আজ আবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি কেমন করে সম্ভব হল? স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, সাম্প্রতিক বাংলার কিছু কিছু কথা-সাহিত্যিক তাঁদের লেখার ভিতর উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তিকে আবার নতুন করে জীবনদান করবার চেষ্টা করছেন। তাঁরা যেন ভোগমুক্তির আদর্শ প্রচারের জন্য সব কোমর বেঁধে লেগেছেন। এই আকস্মিক দেহ-বিলাসের উত্তেজনার পিছনে ব্যবসায়িক অপউদ্দেশ্য নিহিত থাকা অসম্ভব নয়। গরম গরম বই লিখলে এক শ্রেণীর পাঠকের মধ্যে যে তার বিশেষ কাটতি হয়—এ তাঁরা অভিজ্ঞতায় বুঝে নিয়েছেন। যারা বাংলা আর হিন্দী সিনেমা-ছবির নিয়মিত দর্শক, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের প্রসঙ্গ নিয়ে ফাটাফাটি-মারামারি পর্যন্ত করতে প্রস্তুত, রকে বসে ডালমুট আর হাফ-চায়ের সঙ্গে দৈনিক পত্রিকা পড়া অবধি যাদের সংস্কৃতিচর্চার দৌড়, খেলোয়াড় আর সিনেমা-স্টারদের অন্ধিসন্ধি যাদের নখদর্পণে, তাদের এবং এ-জাতীয় অন্যান্য ধরনের পাঠকদের সংখ্যাই সমাজে বেশী। এদের মনোরঞ্জন করতে হলে অপকৃষ্ট রুচির বই লেখাই যে সর্বোত্তম পন্থা—এ কথা বুঝতে আজকের দিনের ব্যবসায়বুদ্ধিসার লেখকদের বিলম্ব হয় নি এবং তাঁদের সেই নবোন্মেষিত বোধকে কাজে লাগাতে চেষ্টার কোন ত্রুটিই করছেন না তাঁরা। ভেবেছিলাম, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের ভূত বুঝি বাংলা সাহিত্যের ঘাড় থেকে একেবারেই নেমে গেছে; এখন

দেখতে পাচ্ছি, তা নয়, ওটি আবার এক শ্রেণীর লেখকের মনোরাজ্যে নতুন করে আসর জাঁকিয়ে বসেছে। ফ্রয়েডীয় গবেষণার সূত্র ধরে পরবর্তী কালে পাশ্চাত্য দেশে মনঃসমীক্ষণ আর মনোবিকলন-বিদ্যায় আরও যে সব নূতন তথ্য সংযোজিত হয়েছে সেই সব তথ্যস্তূপ কোন কোন লেখকের মনের উপর স্পষ্টতঃই ভার হয়ে চেপে বসেছে। নির্জ্ঞান মনের অসুস্থ বাসনা-কামনাকে গল্পে রূপদান করে কাহিনীর ছাঁদে প্রকাশের একটা রেওয়াজই যেন সাম্প্রতিক সাহিত্যে তৈরী হয়ে গেছে বলে মনে হয়।

যে সকল লেখক নূতন করে এই বিকার-ভাবনার পরিবেশণায় মেতেছেন তাঁদের সাহিত্যচর্চার বহিঃকেন্দ্রিক এবং আত্মকেন্দ্রিক দুটি দিকই আছে। শুধু যে তাঁরা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেই এ-জাতীয় রচনায় হস্তক্ষেপ করেছেন তা নয়, তাঁদের নিজেদেরও এ-জাতীয় রচনার প্রতি বিশেষ পক্ষপাত আছে। নরনারীর কামজ আকর্ষণের অবাধ স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাকে তাঁরা সাহিত্যের একটি প্রধান উপজীব্য বিষয় বলে মনে করেন এবং এর তুলনায় অন্য সকল বিষয়কেই গৌণ বিবেচনা করেন। এঁদের চোখে কামজ প্রেমই হল সাহিত্যের সবচেয়ে বড় রিয়ালিটি। এঁদের যুক্তি হল এই যে, জীবযাত্রার প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন আর অক্ষুণ্ণ থাকবার মূলে রয়েছে কাম, সুতরাং ওই মৌলিক প্রবৃত্তিকে বাদ দিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস কখনও স্বাভাবিকপদবাচ্য হতে পারে না। যুগ যুগ ধরে আদিরস সাহিত্যের অন্যতম প্রধান অবলম্বন, তাকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না।

কথাটা অনস্বীকার্য সন্দেহ নেই, কিন্তু এই যুক্তির একটা মস্ত ত্রুটি এইখানে যে, যাঁরাই এ-জাতীয় যুক্তি প্রদর্শন করেন তাঁদেরই চোখে দেহবাদী বিষয় ছাড়া আর-সব বিষয় গৌণ হয়ে যায়। জীবনের একটা স্বাভাবিক-সুস্থ গতিচ্ছন্দ আছে, নরনারীর

পরস্পরকে কামনা করবার বাইরে যে জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে, জীবন-সংগ্রামের সমস্যা আছে, আত্মোন্নয়নের সমস্যা আছে, সমাজসেবার, ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ-সাধনের সমস্যা আছে, বিশুদ্ধ জ্ঞান-পিপাসার পরিতৃপ্তির সমস্যা আর নিসর্গ-প্রীতিজাত সৌন্দর্য-ভোগের সমস্যা আছে—এ সকল প্রশ্ন দেহবাদী লেখকদের মগজে মোটে স্থানই পায় না। তাঁদের জগৎ একটি মাত্র বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত, এর বাইরে আর মানুষের অন্য কোনরূপ সত্তা বা অস্তিত্ব তাঁদের জানা নেই। তাঁরা সব শিল্পে অদ্বৈতবাদী মতের পরিপোষক—'একমেবাদ্বিতীয়মে'র আদর্শ তাঁদের মন কেড়ে নিয়েছে। দেহবাদের বিগ্রহের বেদীমূলে তাঁদের সবটুকু শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করা চাই।

বৃথাই আজকাল আমরা সমাজচেতনা, প্রগতিশীলতা, দেশ ও জাতির উন্নয়ন, শিক্ষাসমস্যা ইত্যাদির কথা বলি। দেহবাদী কথা-সাহিত্যিকদের লেখা পড়লে সে-সব মনে হওয়ার আদৌ জো নেই। এক-জোড়া তরুণ-তরুণী যদি সব সময় মন-দেওয়া-নেওয়ার খেলা নিয়ে বিব্রত থাকে, জৈব আকর্ষণের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা পীড়িত হয়, পরস্পরের হৃদয়মনকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সময় কাটায়, শয়নে স্বপনে জাগরণে শুধু অপরের হৃদয়-মন কী করে পাওয়া যায় সেই কথাই ভাবে, জৈব অনুভূতির কণ্ডূয়ন করে, তা হলে তারা কখন লেখাপড়া করে, কখন জীবিকার সংগ্রাম চালায়, কখন পারিবারিক আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস নেয়, কখন সামাজিক দায়িত্ব পালন করে, বৃহত্তর দেশ ও জাতির কথা ভাবে ভাল বোঝা যায় না। আমার তো এক-এক সময় মনে হয়, আমরা এই-যে সব নানাবিধ কর্তব্যপালনের কথা বলি—জাতির প্রতি কর্তব্য, সমাজের প্রতি কর্তব্য, প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য, নিজের প্রতি কর্তব্য—এ সকল কথা আসলে ভুয়া। প্রেমজ ও কামজ জীবনের বাইরে মানুষের

স্বতন্ত্র কোন রূপ বর্তমান আছে, আধুনিক বাংলা গল্প-উপন্যাস পড়লে অন্তত: সে কথা কিছুতেই মনে হওয়ার জো থাকে না। তথাকথিত ভালবাসার জীবনটাই যদি জীবনের একমাত্র সত্য রূপ হয়, নির্জ্ঞান মনের সুপ্ত কামনা-বাসনার তাগিদটাই যদি জীবনের সকল কর্মের নিয়ামক হয়, তা হলে মানুষ সংসারে এসে এত গঠনমূলক কাজ করে কী করে—লেখাপড়া শেখে কেমন করে, আপিস-আদালত করে কেমন করে, এত বিচিত্র দিকে তার নির্মাণশক্তিকে প্রয়োগ করে কী করে, জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প-সাহিত্যের চর্চায় ও আলোচনায় জীবনভোর কালাতিপাত করে কেমন করে? মানুষ সারা দিনমানের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অতিবাহিত করে কর্মজীবনে, এ ছাড়াও সংসারে টিকে থাকবার জন্য তাকে নানা উপায়ে শ্রম করতে হয়। এর ভিতর যৌন প্রশ্নের অবতারণার বা যৌন অনুভূতির অনুপ্রবেশের অবকাশ কতটুকু! আজকাল অবশ্য আপিসে-আদালতে কোন কোন জায়গায় স্ত্রী-পুরুষে একত্র কাজ করে। তাতে ক্ষেত্রবিশেষে জৈব আকর্ষণের সমস্যা উদিত হওয়া বিচিত্র নয়, তবে সাম্প্রতিক কথা-সাহিত্যিকেরা যে রকম ঢালাও ভাবে ও ফলাও করে তাঁদের গল্প উপন্যাসে এই বিষয়টিকে চিত্রিত করেন প্রকৃত পরিস্থিতি যে তার চেয়ে অনেক ভিন্ন, সে কথা নিশ্চয় করে বলা চলে। সব-কিছুকেই অতিরঞ্জিত, অতিকামনালিপ্ত করে তোলবার একটা ঝোঁক আমাদের লেখকদের মধ্যে আছে। সাহিত্যে মিথ্যার স্থান থাকলেও এ রকম প্রকাণ্ড মিথ্যায় সাহিত্যের অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গল হয় না। আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের স্তরে নিছক জীবন-সংগ্রামটাই এমন সুতীব্র আর প্রাণান্তকর, প্রত্যেকেরই উপর দায়দায়িত্বের চাপ এত বেশী যে, এই নীরন্ধ্র বাস্তবচেতনা আর কর্তব্যবুদ্ধির ফাঁকে অন্য কোনরূপ চিন্তা—অলস আর শিথিল আর বিভ্রম-জাগা'নয়া চিন্তা—মাথা গলাতে পারে বলে আমার

মনে হয় না। যদি কোথাও গলায়, তাকে সাধারণ অবস্থার ব্যতিক্রম মনে করা যেতে পারে, সত্য অবস্থা তা কখনও নয়।

এই কারণেই বোধ হয় সমাজতন্ত্রী কোন কোন দেশের সাহিত্যে আজকাল জীবন ও জীবিকার সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কবিবর্জিত প্রেমচিত্রণকে অবান্তর আর অসার মনোবিলাস মনে করা হয় এবং ওই-জাতীয় সাহিত্যসৃষ্টিকে জাতীয় অগ্রগতির পক্ষে ক্ষতিকর জ্ঞানে নিরুৎসাহ করা হয়। যে ভালবাসার আবেগের সঙ্গে কর্মজীবনের (পূর্ণবয়স্কের বেলায়) যোগ নেই, শিক্ষাজীবনের (ছাত্র-ছাত্রীর বেলায়) যোগ নেই, সে ভালবাসার মনস্তাত্ত্বিক খুঁটিনাটির চিত্রণ তো শুধু সময়ের অপব্যয় মাত্র। আমাদের সাহিত্যে 'ভারতী'র যুগে তদানীন্তন কথাকারেরা এক ধরনের ফাঁপা রোমান্টিক প্রেমের গল্প ফেঁদে পাঠক-চিত্তজয়ের চেষ্টা করতেন। তাঁদের গল্পোপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা চুটিয়ে প্রেম করত, কেন না তাদের হাতে অবসর ছিল অঢেল, পকেটে পয়সা ছিল প্রচুর। জমিদারির কাঁচা মুদ্রা, বাপের জমানো ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স কিংবা কলকাতার বাড়িভাড়ার অনায়াসলভ্য টাকা—এই তিনটি সুবিদিত সূত্র ছাড়া তাদের প্রেমের মাশুল যোগাবার মত পয়সা কোথা থেকে আসত তা মা-গঙ্গাই জানেন। সে সময়ে অবশ্য দেহবাদের এমন প্রচলন ছিল না, তবে মণীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা'য় যে-জাতীয় নমনীয়-কমনীয় ললিত-গলিত প্রেমের বর্ণনা আছে, সেই রোমান্টিক ভালবাসার সংস্কারটি বাংলা গল্প-উপন্যাসকারদের মনের আকাশে নিত্য ভেসে বেড়াত। জীবনের বাস্তবতা-বিবর্জিত সেই সাহিত্য-প্রয়াস যেমন সমর্থন করা যায় না, তেমনি একালের কথাকারদের লেখনীমুখে দেহবাদের আতিশয্যমণ্ডিত বর্ণনাও সমর্থন করা যায় না। ভারতীর যুগে ছিল বাস্তবচেতনার মর্মান্তিক দৈন্য, আর একালে দেখা দিয়েছে দেহবাদী চেতনার নিরঙ্কুশ প্রাধান্য। যেমন কল্লোল-আমলের লেখকদের লেখায় তেমনি একালীন কোন

কোন লেখকের লেখায়ও দেহবাদ ভিন্ন আর-সব বিষয় নির্মমভাবে উপেক্ষিত, প্রায়-অনুপস্থিত বললেও চলে। কর্মজীবনের সঙ্গে সম্পর্করহিত রোমান্টিকতার আদর্শ আর জীবনের অন্যান্য সকল দিক সম্পর্কে চেতনারহিত দেহবিলাসের মনোভাব খতিয়ে দেখতে গেলে একই পর্যায়ে পড়ে। দুটিই অশ্রদ্ধেয়, দুটিই সমান বর্জনীয়।

যে সকল লেখক নরনারীর জৈব কামনা-বাসনার দিকটার উপর অতিরিক্ত মনোযোগ আরোপ করেন তাঁদের মনোজীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাঁরা সকলেই অল্পবিস্তর ক্লেদরতির দাস। স্ত্রী পুরুষের অন্ধকার আকর্ষণের দিকটা ছাড়া তাদের সম্পর্কের আর কোন দিক তাঁদের উৎসাহিত করে না। দেহাতীত প্রেমের আনন্দের উপলব্ধি বা যুগ্মভাবে একই কর্মাদর্শের অনুসরণের মধ্য দিয়ে একজোড়া স্ত্রী-পুরুষের প্রেমানুভূতির চরিতার্থতার বোধ—এ সকল এই 'মবিড' লেখকদের ধারণার অতীত। প্রেমের তাঁরা শুধু একটি অভিব্যক্তিই বোঝেন—জৈব কামনার উদ্দীপন। অনেক সময় প্রেমেরও কোন প্রয়োজন হয় না, নিছক জান্তব ইচ্ছার সুখটিকেই তাঁরা সেরা সুখকামনারূপে চিত্রিত করেন। জীবনের আর-সব দিগন্ত তাঁদের চোখে অস্পষ্ট, শুধু একটি মাত্র দিগন্তের তাঁরা সন্ধান রাখেন—জীবনাকাশের ঈশান-কোণ, যেখানে কামনার ঝড়ে মাতামাতি বিপর্যয় লেগেই আছে। এই সব দেহবাদী লেখক দেহবাদের প্রতি নিষ্ঠায় এমনই নীবন্ধ্রভাবে সত্তী যে, দেহবাদ ছাড়া আর-কোন ভাবনা তাঁদের মগজে প্রবেশ করে না। সমাজকল্যাণে তাঁরা উৎসাহ পান না, নিসর্গচেতনা তাঁদের নিরুদ্যম রাখে, জীবন-সংগ্রামের কাহিনীকে তাঁরা অবাস্তর জ্ঞান করেন, আত্মিক আর আধ্যাত্মিক উন্নয়নপ্রচেষ্টার বর্ণনাকে তাঁরা গল্প-উপন্যাসের বহির্ভূত বিষয় বলে মনে করেন, আদর্শবাদী চরিত্র আঁকবার চিন্তামাত্রে তাঁদের গায়ে জ্বর আসে, রচনার ভিতর বলিষ্ঠ-ভাব বলিষ্ঠ কল্পনা সঞ্চারের প্রয়োজন সম্পর্কে মাথা ঘামাতে গিয়ে

তাঁদের কলম ঘেমে উঠে ;—শুধু একটিমাত্র বিষয়ে তাঁরা স্ফূর্তিময়, তাঁদের লেখনী অবাধ, তাঁদের কল্পনা মুক্তকচ্ছ। সেটি আর কিছু নয়—দেহবাদ। ওটি ওঁদের ষোল-আনা মনোমত বিষয়, যাকে বলে প্রাণের জিনিস। এই বিষয়টি পেলে তাঁরা আর কলম ছাড়তে চান না ; নরনারীর যৌন সম্পর্কের পিণ্ডি চটকিয়ে তবে তাঁরা বিশ্রাম লাভ করেন।

এর দ্বারা কী প্রমাণ হয় ?—প্রমাণ হয় এই কথাই যে, এই সব লেখকের মনোজীবন যথাযথভাবে বিকশিত হয় নি ; অনেক ব্যাপারেই তাঁরা এখনও বয়ঃসন্ধিকালের সীমানায় আটকে আছেন। বয়ঃসন্ধিকালীন কামনা-বাসনা, অর্ধসুপ্ত অর্ধস্ফুট প্রগল্ভ ইচ্ছার তাগিদ এখনও পর্যন্ত তাঁদের মনোজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে। জীবনের সমগ্রতার বোধ জীবনের বাস্তবতার বোধ তাঁদের মধ্যে এখনও জাগ্রত হয় নি। সংসারের কঠিনতার রূপ তাঁরা এখনও প্রত্যক্ষ করেন নি, প্রত্যক্ষ করলেও আতঙ্কে ভয়ে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে আছেন। জীবনের সর্বাঙ্গীণ সার্থকতার চেতনা অস্পষ্টভাবেও তাঁদের মধ্যে জাগ্রত হয় নি, তা যদি হত তা হলে তাঁরা নিরবচ্ছিন্ন দেহবাদ নিয়ে পড়ে থাকতেন না, তাঁদের শিল্পভাবনাকে জীবনের অপরাপর সমস্যার দিকেও সঞ্চালিত করতেন। বয়ঃসন্ধিকাল অতিশয় অপরিণত কাল। ওই কালোচিত মনন আর অনুভূতি আর কল্পনা নিয়ে যাঁরা সাহিত্যসেবায় অবতীর্ণ, বস্তুতঃ ওই যাঁদের মূল পুঁজি, তাঁদের হাতে সাহিত্যের এতটুকু শ্রীবৃদ্ধিও আশা করা যায় না।

মানুষের মনোজীবনের বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যাবে, তার দেহমনে যখন তারুণ্য-লক্ষণের সঞ্চার হয়, সে সমস্ত জগৎটাকে কেবলই প্রেমময় দেখে। আর সে প্রেমও পরিণত বোধবুদ্ধির উপলব্ধ প্রেম নয়, নিতান্তই ছেলেমানুষী প্রেম, যার ভিতর দেহজ বাসনাটাই সর্বাধিক বলবৎ। কিন্তু ধীরে ধীরে

এই একমুখীন আবিষ্টতার (obsession) অবসান ঘটে, বয়োবৃদ্ধির আর অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তার গ্রহণক্ষমতার প্রসার ঘটতে থাকে। একদা যে ব্যক্তি দেহচেতনা আর প্রেমচেতনা ছাড়া কিছু বুঝত না, সে সেই একমনস্কতার প্রভাব অতিক্রম করে জীবনের আরও পাঁচটা বিষয়ে সক্রিয় উৎসাহ অর্জন করে এবং বলাই বাহুল্য, সে সকল বিষয় কিছু তুচ্ছ বা অনাবশ্যক নয়। এই ভাবে যখন ক্রমে ক্রমে মনের বয়স বাড়ে, বিচারবুদ্ধি পরিণত হয়, জীবনের অভিজ্ঞতা দানা বাঁধে, তখন আর হালকা রোমান্সধর্মী উপন্যাস বা ক্লেদঘাঁটা গল্পপাঠে উৎসাহ থাকে না, বরং ও-জাতীয় রচনার প্রতি চিত্তের একটা প্রচণ্ড বিমুখতারই সৃষ্টি হয়। মানুষের জীবন আর-কিছু নয়, ওটি শুধু এক স্তরের অনুভূতিকে পশ্চাতে ফেলে অন্য স্তরের অনুভূতির জগতে প্রবেশ করা এবং এইভাবে ক্রমাগত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উত্তরোত্তর উচ্চতর মার্গে আরোহণ করা। জীবনের উন্নতি, ব্যক্তিত্বের বিকাশ এই প্রক্রিয়ার দ্বারাই সাধিত হয়, নয় তো মানুষে আর জড়পদার্থে কোন তফাত থাকত না। আজ যা ভাল লাগে, মনের পরিণতির সঙ্গে, মনের ভিতর জীবনের সর্বাঙ্গীণতার ধারণার উন্মেষের সঙ্গে কাল আর তা ভাল লাগে না। দেহবাদী গল্প-উপন্যাস পড়ে ছোকরা-পড়ুয়ারা এক ধরনের আনন্দ লাভ করে—তাও সেই আনন্দের স্বাদ অতিশয় কটু এবং কড়া—কিন্তু বয়স্ক পাঠকের নিকট তার কোন আবেদন নেই। বয়স্ক পাঠকের জগৎ নিছক দেহবাদে কেন্দ্রিত নয় বলে, তাঁর মনোযোগের কেন্দ্রে আরও পাঁচটা বিষয় (যার প্রত্যেকটিই মূল্যবান) স্থিত রয়েছে বলে, তিনি দেহবাদী রচনাকে নিছক বয়ঃসন্ধিকালসুলভ চাপল্যের অভিব্যক্তি ছাড়া আর-কিছু মনে করেন না। এ-জাতীয় রচনা এবং রচনাকারকে তিনি অক্লেশেই অস্বীকার করতে পারেন, করেও থাকেন।

যৌনানুভূতির বর্ণনামূলক রচনাপাঠে নবীনবয়সী পাঠকেরও

মনে যে খুব সুখ উপজাত হয় তা নয়। সে মনে ভাবে ওই-জাতীয় রচনাপাঠের দ্বারা সে আনন্দ আহরণ করছে, আসলে তার মনে তীব্র যন্ত্রণাসুখ-মিশ্রিত গরলপানের প্রতিক্রিয়া ছাড়া অন্য কোনরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে কৈশোরকালে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাস পাঠের অভিজ্ঞতা বিবৃত করেছেন এইভাবে—"চরিত্রহীন পড়িতে পড়িতে দেহে নূতন জাগরণ অনুভব করিলাম। এই উন্মেষ আনন্দদায়ক নয়, পীড়াদায়ক" (পৃ. ৪৯)। দেহবাদী রচনাপাঠে এই "নূতন জাগরণ", এই "পীড়াদায়ক উন্মেষ" যে-কোন নবীনবয়সী পাঠকেরই বিধিলিপি বলা চলে। এই নূতনের জাগরণের আকর্ষণ স্বীকারও করা যায় না আবার অস্বীকারও করা যায় না। এই দোটানার দ্বন্দ্বে পড়ে হতভাগ্য পাঠকের যে অবস্থা হয় তাকে সজনীকান্তের ভাষায় "অজগর-কবলিত হরিণে"র অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। হরিণ যেমন অজগর দ্বারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়েও একপ্রকার মূঢ় আকর্ষণবশে অজগরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, নবীনবয়সী পাঠকও সেইরূপ বিষনিঃসারী যৌন রচনার দ্বারা প্রতিহত হয়েও তার প্রতি কেমন একপ্রকার মূঢ় আকর্ষণ অনুভব করে। কিন্তু সান্ত্বনার কথা এই যে, এই মূঢ় আকর্ষণ অধিক দিন বলবৎ থাকে না। মনের দিগন্ত ক্রমশঃ যত প্রসারিত হয়, ওই আকর্ষণের নাগপাশও ক্রমশঃ তত সংকুচিত হয়ে আসতে থাকে, এক সময়ে তা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে। পাঠকের এই অবোধ আকর্ষণই হল সব রকম দেহবাদী রচনাকারের একমাত্র ভরসা। ওই অনিশ্চিত অথচ আপাতকার্যকর পুঁজির উপর নির্ভর করেই তাঁরা তাঁদের ব্যবসায় চালিয়ে যান। পাঠকের অনগ্রসরতা আর অপরিণত বোধবুদ্ধিতে তাঁদের সুবিধা, সুতরাং পাঠকের অনগ্রসরতা জীইয়ে রাখাতেই তাঁদের স্বার্থ নিহিত।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত পরিধির ভিতর যে সকল

কথাকার সত্যিকার সাফল্য ও খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের রচনারীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তাঁরা কেউ দেহবাদের কারবারী নন। রচনার মধ্যে দেহবাদী প্রসঙ্গকে সযত্নে এড়িয়ে চলতেই যেন তাঁরা ভালবাসেন। রচনার প্রয়োজনে যেখানে দেহবাদী বিষয়ের উপর মনোযোগ স্থাপন ভিন্ন গত্যন্তর নেই সেখানেও তাঁরা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনা প্রভৃতি সুপরিজ্ঞাত শিল্প-কৌশলের মাধ্যমে সেই অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করেন। শালীনতা-শোভনতার গণ্ডী তাঁরা কোনক্রমেই অতিক্রম করেন না। আত্ম-আরোপিত সংযমের নির্দেশ লঙ্ঘন করেন না। এ মন্তব্য আমরা ৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বনফুল', প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অমলা দেবী, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, অমরেন্দ্র ঘোষ, বিমল মিত্র, দীপক চৌধুরী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, সুশীল রায় প্রমুখ প্রবীণ-অপ্রবীণ খ্যাতনামা কথাকার সকলের সম্পর্কেই অল্পবিস্তর প্রয়োগ করতে পারি। দেহবাদের প্রতি তাঁদের বিরূপ মনোভাব প্রকট।

খ্যাতনামাদের মধ্যে এ মন্তব্যের একমাত্র ব্যতিক্রম ৺মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্নদাশঙ্কর রায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা অন্নদাশঙ্করের দেহবাদের আমরা সমর্থক নই; কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে, অন্য দিক দিয়ে তাঁদের খ্যাতির সুদৃঢ় ভিত্তি আছে। নিছক দেহবাদের খাতিরে দেহবাদের প্রশ্রয় এঁরা দেন নি, এঁদের বিষয়বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দেহবাদের সম্পর্ক আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটা বিশেষ মতবাদের আশ্রয়ী হয়ে দেহবাদ প্রচার করেছেন; অন্য পক্ষে অন্নদাশঙ্কর ব্যক্তি-স্বাধীনতা আর ব্যক্তিমুক্তির আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে কখনও কখনও দেহবাদী বর্ণনার অভিমুখে ঝুঁকেছেন। নিছক ক্লেদরতির জন্য ক্লেদ ঘাঁটায় এঁদের দুজনের কারুরই উৎসাহ নেই। দুজনেই

এঁরা চিন্তাশীল, জীবনজিজ্ঞাসাসম্পন্ন লেখক। প্রজ্ঞা ও প্রমা এঁদের মধ্যে সহজাত। সুতরাং বিচারবিবেচনাহীন দেহবাদে যে এঁরা প্রমত্ত হতে পারেন না সে কথা বোঝা কঠিন নয়।

অন্য পক্ষে এমন কিছু কিছু আধুনিক পন্থী কথা-সাহিত্যিক আছেন যাঁরা দেহবাদের জন্যই দেহবাদী রচনার প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শনের দোষে দোষী। এই সব লেখকের জীবনজিজ্ঞাসার কোন বালাই নেই, সে বিষয়ে বিশেষ ধারণাও তাঁদের নেই। শুধু অপরিণতমনা পাঠকসম্প্রদায়ের যৌনানুভূতিতে সুড়সুড়ি দিয়ে কী করে সস্তায় নাম কেনা যায়, দু পয়সা ঘরে তোলা যায় সেই বিদ্যাটিতেই এঁরা দিনের পর দিন হাত পাকিয়ে চলেছেন। দেহবাদী প্রসঙ্গ অবতারণার যেখানে ন্যূনতম উপলক্ষও নেই সেখানেও এঁরা জোর করে দেহবাদী প্রসঙ্গ ঢুকিয়ে বসে থাকেন ; উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, ওই সুযোগে ছোকরা পড়ুয়াদের কাঁচা মাথায় কিঞ্চিৎ বিভ্রম সৃষ্টি করা এবং "অজগর-কবলিত হরিণে"র মত তাদের নিজেদের রচনার অভিমুখে আরও সবলে আকর্ষণ করা। ব্যবসায়িক মুনাফার প্রবৃত্তির দ্বারা এঁরা পদে পদে চালিত হন, এঁদের শিল্পানুরাগ নিছক কথার কথা। এই লেখকগুলিকে সমস্বার্থবদ্ধ একটি সমপ্রাণ গোষ্ঠী বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। পোর্নোগ্রাফিমার্কা কড়া যৌন সাহিত্যের প্রচারকদের মধ্যে যেমন পাঠকরূপী শিকার ধরবার একটা উগ্র প্রবণতা থাকে, সাহিত্যসৃষ্টির তবকমোড়া দেহবাদ প্রচারে এঁদের মধ্যে ততটা উগ্র আর প্রত্যক্ষ অভিপ্রায় ক্রিয়াশীল না থাকলেও অর্ধজ্ঞাতসারে তাঁরা তাঁদের সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে সূক্ষ্মভাবে ওই প্রবণতারই পোষকতা করেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না। তাঁদের মনের অন্তরালে সূক্ষ্মভাবে এই অভিপ্রায় কাজ করে বলেই তাঁরা রচনার যত্র-তত্র দেহবাদী বর্ণনা ঢোকাতে ইতস্তত: করেন না। যেখানে বিষয়ের প্রয়োজনে দেহবাদের অবতারণা অপরিহার্য সেখানে সে জিনিসের সার্থকতা একপ্রকার

বোঝা যায়, কিন্তু অসতর্ক পাঠককে কাবু করবার উদ্দেশ্যে যেখানে সেখানে দেহবাদী বর্ণনার ফাঁদ পাতা—এ জিনিস আমরা ঠিক বুঝি না। অথচ এই অনুচিত শিকারী মনোভাবই এখন ব্যাপক ও ভয়াবহ আকারে কথা-সাহিত্যে সুপ্রকট হতে চলেছে। যাঁদের কথা বলা হল তাঁদের রচনা থেকে উপযুক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা আমার অভিযোগ আমি অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতুম, কিন্তু ওই-সব জঞ্জাল ঘাঁটতে গিয়ে আমার কলমের কালো কালি লজ্জায় লাল হয়ে উঠতে পারে আশঙ্কায় সেই অবাঞ্ছিত প্রচেষ্টা থেকে বিরত রইলুম। আর যাই হোক, ক্ষতিকর সাহিত্যপ্রচারে সহায়তা করতে বর্তমান লেখক আদৌ রাজী নন।

পরিশেষে 'দেহবাদ' কথাটি সম্পর্কে একটি ছোট্ট 'নোট' যোগ করতে চাই। আমি ইচ্ছা করেই 'যৌনতা' কথাটির ব্যবহারে নিবৃত্ত রয়েছি, কেন না ওই 'যৌনতা' বা অনুরূপ ধ্বনিবাচক সমার্থক শব্দগুলির মধ্য দিয়েও যেন কেমন একপ্রকারের যৌনানুভূতির বিকিরণ ঘটতে থাকে। 'দেহবিলাসী' বিশেষণটি ব্যবহারের কথা একবার মনে হয়েছিল, কিন্তু সেটি একটি বিশেষ অরুচিকর শব্দের পুংলিঙ্গবাচক অভিধা বিধায় পরবর্তী বিবেচনায় তাকে অগ্রাহ্য করতে হল। আপাততঃ 'দেহবাদী' কথাটাই আমার সর্বাধিক মনঃপূত।

কথা-সাহিত্য ও দেহবাদ

২

'কথা-সাহিত্য ও দেহবাদ' শীর্ষক আলোচনার প্রতিক্রিয়ামুখে কোন কোন মহলে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত রকমের উষ্মা ও প্রতিকূল মনোভাবের সঞ্চার হয়েছে। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য এখানে বলা দরকার, কারও মনে উষ্মা বা বৈরিভাব সঞ্চারের উদ্দেশ্যে ওই নিবন্ধটি রচিত হয় নি, কাউকে ব্যথা দেওয়াও লেখকের অভিপ্রায় ছিল না; শুধু নিরবচ্ছিন্ন বন্ধুতার মনোভাববশতঃ সংশ্লিষ্ট লেখকদের মধ্যে আত্মানুসন্ধানের প্রবৃত্তি উদ্রেকের চেষ্টায় কতকগুলি আপাত-অপ্রিয় মন্তব্যপ্রকাশের ঝুঁকি নেওয়া হয়েছিল। লেখকগণ সমালোচকের অভিপ্রায়কে ভুল বুঝেছেন, সুতরাং বর্তমান নিবন্ধে পুরাতন প্রসঙ্গের জের টেনে আমার বক্তব্যকে আরও একটু পরিস্ফুট করে তোলবার চেষ্টা করব, যাতে ভুল বোঝাবুঝির অন্ততঃ অবসান হয়।

দেহবাদী বিষয় মাত্রই অশ্রদ্ধেয় নয়। কে কী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ওই বিষয়টির বিশ্লেষণ করেন তারই উপর নির্ভর করে সেই বিষয়ের অবতারণার ঔচিত্যানৌচিত্য। উদ্দেশ্যের দ্বারা বক্তব্য বিষয়ের ভাল-মন্দের বিচার করতে হবে। উদ্দেশ্য যেখানে সৎ, সেখানে মানবচরিত্রের যথাযথ পরিস্ফুটনের পক্ষে যদি দেহবাদী প্রসঙ্গের অবতারণা কিছু-পরিমাণে অপরিহার্য হয় তা হলে সে-জাতীয় অবতারণায় বোধ হয় তেমন কিছু দোষ বর্তায় না। তবে সেখানেও কথা আছে। জীবনের বাস্তব চিত্র আঁকবার নামে দেহবাদী বিষয়ের বর্ণনায় শালীনতা ও শোভনতার সীমা কোনক্রমেই লঙ্ঘন করা চলে না। সভ্যতার ক্রমিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শব্দপ্রয়োগ আর বাক্যব্যবহারের সংস্কারেরও ক্রমিক বিবর্তন হচ্ছে। পঞ্চাশ

বছর বা একশো বছর আগে যে শব্দ অবাধে উচ্চারণ বা শ্রবণ করা যেত, আজ হয়তো সে শব্দ উচ্চারণমাত্রে তার ধ্বনি কানে চকিতে বিসদৃশ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ রকম ঘটে এই কারণে যে, ইতোমধ্যে রুচির ক্রমাগত সম্মার্জনের দ্বারা অনেক শ্রুতিগত অভ্যাসের স্থূলতাকে পিছনে ফেলে আমরা সম্মুখপথে এগিয়ে গেছি। এখন আর পুরাতন দিনের রুচি কিংবা শব্দ-ব্যবহারের সংস্কার আঁকড়ে ধরে থাকবার জো নেই, কেন না, মধ্যভাগে অনেকটা সময় অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে সেগুলি বাতিল হয়ে গিয়েছে। ভারতচন্দ্রের আদিরস, কবিয়ালদের স্থূলতা কিংবা দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র বাস্তবালেখ্য যতই লেখনীর আর জিহ্বার মুনশীয়ানাপ্রসূত হোক, আজ সে সকল আদর্শ সাহিত্যে অচল। যে সকল লেখক বাস্তবের নিখুঁত ছবি ফোটাবার অছিলায় শব্দপ্রয়োগে ও বাক্যব্যবহারে পুরাতন দিনের ন্যায় নিঃসঙ্কোচ স্পষ্টতার আশ্রয় নিচ্ছেন, তাঁরা এ যুগের উন্নত রুচির অনুসরণ করছেন না, বিগতকালীন অমার্জিত অভ্যাসটিরই দাসত্ব করছেন মাত্র। ঘড়ির কাঁটা পিছন দিকে ঘুরিয়ে ঘড়িকেই বিকল করার সর্বনাশা উৎসাহ থেকে লেখকদের প্রতিনিবৃত্ত হওয়া উচিত।

দেহবাদী বিষয়ের বর্ণনায় ব্যঞ্জনার আশ্রয় নিলে একালীন উন্নতরুচির আদর্শকে মেনে নেওয়া হয় অথচ বিষয়ের যাথাযথ্যেরও কোন হানি হয় না। ইঙ্গিত এবং সংকেতের দ্বারা যেখানে অনেক-কিছু বোঝানো চলে, সেখানে স্থূল ভাষার আশ্রয়ী হয়ে সব-কিছুকে নিরাবরণ স্পষ্টতার মধ্যে মেলে ধরাতে না আছে শিল্প না আছে সুরুচির পরিচয়। মাতৃত্ব একটি মহান্ বিষয়। যুগ যুগ ধরে কবি শিল্পী সাহিত্যিক হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগ ঢেলে দিয়ে মাতৃত্বের বন্দনা করেছেন। আজ যদি কোন কথা-সাহিত্যিক সেই গৌরবান্বিত ঐতিহ্যের সংযম ভুলে গিয়ে বাস্তব-

নিষ্ঠার অজুহাতে নারীর মাতৃত্ববিকাশের প্রতিটি স্তর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করতে শুরু করেন, তাতে বাস্তবসঙ্গতি প্রকাশ পায় না, প্রকাশ পায় খুঁটিনাটি-পরায়ণতা, রুচির অপকৃষ্টতা। এর দ্বারা বিষয়ের কৌলীন্যের অমর্যাদা ঘটানো হয়। আজ-কাল মানুষের জৈব অস্তিত্বের সত্যের উপর জোর দেবার জন্য এমন অনেক বিষয়কে সাহিত্যের পাতায় আমদানি করা হয়, যা এতকাল সাহিত্যে উল্লেখের অযোগ্য ছিল। ফরাসী রিয়ালিস্ট ধারার কথা-সাহিত্যিকগণ এবং সার্তর্ প্রমুখ অস্তিত্ববাদী দর্শনের ভ্যাজাল-মেশানো তাঁদের উত্তরসাধকগণ যে ধারায় গল্প-উপন্যাস লিখেছেন ও লিখছেন তাতে এক দিকে যেমন মানুষেব স্থূল জৈব অস্তিত্বের খুঁটিনাটিকে নগ্নভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, অন্য দিকে তেমনই মানুষের সযত্নলালিত অনেক মূল্যবোধকে ওই প্রক্রিয়ার দ্বারাই সজ্ঞানতঃ ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এক এক সময় মনে হয়, মানব-জীবনের গভীর-গম্ভীর মহিমান্বিত রূপটিকে বিদ্রূপ করবার জন্যই যেন ফরাসী রিয়ালিস্ট লেখকগণ অধিকমাত্রায় বাস্তবতার প্রতি ঝুঁকেছিলেন। আমাদের বর্তমান সাহিত্যের লেখকদের মধ্যে যাঁরা বাস্তবতার আদর্শটিকে গ্রহণ করেছেন তাঁদের ওই প্রয়াসের মধ্যে একই প্রকারের অনুচিত মনোভাব সক্রিয় রয়েছে মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে।

কিন্তু বাস্তববাদ তথা দেহবাদ প্রসঙ্গে এ কথা আমাদের নিয়ত স্মরণ রাখলে ভাল হয় যে, মানুষের জীবনের স্থূল এবং আত্মিক যে দুটি দিক আছে তাদের দুয়ের প্রতিই আমাদের মনোযোগপরায়ণ হওয়ার অবকাশ থাকলেও উভয়ের আলোচনা এক ক্ষেত্রে হতে পারে না, দুয়েরই নিজ নিজ ক্ষেত্র আছে। সাহিত্যে মানুষের আত্মিক জীবনের চিত্রটাই মূলতঃ রূপায়িত হয়, সংসারজীবন রয়েছে মানুষের স্থূল জৈব অস্তিত্বের দাবিগুলির প্রতি অবহিত হওয়ার জন্য। এই দুইকে একত্র মিশিয়ে ফেললে

ক্ষেত্রাক্ষেত্র-বিচার থাকে না, সংসারের স্থূল বাস্তবতার সঙ্গে সাহিত্যের সূক্ষ্ম বাস্তবতাকে অন্যায়ভাবে গুলিয়ে ফেলা হয়। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস পড়ে যে সুমিতবাক্ সংযত-সুন্দর চরিত্রের ধারণা আমরা সুচরিতার মধ্য দিয়ে পাই, কিংবা 'শেষের কবিতার' লাবণ্য আমাদের মনের পটে যে গভীর-গম্ভীর অথচ আবেগঋদ্ধ মানুষটির আলেখ্য ফুটিয়ে তোলে, সেই চিত্ররূপায়ণের সঙ্গে যদি স্থূল বাস্তবের খাদ এসে মিশত তা হলে দুটি চরিত্রেরই সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যেত। সুচরিতা কী কী খেতে ভালবাসে বা লাবণ্য নাক ডাকিয়ে ঘুমায় কি না (অনেক রকমের জৈব স্থূলতার মধ্যে দুটি ন্যূনতম স্থূলতার উদাহরণ নেওয়া হল) সে কথা আভাসেও যদি রচনার ভিতর বলা হত তা হলেই রচনার সুর নেমে যেত। এমন পরিণামের কথা কোন বড় শিল্পী কল্পনাও করতে পারেন না। তাঁর সহজাত শিল্পবুদ্ধিই তাঁকে দেহবাদী প্রসঙ্গের স্থূল অবতারণা থেকে শতহস্ত দূরে রাখে।

শিল্পীর শিল্পবুদ্ধি বলতে আমরা যে জিনিস বুঝি তার একটি প্রধান কথাই হল, সংসারের বাস্তব থেকে শিল্পের বাস্তবকে পৃথকীকরণের ক্ষমতা। শিল্পীর পরিমিতিবোধ, সংযমের ধারণা এই সূত্র থেকেই প্রধানতঃ আহৃত হয়। কোন লেখক যখন বাস্তবসঙ্গতির আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাপ্রকাশের অজুহাতে ফলাও করে দেহবাদী প্রসঙ্গের খুঁটিনাটি বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন, বুঝতে হবে, মানব-জীবনের বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গ অস্তিত্বের প্রভেদ সম্পর্কে তিনি সম্যক্ সচেতন নন। তিনি বহিরঙ্গের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে জীবনের আত্মিক রূপের প্রতি তাঁর অচেতনতাকেই প্রকারান্তরে প্রকাশ করেন মাত্র। মানুষ রূপমোহের অধীন, তার ভিতর জৈব কামনা-বাসনার প্রবলতা আছে এ কথা খুবই সত্য, এই প্রবলতা সময় সময় মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাও সমান সত্য ; কিন্তু কেবলমাত্র এই কামজ

আকর্ষণের বিষয়টিই সাহিত্যের উপজীব্যরূপে গণ্য হতে পারে না, হলেও তা কোনকালেই মহৎ সাহিত্যের কোঠায় উত্তীর্ণ হবে না। তার কারণ, এই চিত্রণের মধ্যে সংসারের বাস্তবকে অতিক্রমণের কোন ইঙ্গিত নেই; এ জিনিস আমাদের সংসারের সীমাতেই আবদ্ধ করে রাখে, আমাদের সামনে কোন বৃহত্তর, মহত্তর পটভূমির আভাস বয়ে নিয়ে আসে না। রূপজ বাসনার অদম্যতার চিত্রণেরও আবার প্রকারভেদ আছে। প্রাচীন ও বিগতকালীন লেখকেরা এই অদম্যতাকে একটা ফ্যাক্ট হিসাবে মাত্র প্রতিষ্ঠা করতেন, তার খুঁটিনাটি বর্ণনায় সময়ক্ষেপ করতেন না। কিন্তু আজকালকার এক শ্রেণীর লেখকদের ধরন তা নয়। তাঁরা খুঁটিনাটি বর্ণনাকে বাস্তবতার নিদর্শনজ্ঞানে তাঁদের রচনায় চূড়ান্ত খুঁটিনাটি-প্রিয়তার পরিচয় দেন। এতে যে তাঁদের লেখার সুর নেমে যায় সে খেয়াল তাঁদের থাকে না। সমগ্র আধুনিক সাহিত্যের অভিশাপই হচ্ছে খুঁটিনাটির প্রতি এই আত্যন্তিক মনোযোগ। শুধু আমাদের সাহিত্যে কেন, পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্যে মানবচিত্ররূপায়ণে এই খুঁটিনাটি-মনস্কতা ক্রমাগত প্রশ্রয় পাচ্ছে। দেহবাদী বর্ণনায় তো বটেই, দেহবাদী প্রসঙ্গেতর বিষয়েও খুঁটিনাটির প্রতি উৎসাহের আতিশয্য লক্ষণীয়। ফলে সাহিত্য আর সংবাদপত্রের রিপোর্টে কোন তফাত থাকছে না। সংশ্লেষণে লেখকদের মন নেই, কেবল বিশ্লেষণ আর বিশ্লেষণ। ব্যবচ্ছেদ-ক্রিয়াটাই যেন লেখকের একমাত্র ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনস্তত্ত্ব-বিদ্যার পরিধির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে এত বেশী মনস্তত্ত্ব কচলানো হচ্ছে যে, সাহিত্যপাঠে আর রস পাওয়া যাচ্ছে না। মনস্তত্ত্ব নামেই মনস্তত্ত্ব, আসলে সেটি দেহতত্ত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। বস্তুর বিবর্তনের ফলে মনের জন্ম—এই জ্ঞান আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক লেখকদের বিলক্ষণ টনটনে, কাজেই যখনই তাঁরা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে নিরত হন, ঘুরে ফিরে তাঁদের কেবলই দেহের

সীমানায় ঘুরঘুর করতে দেখা যায়। আমাদের এক শ্রেণীর মধ্যযুগীয় সাধকদের মত এই-সব একালীন লেখক দেহতত্ত্বকেই জীবনের সার বলে জেনেছেন। তবে সহজিয়াদের দেহতত্ত্ব থেকে এ দেহতত্ত্বের জাত একেবারেই আলাদা। প্রভেদটি এত স্থূল আর স্পষ্ট যে এ নিয়ে অধিক বাগ্‌বিস্তারের আবশ্যকতা আছে বলে মনে করি না।

বড় বড় লেখকদের লেখায় দেহবাদ আছে এই যুক্তিতে ক্ষুদ্রপ্রাণ লেখকেরা তাঁদের ক্ষুদ্রশক্তিপ্রসূত দেহবাদকে সমর্থনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, প্রথমোক্ত লেখকগণ কেউই দেহবাদসর্বস্ব লেখক নন। তাঁদের রচনার সুবৃহৎ পরিকল্পনার মধ্যে দেহবাদ একটি অংশ মাত্র অধিকার করে আছে। জীবনের সামগ্রিকতাকে ফোটাবার জন্য যেটুকু দেহবাদের চিত্রণ অত্যাবশ্যক, তাঁদের চোখে ঠিক ততটাই সে বিষয়ের মর্যাদা। তাঁরা এই বিষয়কে বর্জনও করেন না, তাকে অনুপাত-অতিরিক্ত প্রাধান্যও দেন না। দেহবাদ তাঁদের সামগ্রিক শিল্প-পরিকল্পনার অংশ ও অধীন সীমিত বিষয়মাত্র ; এখনকার এক শ্রেণীর লেখকদের মত সে জিনিস তাঁদের গোটা সাহিত্যের স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জুড়ে নেই। তা ছাড়া তাঁদের লক্ষ্যও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পাঠকের কামনাবৃত্তিতে সুড়সুড়ি দেবার জন্য তাঁরা দেহবাদী প্রসঙ্গের অবতারণা করেন না ; তাঁরা যে উঁচু পর্দায় তাঁদের রচনার সুর বাঁধেন, সেই উঁচু ঘাঁটের পর্দার সঙ্গে সামঞ্জস্য না ঘটানো পর্যন্ত তাঁরা দেহবাদী বিষয়ের বর্ণনার আশ্রয় নেন না। অন্যান্য মুখ্য বিষয় এবং দেহবাদ মিলে তাঁদের রচনা একটি প্রকাণ্ড সুরসঙ্গতি। এ সঙ্গতির মধ্যে একটিও বেমিল স্বর নেই। উপন্যাস মানব-জীবনের চিত্রণ, নিসর্গ-কাব্য নয়। তা তত্ত্বদর্শনের আলোচনাও নয়। মানুষই যখন উপন্যাসের মুখ্য কথা এবং কামবাসনা যখন মানুষের জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তখন মানবীয় চিত্রণে দেহবাদের

স্থান থাকবে বইকি। কিন্তু সেই নজিরে তাঁরা কখনও দেহবাদকে সর্বগ্রাসী হতে দেন নি। রচনার পরিকল্পনার ভিতর তার যথাযথ স্থান নির্দেশ করে তাঁরা তাকে উপযুক্ত হস্তে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করেছেন। তাঁদের লক্ষ্যের প্রকৃতির দ্বারা তাঁদের দেহবাদের প্রকৃতি নিয়ামিত হয়েছে। ভাষাব্যবহারে তাঁরা কোথাও সংযমের বল্গা উন্মুক্ত করে দেন নি, ব্যঞ্জনাশ্রয়ী লিপিনৈপুণ্যের দ্বারা তাঁরা তাঁদের বক্তব্যকে অধিকতর ফলপ্রদভাবে পরিস্ফুট করেছেন। টলস্টয়, রলাঁ, আনাতোল ফ্রাঁস, গলসোয়ার্দি, টমাস মান, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর প্রমুখ লেখকগণ সকলেই এ কথার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথ শেষের দিকের লেখায় দেহবাদী বিষয়ের প্রতি ঝুঁকেছিলেন, কিন্তু তাঁর দেহবাদের জাত আলাদা। তিনি কোথাও বাস্তবতাচর্চার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেন নি। কঠিন সংযমের শাসনের দ্বারা তিনি চরিত্রগুলির কামজ আকর্ষণের উদ্দামতাকে প্রতিপদে প্রহত করেছেন। চতুরঙ্গের নায়িকা দামিনীর মধ্যে কামেব প্রবলতা দেখানো হয়েছে, কিন্তু সেই প্রাবল্যের বেগের কী অসাধারণ সংকেতধর্মী গূঢ় অভিব্যঞ্জনা। সন্দীপের প্রতি বিমলার প্রবল জৈব আকর্ষণের চিত্রণের মধ্যে এতটুকু অশালীনতার পরিচয় পাওয়া যায় না। এখনকার অধিকাংশ দেহবাদী লেখা পড়লেই মনের মধ্যে ঘিনঘিনে ভাবের উদয় হয়; কিন্তু যোগাযোগ উপন্যাসে কুমু ও শ্যামার দোটানায় ক্ষতবিক্ষত, জৈব আকাঙ্ক্ষার দ্বারা তাড়িত বেচারা মধুসূদনের কামজীবনের যে ছবি পাওয়া যায়, কই, তাতে তো মনে কোন অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না। রচনাভঙ্গীর পার্থক্যেই প্রতিক্রিয়ার এই পার্থক্য। ঠিক একই কথা আমরা দুই বোন আর মালঞ্চ উপন্যাস সম্পর্কে বলতে পারি। এখনকার কোন ঔপন্যাসিককে যদি পুরুষচিত্তে শর্মিলা আর উর্মিমালা, সরলা আর নীরজার দ্বন্দ্ব দেখাতে হয়, তা হলে তাঁরা অবধারিত,

দেহবাদের চূড়ান্ত করে ছাড়বেন। বড়-ছোটয় এইখানেই তফাত।

কেউ কেউ সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাক্-ব্রিটিশ বাংলা সাহিত্যের উদাহরণ উদ্ধার করে দেহবাদকে সমর্থনের চেষ্টা করেন। দেহবাদের অনুকূলে এটি একটি যুক্তি বটে ; কিন্তু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, এই যুক্তির মধ্যে মস্ত একটা ফাঁক আছে। পুরাতন কবিরা তাঁদের কাব্যে আদিরসের সোৎসাহ বর্ণনা করে গেছেন বটে, কিন্তু সে বর্ণনা আর এখনকার কালের বর্ণনায় তফাত আছে। পুরাতন বর্ণনা ধ্বনিময়, শব্দঝঙ্কৃত, ইন্দ্রিয়গত হলেও সুছন্দের প্রয়োগে অতীন্দ্রিয় রসের আভাসদানকারী ; আর এখনকার দেহবাদী বর্ণনা ভাষা-প্রয়োগের স্থূলতার জন্য, ধ্বনিরিক্ততার জন্য, শব্দের মামুলীত্বের জন্য মনে স্থূলরসের অতিরিক্ত কোন রসই বহন করে আনে না। সাহিত্যচর্চা এক হিসাবে শব্দচর্চা ছাড়া আর কিছুই নয়। শব্দ ব্যবহারের নৈপুণ্যের তারতম্যের দ্বারাই সাহিত্যসৃষ্টির নৈপুণ্যের তারতম্য প্রধানতঃ নির্ণীত হয়ে থাকে। আধুনিক কালে সমালোচক-দের মধ্যে একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, যাঁরা শব্দ ও ভাষার মানদণ্ডের দ্বারা সাহিত্যসৃষ্টির উৎকর্ষাপকর্ষ মূলতঃ বিচার করেন। ভাবের মৌলিকতা বা আন্তরিকতা যাচাই করতে হলেও আমাদের ওই শব্দেরই শরণ নিতে হবে, কেন না ভাব শব্দের মধ্যেই রূপ পায়, নিরালম্ব হয়ে থাকতে পারে না। এখন শব্দ যদি সাহিত্যে বিচারের একটি প্রধান মাপকাঠি হয়, তা হলেই দেখা যাবে ওই শব্দব্যবহারের বৈশিষ্ট্যহেতু কিংবা তদভাবে যত-কিছু পার্থক্যের সৃষ্টি। সংস্কৃত কবিরা যে শব্দসমবায়ের দ্বারা আদিরস ফোটাতেন, সেই শব্দের সমাহারের মধ্যেই এমন একটা ধ্বনিগত ব্যঞ্জনা আছে যা নিছক ইন্দ্রিয়গত বক্তব্যকে অতিক্রম করে অন্য-কিছু প্রকাশ করত। এখনকার ভাষায় তা হয় না। আর হয় না বলেই আতিশয্যমণ্ডিত আধুনিক দেহবাদী বর্ণনা মনের ভিতর গ্লানিবোধের

সঞ্চার ছাড়া আর কিছুর সঞ্চার করতে পারে না। যদি বলেন—এর জন্য লেখকদের দায়ী করা উচিত হয় না, আধুনিক ভাষার দৈন্যই এইজন্য দায়ী; তা হলে বলব, আধুনিক ভাষার এই ধ্বনিরিক্ততা ও স্থূলতা আধুনিক মনের দৈন্যেরই প্রকাশ। অতিরিক্ত বাস্তবমুখীনতার ফলে ভাষায় ধ্বনির এই বিকার না ঘটেই পারে না। এই-যে বস্তির ভাষার অনুকূলে আর দেহবাদী প্রসঙ্গের অবতারণার অনুকূলে আজকাল কোন কোন সমালোচককে লেখনী ধারণ করতে দেখতে পাই, তার মূলে রয়েছে সংশ্লিষ্ট সমালোচকদের ধ্বনি সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব। ভাষার ধ্বনির সম্পদ আর গাম্ভীর্য সম্বন্ধে এঁরা যদি উপযুক্ত-মাত্রায় অবহিত হতেন তা হলে এমন উৎসাহের সঙ্গে বোধ হয় দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে ভাষা, খিস্তির ভাষা আর দেহগন্ধী ভাষার সপক্ষে মত প্রকাশ করতে পারতেন না। শুনতে পাই যৌন বিষয়ের অসঙ্কোচ প্রকাশের মধ্যে নাকি প্রাণশক্তির দ্যোতনা রয়েছে, সংস্কারমুক্তির মনোভাব ক্রিয়াশীল রয়েছে। কিন্তু এ কী ধরনের প্রাণশক্তির, কী ধরনের সংস্কারমুক্ত মনের অভিব্যক্তি বুঝতে পারি না, যা কেবলই মনকে দেহচেতনার সীমায় আবদ্ধ করে রাখে? পুনরায় বলি, সংসার-জীবনের সীমায় জৈব অস্তিত্বের দাবিগুলির প্রতি অবহিত না হয়ে উপায় নেই, কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের পরিসরের মধ্যে সেই দাবিগুলিকে স্থূল এবং নগ্নভাবে ঘোষণা করার সার্থকতা বোঝা যায় না। সেখানে ইঙ্গিতে সংকেতে ব্যঞ্জনায় ও আংশিক অর্থব্যক্তির দ্বারা কাজ সারাটাই নিয়ম। বাচ্যার্থ অপেক্ষা সেখানে ব্যঙ্গ্যার্থের মূল্য বেশী, সুতরাং বাচ্যার্থের প্রয়োজনও সেখানে তদনুপাতে খর্ব। সাহিত্যশিল্প, খতিয়ে দেখতে গেলে, নিরন্তর ও একটানা ধারাবাহিক অনুশীলনের দ্বারা ভাষার সম্মার্জনার শিল্প বই কিছু নয়। বহু শব্দ যে পুরাতন বলে পরিত্যক্ত হয়, তার স্থলে নূতন শব্দের উদ্ভব হয়, তার অর্থই

হচ্ছে স্থূল হতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হতে আরও সূক্ষ্ম, অর্থময়তার পথে শব্দের বিবর্তন। এক সময়ে 'মাগ', 'ভাতার', 'ছাওয়াল', 'পোলা', 'পিরিত', 'আশনাই', 'নাগর', 'বেবুশ্যে' ইত্যাদি এবং অনুরূপ অন্যান্য শব্দ বাংলা ভাষায় হামেশা ব্যবহার করা হত; এখনকার রুচিবান লেখক বাস্তবতা আর প্রাণবস্তুতার খাতিরেও বোধ হয় এ সব শব্দ ব্যবহার করতে আর রাজী নন। এ সব শব্দ ব্যবহার করবার পথে লেখকের রুচির বাধাটাই হল প্রধান বাধা। বাস্তবতার দ্বারা এই শব্দগুলি সমর্থিত হলেও লেখকের পরিশীলিত শ্রুতির অভ্যাস সেগুলির ব্যবহারে সায় দেয় না। শব্দের ধ্বনি সম্বন্ধে এক ধরনের গভীর স্পর্শালুতার জন্যই রুচির এই বাধা, এবং মনের ওই স্পর্শালুতা যে দুদিন-একদিনে সৃষ্টি হয় নি, কালক্রমে ক্রমশ পরিপুষ্ট হয়েছে, তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

আর তা ছাড়া, সংস্কৃত সাহিত্যে ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে দেহবাদ রয়েছে বলেই এখনকার কালের সাহিত্যেও সেই ধারা অবিকৃতভাবে অনুসরণ করতে হবে এমন কোন কথা নেই। পুরাতন সাহিত্যের নজির উদ্ধার করে এখনকার কালের সাহিত্যিক অমিতাচারকে সমর্থন-চেষ্টার মধ্যে পুরাতনপ্রীতির হয়তো প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে সাহিত্যের অগ্রগতির তত্ত্বে বিশ্বাস সূচিত হয় না। নজিরের প্রতি এক ধরনের অন্ধ মোহ প্রায়শঃ মানুষের সংস্কার-প্রয়াসকে ব্যাহত করে, এমন নজিরের অভাব নেই। সর্বপ্রকার অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়ই হল নজির। পুরাতনবাদীদের হস্তে এটি একটি বড় অস্ত্র। আগে এ জিনিস হয়েছে, সুতরাং এখনও এ জিনিস চলবে না কেন—এই হচ্ছে এঁদের প্রধান যুক্তি। কিন্তু এঁদের এই যুক্তি নিরস্ত করবার জন্য এঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, সাহিত্যের এলাকা মামলা-মোকদ্দমার এজলাস নয় যে এখানে নজির (precedent) উদ্ধার করতে পারলেই কাজ অর্ধেক হাঁসিল হয়ে

যাবে। আদালতের সওয়াল সাহিত্যে অযৌক্তিক। অযৌক্তিক, কিন্তু নিষ্ফলা বলতে পারি নে। কেন না, এই প্রক্রিয়ার দ্বারাই বিপ্লবাত্মক প্রয়াসের পথে ফলপ্রদ বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। যুগ থেকে যুগে যখনই সাহিত্যকে পরিবর্তিত যুগের উন্নত রুচি অনুযায়ী সম্মার্জিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে তখনই পুরাতন নজির সেই চেষ্টায় প্রতিবন্ধকতা করেছে। হাজার হাজার বছরের পরও যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাঞ্ছিত অগ্রগতি হয় নি তার একটা প্রধান কারণ হল নজিরের বাধা। এই একই নজিরের যুক্তিতে সুবিধাভোগী শ্রেণীর মানুষ মানবজাতির সমানাধিকার ও সাম্যের আদর্শকে অস্বীকার করবার চেষ্ট পায়। পূর্বে সাম্য ছিল না, সুতরাং ভবিষ্যতেও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়—এমনতর যুক্তির ফাঁক ও ফাঁকি অতি স্পষ্ট।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, রুচির ক্রমাগত পরিশীলন আর উন্নয়নের মধ্য দিয়েই সাহিত্যের অগ্রগতি বিহিত হয়। এই উন্নত রুচির প্রসাদেই এক যুগের সাহিত্যিক ধ্যান-ধারণা-সংস্কারকে পুরাতনজ্ঞানে পরিত্যাগ করে অন্য যুগের সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের মধ্যে আমরা প্রবেশ করি। স্থূল দেহবাদী সাহিত্যের সংস্কার অনেক কাল আগেই বাংলা সাহিত্যে বর্জিত হয়েছে। প্রধানতঃ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উন্নতরুচিবিশিষ্ট কল্যাণকর সাহিত্যের প্রভাবেই এই বর্জনক্রিয়া সহজ হয়েছে। কোথায় আজ আমরা এই দুই যুগন্ধর পুরুষের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে রুচির আরও বেশী পরিশীলন ঘটাব তা নয়, সাহিত্যের হাওয়া উল্টো দিকে বইতে শুরু করেছে। নতুনের বিরুদ্ধে প্রাচীন প্রথাকে যুক্তিরূপে খাড়া করা হচ্ছে। এটি যে প্রগতিশীলতা নয়, পশ্চাদ্‌গতি—সে কথা আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা দরকার।

দেহবাদের প্রশ্নে বাদ-প্রতিবাদ

১

"কথা-সাহিত্য ও দেহবাদ"-শীর্ষক মৎলিখিত প্রবন্ধের ('শনিবারের চিঠি', শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩৬৪) প্রতিক্রিয়ামুখে নানা ধরনের আলোচনা ও মতামতের সম্মুখীন হওয়া গেছে। সে সব আলোচনা ও মতামতের এক অংশ প্রতিবাদমূলক, অন্য এক অংশে সমর্থনের আভাস মিলেছে। দু-একটি পত্রিকার প্রতিবাদ খুব তীব্র ভাষায় ঘোষিত হয়েছে। তাতে বক্তব্য কম, যুক্তি কম, লেখকের প্রতি উষ্মা বেশী। কিন্তু এই প্রতিবাদ প্রবন্ধটি * ঠিক সে জাতের নয়। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর বক্তব্যকে অনুগ্র ভাষায় খুব সুশৃঙ্খলভাবে গ্রথিত করেছেন এবং তাঁর বক্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়ারও প্রয়োজন আছে। তিনি যে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর প্রতিপাদ্যের আলোচনা করেছেন, সে দৃষ্টিকোণের সঙ্গে আমার মানসভঙ্গির ঐক্য না থাকলেও এ কথা আমি অস্বীকার করতে পারি না যে, ওই দৃষ্টিকোণের পিছনে পাঠকসম্প্রদায়ের একাংশেব সায় রয়েছে। অর্থাৎ যোগেশ-বাবুর আলোচনাকে প্রতিবাদী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বমূলক বক্তব্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। যে মনোভাব অনেক-সংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা সমর্থিত ও পরিপুষ্ট, সে মনোভাব সম্পর্কে উদাসীন থাকবার যুক্তি নেই।

ভট্টাচার্য মহাশয়ের সাকুল্য বক্তব্যকে সংক্ষেপ করলে এই দাঁড়ায় যে, তিনি অপরিণতমনা পাঠকদের কারণে দেহবাদী বিষয়-সম্বলিত সাহিত্য পরিবেষণে লেখকদের নিবৃত্ত থাকবার যৌক্তিকতা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে সাহিত্যসৃষ্টিকে সামগ্রিকভাবে

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

বিচার করে দেখতে হবে, পাঠকদের বোধবুদ্ধি ও রসগ্রহণক্ষমতার স্তরভেদ ও তারতম্য স্বীকার করে নিলে সাহিত্যিকের সাহিত্য-সৃষ্টির পথে অযথা অন্তরায়ের সৃষ্টি করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, সাহিত্য-সৃষ্টিকে শুদ্ধমাত্র সঙ্কীর্ণ দেহবাদী মাপকাঠিতে বিচার করলে চলবে না, অখণ্ডভাবে অর্থাৎ সব জড়িয়ে তার বিচার হওয়া উচিত। তৃতীয়তঃ, দেহবাদ অস্তিত্ব ও জীবনধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, সুতরাং সাহিত্যে তার প্রতিফলন অনিবার্য। চতুর্থতঃ, যৌবনকালীন ভাবনা-কল্পনা—যার ভিতর প্রেমের একমুখী আবেশ একটা মস্ত জায়গা জুড়ে আছে—নিয়ে এ যাবৎ অনেক উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং সেই নজিরেই কোন সাহিত্যকর্ম অগ্রাহ্য হতে পারে না। পঞ্চমতঃ এবং শেষতঃ, দেহবাদী সাহিত্যের পূর্ব-ঐতিহ্য রয়েছে—শুধু বিদেশী সাহিত্যেই নয়, আমাদের স্বদেশীয় সাহিত্যের মধ্যেও, বিশেষতঃ সংস্কৃত-সাহিত্যে।

একে একে যুক্তিগুলির বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

আলোচক নিজেই স্বীকার করেছেন, আমাদের সমাজে অপরিণতমনা-শ্রেণীর পাঠকসংখ্যা বাস্তবিক পক্ষে বিচক্ষণশ্রেণীর পাঠক অপেক্ষা “বহুগুণ অধিক”। এ-ই যদি সামাজিক পরিস্থিতি হয়, সে ক্ষেত্রে দেহবাদী সাহিত্য-পরিবেষণের বিপদ সম্পর্কে অনবহিত থাকবার জো কোথায়? বিশেষতঃ যখন আমরা জানি যে, যাঁদের রচনা সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল তাঁরা ওই প্রথমোক্ত শ্রেণীর পাঠকসম্প্রদায়ের দ্বারাই মুখ্যাংশে সমাদৃত? আলোচক তাঁর আলোচনাকালে একটা জিনিস ভুলে গেছেন যে, সাহিত্যসৃষ্টিকে যে সব সময় নিছক বিশুদ্ধ সাহিত্যাদর্শের মানদণ্ডে বিচার করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই; সাহিত্যবিচার ছাড়াও সাহিত্যকর্মের একটা বৃহত্তর সামাজিক দিক আছে, তাকে আলোচনার আওতার মধ্যে আনা না-আনা সমালোচকের ইচ্ছাধীন ব্যাপার। “কথা-সাহিত্য ও দেহবাদ” প্রবন্ধটি লেখার সময় আমার

মধ্যে সমাজকল্যাণচিন্তা প্রবলতর হয়েছিল এবং তাঁর যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। আমাদের পাঠকসমাজের একটা মোটা অংশের উপর এই সব তথাকথিত জনপ্রিয় সাহিত্যিকের রচিত দেহবাদী সাহিত্যের প্রভাব ও সম্মোহের চরম ক্ষতিকর পরিণাম লক্ষ্য করে সে বিষয়ে পাঠকসমাজের সম্বিৎ জাগ্রত করবার জন্য আমি লেখনী ধারণ করেছিলাম। তন্মুহূর্তে সাহিত্যবিচার আমার চক্ষে গৌণ স্থান অধিকার করেছিল, যদিও, বলা প্রয়োজন, সাহিত্যবিচারের মাপকাঠিতেও ওই সকল সাহিত্যকর্ম মোটেই ধোপে টেকবার নয়। সমালোচক সমাজভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে সাহিত্য বিচার করলেই তা দোষের হয়ে গেল এমন কুসংস্কার থেকে মুক্ত থাকা ভাল। এই একদেশদর্শী সঙ্কীর্ণ মূল্যায়ন অতীতে আমাদের জাতির ও সাহিত্যের অনেক ক্ষতি সাধন করেছে।

তা ছাড়া, সাহিত্যবিচারের মাপকাঠিতেও আমরা পাঠক-সাধারণের উপর সাহিত্যসৃষ্টির সম্ভাবিত প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা না-ই বা করব কেন? উপন্যাস গল্প ইত্যাদি তো শুধু আমোদের জন্যই পড়া হয় না, পাঠকের নিজ নিজ জীবন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে তা থেকে কিছু তাৎপর্যও খুঁজে বের করবার চেষ্টা করা হয়। পাঠক পরিণতমনা হোন অপরিণতমনা হোন, সাহিত্যপাঠ তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে—দুইয়ের ক্ষেত্রে প্রভাবের প্রকৃতি স্বতন্ত্র সে ভিন্ন কথা। টি. এস. এলিয়ট তাঁর "Religion and Literature" প্রবন্ধে সঙ্গতভাবেই বলেছেন যে, "What we read does not concern merely something called our *literary taste* but that it affects directly, though only amongst many other influences, the whole of what we are." (বক্রাক্ষর এলিয়টের)। এলিয়ট স্বীকার করেছেন যে, যৌবনে লরেন্সের সাহিত্যপাঠের ফল তাঁর উপর পুরোপুরি শুভঙ্কর হয় নি। দেহবাদী কিন্তু সুমহতী শিল্পক্ষমতা ও

গভীর অভীপ্সাযুক্ত লেখক লরেন্সের সাহিত্যের সম্পর্কেই যখন এই কথা, তখন নিছক দেহবাদের জন্যই দেহবাদী বিলাসে আবদ্ধ শিল্পবোধবিবর্জিত সাধারণ লেখকদের প্রভাব যুবক-মনের উপর কী সাংঘাতিক হয়ে দেখা দিতে পারে তা আশা করি বিশদভাবে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। যে সকল সর্বস্বীকৃত উৎকৃষ্ট গ্রন্থের (যেমন মহাভারত, কালিদাসের কাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, পাশ্চাত্য কথা-সাহিত্যের একাধিক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ) ভিতর দেহবাদী প্রসঙ্গের নিরাবরণ উল্লেখ আছে, তাদের পঠনপাঠনের ফলে কোনরূপ ক্ষতি না হতে পারে (যদিও এ সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলা যায় না, এলিয়টের স্বীকৃতি অনিশ্চয়তার অন্যতর প্রমাণ), কিন্তু এর বিপরীত রীতিটুকু সত্য নয়। দেহবাদই যে-সাহিত্যের একমাত্র পুঁজি, যে-সাহিত্যের পিছনে সুমহান্ কোন অভিপ্রায়ের প্রণোদনা নেই, যে-সাহিত্য কামবিকারযুক্ত প্রেমের একমুখী আবেশের দ্বারা একান্তভাবে আবিষ্ট এবং প্রায়শ অপরিণতমনা ও অপ্রবীণ-বয়সী লেখকগণের রচনা, সে সাহিত্যের প্রভাব তরুণ-মনের উপর মারাত্মক হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ এই ক্ষতিকর পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন হয়েও নাকি এ সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা চলবে না। হেতু? না, সাহিত্যসৃষ্টিকে সাহিত্যের মানদণ্ড ছাড়া অন্য কোন মানদণ্ডে বিচার করতে নেই। করলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল। ভট্টাচার্য মহাশয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদের নির্দেশিত রসবিচারের মানদণ্ড যদি কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ লেখকদের কথা মনে রেখে প্রয়োগ করতেন আমার বলবার কিছু ছিল না, কিন্তু কতকগুলি মামুলীশক্তিবিশিষ্ট লেখকের পক্ষসমর্থনে অগ্রসর হয়ে ও তাঁদের বেলায় সেই উচ্চনীতির প্রয়োগ করে তিনি প্রকারান্তরে সেই উচ্চনীতিরই অবমাননা করেছেন।

তরুণ-সমাজের উপর আমাদের 'জনপ্রিয়' আধুনিক কথা-সাহিত্যিকদের প্রভাব কোন্ পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে সে সম্বন্ধে

আলোচক চিন্তা-ভাবনা করেছেন বলে মনে হয় না। করলে দেখতে পেতেন, আজকের একজন উঠতি জনপ্রিয় কথা-সাহিত্যিক আর সিনেমা-স্টার আর জনপ্রিয় ফুটবল-খেলোয়াড়ে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। এঁরা শুধু দেহবাদের দিক দিয়েই নয়, অন্য সকল দিক দিয়েও সাহিত্যের সুর এমন নামিয়ে এনেছেন যে ট্রামে-বাসে ছোকরারা যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রী কিংবা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল প্রসঙ্গ আলোচনা করে, সেই একই ভাষায় ভঙ্গিতে হালের লেখা গল্প-উপন্যাস নিয়েও তাদের সমান উৎসাহে আলোচনা করতে দেখা যায়। এই দৃষ্টান্তে সাহিত্যের প্রভাব বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রসারিত হচ্ছে মনে করে উল্লসিত হবার কারণ নেই, এর দ্বারা রুচির অধঃপতনেরই শুধু সূচনা হচ্ছে। অর্থাৎ দিনে দিনে সাহিত্য একটি খেলনার বস্তু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সাহিত্যের এই নিম্নগামী প্রবণতার ক্ষেত্রে দেহবাদ একটা প্রধান উত্তেজক হয়ে দেখা দিয়েছে। ছোকরা-পড়ুয়ারা হালের গল্প-উপন্যাস কতটা সাহিত্যের আকর্ষণের জন্য পড়ে, কতটা তাদের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য পড়ে সেটি sample survey-জাতীয় কোন আধুনিক পরীক্ষণপদ্ধতির দ্বারা নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য তারা যদি সত্য কথা বলে তা হলেই এই পরীক্ষণ সম্ভব।

আর যে সাহিত্যসৃষ্টি সমাজের একটা বৃহৎ-সংখ্যক মানুষের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তা কোন্ মানদণ্ডে আর কোন্ গুণে সৎ সাহিত্য হতে পারে ভাল বোঝা যায় না। সৎ সাহিত্য মাত্রই যেমন কল্যাণকর, তেমনি অকল্যাণকর সাহিত্য মাত্রই অসৎ এমন কথা বলা যায়। সাহিত্যবিচারের বেলায় সামাজিক পরিস্থিতি মনে রাখতে হবে বইকি। দেশের অগণিত-সংখ্যক পাঠকই যখন অপরিণতমনা ও স্থূল রসের সন্ধানী এবং তাদের উপর ক্ষতিকর সাহিত্যের বিষময় প্রভাব প্রত্যক্ষ, তখন স্থান-

কালের ঊর্ধ্বে স্থিত কোন এক দুর্নিরীক্ষ্য রসের মানদণ্ডে সাহিত্য-বিচারের যৌক্তিকতাও খুঁজে পাওয়া যায় না, অর্থও কিছু তার ঠাহর করা যায় না। বাস্তব জীবনের নিখুঁত চিত্রণের নামে এক শ্রেণীর সাহিত্যিক দেহকে নিয়ে বড্ড বেশী টানাটানি শুরু করেছেন। তাঁদের সেই আত্যন্তিক দেহগন্ধী রচনা ছাত্রসমাজের উপর চরম বিষক্রিয়া করছে। সেই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির প্রতি চোখ বুজে থেকে এক অসম্ভাব্য কল্পিত সাহিত্যবিচারের আদর্শ নিয়ে মেতে থাকব এতটা ঢালাও সাহিত্যপ্রীতি আমাদের নেই সে কথা কবুল করব। আমাদের বিবেচনায় যে কোন সাহিত্যকর্মের মূল্যায়নের বেলায় দেশের তন্মুহূর্তে বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি ও শিক্ষাগত পরিস্থিতি বিচারক্রিয়ায় একটা গুরুত্বপূর্ণ factor; সে জিনিস অস্বীকার করতে চাইলেই তাকে অস্বীকার করা যায় না। এ কথা যদি মনে রাখি, সমাজের উপর অনিষ্টকর সাহিত্যের বিষময় প্রভাব ও পরিণাম চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

ভট্টাচার্য মহাশয় সামগ্রিক ভাবে বিচারের প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর নিজের কথাই তুলে দিচ্ছি—'অভিজ্ঞ, রসজ্ঞ পাঠক সকল ক্ষেত্রেই সমগ্রভাবে সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস সার্থক হয়েছে কি না অর্থাৎ সত্যকারের সাহিত্যসৃষ্টি হয়েছে কি না। এই সাহিত্যিক বিচার সামগ্রিক ভাবে হওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থের স্থান-বিশেষ বা অংশবিশেষের প্রতি আবদ্ধদৃষ্টি হয়ে বিচার করলে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাই সমধিক।' আমার প্রবন্ধের পরি-প্রেক্ষিতে এ মন্তব্যের একমাত্র এই অর্থই হয় যে, আমি সংশ্লিষ্ট লেখকদের রচনা 'সমগ্রভাবে' বিচার করে আমার অভিযোগ উত্থাপন করি নি, তাঁদের রচনার স্থানবিশেষ বা অংশবিশেষের প্রতি আবদ্ধদৃষ্টি হয়ে তাঁদের প্রতি নিষ্করুণ হয়েছি। এই রকম

মনে করবার কী কারণ থাকতে পারে? আলোচক আশা করি অন্ততঃ এইটুকু সাহিত্যবুদ্ধি আমাতে আরোপে অরাজী হবেন না যে, নিছক স্থানবিশেষ বা অংশবিশেষ বিবেচনা করে লেখক বিচারের নিতান্ত চটুল, দায়িত্বহীন অভ্যাসের বয়স আমার চলে গেছে। যাঁদের লেখা সম্বন্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তাঁদের রচনা সামগ্রিক ভাবে বিচার করেই সেই অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে লেখকের রচনার স্থানবিশেষ বা অংশবিশেষ বড় কথা নয় (যদিও তা হিসাবের মধ্যে নিতে হবে বইকি), বড় কথা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, প্রবণতা ও প্রবৃত্তি, তাঁর উদ্দেশ্যের স্বরূপ নির্ণয়। প্রধানতঃ ওই মানদণ্ডের বিচার দ্বারা স্থিরনিশ্চয় হয়েই আমি আমার অভিযোগ উপস্থিত করেছি, কেবলমাত্র পূর্বপ্রসঙ্গবর্জিত অংশবিশেষ-সমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সমালোচনায় অগ্রসর হই নি। তা উচিতও হত না।

লেখকের সাহিত্যিক কর্মের মূল্যায়নের বেলায় তাঁর উদ্দেশ্যের প্রকৃতি নিরূপণে সবিশেষ যত্নবান হওয়া প্রয়োজন এবং তাতে মূল্যায়নের কাজ অনেক সহজ হয়, আশা করি যোগেশবাবু এ কথা স্বীকার করবেন। আমি আমার এতৎসম্পর্কিত দ্বিতীয় কিস্তির প্রবন্ধে (ভাদ্র, ১৩৬৪) বলেছি যে, খোদ দেহবাদ বস্তুটি খুব বেশী আপত্তিকর না হতে পারে, কিন্তু কে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেহ-বাদের অবতারণা করেন তারই উপর নির্ভর করে সে বস্তুর ভাল-মন্দের তারতম্য। অর্থাৎ দেহবাদের অবতারণার যৌক্তিকতা-অযৌক্তিকতার চাইতেও তদন্তর্গত অভিপ্রায়ের বিচার বড় কথা। এই মাপকাঠিতেই কোন সাহিত্য দেহবাদী বিষয় সম্বলিত হয়েও উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে, কোন সাহিত্য স্রেফ আস্তাকুঁড়ের জঞ্জাল স্বরূপ গণ্য হয়। কোন একটি বহুলপ্রচলিত দৈনিকের সাহিত্যিক (!) ক্রোড়পত্রে এইরূপ মন্তব্য করা হয়েছে যে, দেহবাদ নিয়ে বিবাদ নিরর্থক, কারণ দেহকে বাদ দিয়ে নাকি

সাহিত্য হয় না। অর্থব্যক্তির উপর জোর না দিয়ে এসব আপাত-চটকসৃষ্টিকারী ধ্বনিসাদৃশ্যযুক্ত শব্দের খেলার দ্বারা বক্তব্য প্রকাশের লঘু অভ্যাস সুধীজনের গ্রাহ্য হতে পারে না। এসব সস্তা শব্দের মারপ্যাঁচে যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না, বালসুলভ মনোবৃত্তিরই জানান দেওয়া হয় মাত্র। দেহকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না বেশ কথা, কিন্তু দেহজ ক্ষুধার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথা সোল্লাস বর্ণনায় পাতার পর পাতা ভরিয়ে তোলার কী প্রয়োজন! নায়ক-নায়িকার রূপজ আকর্ষণকে একটা broad fact হিসাবে বিবৃত করলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। কিংবা যদি কাহিনীর প্রয়োজনে কিছু বর্ণনা দিতেই হয়, তা হলে সে কাজ যত বেশী ইঙ্গিত ও সংকেতের সাহায্যে সারা যায় ততই ভাল হয় না কি? সাহিত্যে ব্যঞ্জনার প্রয়োগ এই দেহবাদ ব্যপদেশে যত আবশ্যিক এমন আর কোন-কিছুতে নয়। 'কি দিয়ে বোঝাব প্রেম, যদি দেহ রহে নিরুত্তর?' (অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত)। এই তির্যক প্রশ্নের মধ্য দিয়ে platonic love-এর সারবত্তায় যে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে সেই মনোভাব বোঝা কঠিন নয়, কিন্তু দেহকে স-উত্তর করতে গিয়ে যদি তাকে অতিরিক্ত মাত্রায় মুখর করে তোলা হয় তা হলে প্রেম যে ইতিমধ্যে খাবি খেতে আরম্ভ করে সে কথা কেন দেহবিলাসী লেখকেরা হৃদয়ঙ্গম করতে চান না? প্রেমের পবিত্রতা ও মহিমাকে দেহবাদের দ্বারা চটকিয়ে প্রেমকে হয়তো রিয়ালিস্টিক করে তোলা যায়, কিন্তু আর অন্য সকল প্রকার বিচার-বিবেচনা ত্যাগ করে কেবলমাত্র রিয়ালিজমের সাধনাকেই আঁকড়ে ধরে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে এতটা প্রাধান্য রিয়ালিজমকে দেওয়া চলে না। একালের দেহবাদী লেখকেরা বাস্তবসঙ্গতির আদর্শকে বিগ্রহ বানিয়ে পূজা করতে শুরু করেছেন, সেইখানেই যত আপত্তি। নয়তো কাহিনীর প্রয়োজনে এখানে-সেখানে খানিকটা দেহবাদের সংযত অবতারণায় বোধ হয় তেমন দোষ বর্তায় না, যদি লেখকের অভিপ্রায় সৎ বলে

প্রমাণিত হয়। ওই অভিপ্রায়ের সততাটাই হল আসল কথা। আর এইটে আধুনিক লেখকদের মধ্যে প্রায়শঃ থাকে না বলেই যত গণ্ডগোল। মহাভারতে নানা কামবিকারের প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে, কিন্তু সমগ্র গ্রন্থখানি এক অতি মহান্ সুউচ্চ ভাবের দ্বারা বিধৃত থাকায় ওইসব খুঁটিনাটি বৃত্তান্তের মালিন্য গ্রন্থখানিকে আদৌ স্পর্শ করতে পারে নি। কালিদাসের কাব্যে রূপতান্ত্রিকতা আছে, ভোগতান্ত্রিকতা আছে; কিন্তু রূপমোহ ও ভোগ সেখানে বড় নয়, বড় হল ত্যাগ ও দুঃখের আগুনে পুড়ে ভোগের পরিশুদ্ধ হওয়ার আদর্শ। এই মহিমান্বিত নীতি কালিদাসের কাব্যে ওতপ্রোত আছে বলেই কালিদাস মহাকবি, নয়তো মহত্ত্ববর্জিত প্রথম শ্রেণীর একজন রূপতান্ত্রিক ও ভোগতান্ত্রিক কবি-পরিচিতিতেই তাঁর পরিচয় নিঃশেষিত হত।

সংস্কৃত কবিরা তাঁদের কাব্যে দেহবাদের অবতারণা করলেও অনীতির পোষকতা কোথাও করেন নি। তেমনি বৈষ্ণব-সাহিত্যেও অনীতির স্থান নেই। বৈষ্ণব কবিদের দেহসৌন্দর্যের বর্ণনা পাঠকের রুচির অপকর্ষকারী না হয়ে বরং তাঁর সৌন্দর্যানুভূতিকে জাগ্রত করে তাঁর চিত্তকে উচ্চ ভাবরাজ্যে অধিষ্ঠিত করবার কাজে সহায়ক হয়েছে। বৈষ্ণব কবিতার ধ্বনিসুকুমার পদলালিত্যে পাঠক ও শ্রোতার চিত্ত শোধিত, হৃদয় অনাবিল রসে নিষিক্ত হয়েছে। অনুভূতির প্রগাঢ়তার দ্বারা রসের এই যে সম্মার্জন, উদ্দেশ্যের সততা ও আন্তরিকতার দ্বারা দেহবাদের এই যে পরিশোধন, এমনকি গোত্রবদল, এ জিনিস ভারতচন্দ্রে আমরা পাই না। সেই কারণে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্য ছন্দবৈভবে, শব্দনৈপুণ্যে, অন্যান্য আর সব কাব্যকলার কৃতিত্বে অনবদ্য হয়েও স্থূলতার কলুষস্পর্শ অতিক্রম করতে পারে নি। ভারতচন্দ্রের কাব্য-সাধনার পিছনে মহৎ কোন ভাবের দ্যোতনা

নেই, কাজেই তাঁর দেহবাদ দেহবাদের সীমানাতেই আবদ্ধ রয়ে গেছে, তা ইন্দ্রিয়াতিশায়ী হতে পারে নি।

এ সব বড় বড় দৃষ্টান্তের প্রয়োগ এক হিসাবে বর্তমান উপলক্ষে অবান্তর। কারণ যাঁদের নিয়ে আমাদের আজকের এই আলোচনা, যোগেশবাবু ও আমাতে বিতর্ক, তাঁরা এতই সাধারণ মাপের লেখক যে তাঁদের রচনার আলোচনা-প্রসঙ্গে এ সব ভারী ভারী উদাহরণের যৌক্তিকতা দেখা যায় না। যে উদ্দেশ্যের সততার উপর আমি গুরুত্ব আরোপ করতে চাইছি, সেই উদ্দেশ্যের সততা বস্তুটি সাহিত্যচর্চার সূত্র থেকে আসে না, চারিত্রচর্চার সূত্র থেকে আসে। তার জন্যে বিচারপরায়ণ জীবনসাধনার প্রয়োজন হয়। আমাদের আলোচনার অন্তর্গত অপ্রবীণ কথা সাহিত্যিকবর্গ ওই বিচারপরায়ণ জীবনসাধনার ক্ষেত্রে কে কতদূর অগ্রসর হয়েছেন তা জানবার কৌতূহল আমার আছে। জীবন সম্বন্ধে গভীর বোধ ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় যাঁদের রচনায় ছিটেফোঁটাও পাওয়া যায় না, তাঁদের মনোভঙ্গীতে অভিপ্রায়ের সততা থাকবে, তাঁরা তাঁদের বর্ণিত দেহবাদকে দেহবাদের অতিরিক্ত ও অতিশায়ী কোন গূঢ় অর্থের দ্বারা মণ্ডিত করতে সমর্থ হবেন—যোগেশবাবু এঁদের সম্বন্ধে এত উচ্চ ধারণা পোষণ করলেন কোন্ প্রমাণের বলে?

একটা কথা সর্বদাই আমাদের মনে রাখা দরকার যে, কথা-সাহিত্যকে শুদ্ধমাত্র পর্যবেক্ষণের স্তরে সীমাবদ্ধ রাখলে স্থূল উপাদানের জঞ্জাল থেকে কিছুতেই তাকে মুক্ত রাখা সম্ভব হয় না। এই স্থূল উপাদানগুলির মধ্যে দেহবাদ সর্বপ্রধান এবং সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব-বিস্তারের ক্ষমতাবিশিষ্ট। কথা-সাহিত্যের শিল্প যেহেতু মূলতঃ পর্যবেক্ষণনির্ভর, সে-কারণ তার ভিতর কিছু কিছু স্থূলতা অপরিহার্য—যেমন ঘটনার স্থূলতা, পরিবেশ ও আবহ বর্ণনের স্থূলতা, নানা রকম খুঁটিনাটি প্রসঙ্গ দিয়ে কাহিনী

স্ফীতায়িত করার স্থূলতা—কাব্যের বিশুদ্ধ ইমোশন কথা-সাহিত্যে আশা করা যায় না। কিন্তু বিচারপরায়ণ কথা-সাহিত্যিক যিনি, তিনি তাঁর শিল্প-মাধ্যমের এই সহজাত স্থূলতা মেনে নিয়েই তাকে অতিক্রমণের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। কী ভাবে তিনি তা করেন? প্রজ্ঞার দ্বারা, জীবনবোধের গভীরতার দ্বারা, আত্ম-আরোপিত সংযমশাসনের দ্বারা। তাঁর সমগ্র কর্মের পিছনে একটা উচ্চ আদর্শের পটভূমি বিলম্বিত থাকে। অন্যান্য জঞ্জালের সঙ্গে সঙ্গে দেহবাদকেও তিনি এই উপায়েই শোধন করে নেন—বোধ করি দেহবাদকেই তিনি ওই উপায়ে সবচেয়ে বেশী শোধন করে নিতে পারেন। লীটন স্ট্র্যাচী যাকে বলেছেন "the principle of deliberation, of intention, of a conscious search for ordered beauty..." সেই উচ্চ শিল্পাদর্শ প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিকের মনের গভীরে ক্রিয়াশীল রয়েছে। আর তা রয়েছে বলেই তিনি স্থূল দেহবাদের দ্বারা আসক্ত হন না, তাকে অভিপ্রায়ের সততার দ্বারা, মননের দ্বারা পরিশোধিত করে উচ্চগ্রামে উত্তীর্ণ করে দেন। তাঁর বেলায় দেহবাদ দেহাত্মবাদে রূপায়িত হয়। ভোগবাদ সুসংযত সৌন্দর্যসন্ধানের সচেতন আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন লরেন্সের বেলায় হয়েছিল, ফরাসী কোন কোন লেখকের বেলায় হয়েছিল। আনাতোল ফ্রাঁসের 'The Red Lily' বইতে দেহমিলনের বাস্তব বর্ণনা আছে। কিন্তু বর্ণনার এমনি সৌন্দর্য ও সংযম যে তা পাঠকের ভিতর এতটুকু বিস্বাদের উদ্রেক করে না, বরং তাঁর মনকে অমলিন জীবন-প্রীতিসমন্বিত সৌন্দর্যানুভূতিতে আপ্লুত করে দেয়। আমাদের সাহিত্যের যে সব নবীন লেখক প্রায়শঃ দেহবাদ নিয়ে নাড়াচাড়া করবার সুড়সুড়ি অনুভব করেন, তাঁদের কি কোন ধারণা আছে কিসে কী হয়, কোথায় শ্লীলতার শেষ, কোথায় অশ্লীলতার আরম্ভ, পাঠকমনের উপর শব্দের ব্যঞ্জনাময় ধ্বনিসুকোমল মার্জিত

ব্যবহারেরই কী প্রভাব, আর উদোম শব্দেরই বা কী প্রভাব? শব্দ নিয়ে দীর্ঘকাল নাড়াচাড়া না করলে যেমন শব্দার্থের যাথাযথ্যের বোধ আসে না, তেমনি পাঠকমনের উপর তার সম্ভাবিত প্রতিক্রিয়ার জ্ঞানও জন্মায় না। শ্লীলতা-অশ্লীলতার সীমা-রেখার বোধ উপজাত না হওয়া পর্যন্ত শব্দের অপব্যবহার অবশ্যম্ভাবী; বাস্তবতার চর্চার নামে পঙ্ক্তিভুক্ত একালীন কথাকারগণ তাঁদের গল্পোপন্যাসে সেই অপব্যবহারই করে চলেছেন দিনের পর দিন।

আর বাস্তবতাচর্চার কথাই যদি ধরা যায় তারও পিছনে মহৎ উদ্দেশ্যের প্রণোদনা থাকা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। ফ্লবেয়র, মোপাসাঁ, জোলা এবং এ যুগের সার্তর্ প্রমুখ রিয়ালিস্ট ধারার ফরাসী কথা-সাহিত্যিকগণ নিরাবরণ বাস্তবতার চর্চা করলেও তাঁদের সাহিত্যকে গভীর তাৎপর্যের দ্বারা ভূষিত করতে সমর্থ হয়েছেন, তার কারণ তাঁরা সকলেই বাস্তবতাচর্চায় উচ্চ আদর্শের দ্বারা চালিত হয়েছেন। তাঁরা সমাজের পচনশীল গলিত কদর্য রূপটিকে চোখের উপব তুলে ধরে সমাজসংস্কারের অভ্রান্ত ইঙ্গিত করেছেন তাঁদের লেখায়। সমাজের শোধনের কামনা নিয়ে সমাজদেহের অবক্ষয় তাঁরা দেখিয়েছেন। তেমন কোন মহৎ উদ্দেশ্যের গৌরব কি আমাদের নবীন কথাকারগণ করতে পারেন? আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমগ্র পরিধির ভিতর একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা সম্পর্কে বলা যায়, তিনি অনুরূপ কোন এক আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নগ্ন-বাস্তবতার চর্চায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন; বাদ-বাকী সব বাস্তবপন্থী লেখক দেহবাদের জন্যই দেহবাদে আসক্তির অপবাদ বোধ হয় এড়াতে চাইলেও এড়াতে পারবেন না। প্রকৃত সমাজকল্যাণের বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্যকর্মে অগ্রসর হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়; ও-কাজ গভীর অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে। তার পিছনে সুনিবিড় আদর্শবাদের অভীপ্সা থাকা চাই। যে সব লেখকের সম্পর্কে

আমার প্রবন্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল তাঁদের মনোজীবনের ভিতর এ-জাতীয় আদর্শবাদের প্রেরণা আছে জানতে পারলে আমি সুখী হব। আদর্শবাদবিবর্জিত দেহবাদচর্চার অপর নাম ক্লেদরতি, সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের গায়ে ওই কাদার ছিটে একটু বেশী পরিমাণেই এসে লাগছে না কি ?

যোগেশবাবু 'সমগ্রভাবে' বিচারের কথা বলেছেন। সমগ্রভাবে বিচারের প্রশ্ন খতিয়ে দেখতে গেলে রচনার বা গ্রন্থের মধ্যে প্রতিফলিত লেখকের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারের প্রশ্ন, প্রবণতার বিচারের প্রশ্ন, অভিপ্রায়ের প্রকৃতি-নিরূপণের প্রশ্ন। সামগ্রিকভাবে বিচার করেই এক শ্রেণীর লেখকের দেহবাদের মধ্যে দেহাত্মবাদের অঙ্কুর খুঁজে পাওয়া যায়, আর এক শ্রেণীর লেখকের দেহবাদকে ক্লেদরতি ছাড়া আর কোন আখ্যাই বোধ হয় দেওয়া যায় না। সামগ্রিক বিচারই তো বিচার, টুকরো বা খুচরো বিচারের কী মূল্য! সুতরাং আলোচক যখন সামগ্রিক বিচারের কথা বলেন তখন তাঁর সঙ্গে আমার মতদ্বৈধ ঘটবার কোন কারণ দেখি না, বরং তাঁর মনোভাবের মধ্যে আমি আমার নিজের মনোভাবের প্রতিধ্বনিই খুঁজে পাই। দেহাত্মবাদের সঙ্গে দেহবাদের পার্থক্য স্মরণ রাখলেই আর সামগ্রিক বিচার আর খণ্ডিত বিচারের মধ্যে পার্থক্যনির্ণয়ে গোল থাকে না।

এবার যৌবনকালে রচিত সাহিত্যের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারের আলোচনায় আসা যাক। এ কথা কখনই আমি বলব না, বলতে পারি না যে, যুবাবয়সী লেখকদের লেখনীমুখ থেকে কখনও সেরা সাহিত্যের উদ্ভব হয় নি। এ বিষয়ে এ-দেশ এবং ও-দেশের সাহিত্যে প্রতিকূলে এত নজির রয়েছে যে এরূপ অভিমত প্রকাশ করা খোদ যৌবনধর্ম আর যৌবনের শক্তিকে অস্বীকার করারই নামান্তর বলে প্রতিভাত হবে। বিশেষতঃ কাব্যসাহিত্যের অঙ্গনে যৌবনকালে প্রতিভার চমকপ্রদ বিকাশের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে

রয়েছে। চ্যাটারটন, বায়রন, শেলী কীটস্ প্রমুখ প্রখ্যাত কয়েকজন ইংরেজ কবির যৌবনেই দেহান্ত ঘটেছিল। কবিতার একটি উপজীব্য প্রেম। প্রেমের অনুভূতি স্বভাবতঃই যৌবনে সবচেয়ে সজীব থাকে এবং সে অনুভূতি প্রকাশের শ্রেষ্ঠ কালও হল যৌবন। যদিও পশ্চাদ্‌স্মৃতিচারণের দ্বারা কোন কোন কবি বার্ধক্যেও অনবদ্য প্রেমের কবিতা লিখে গেছেন তা হলেও কবিতায় রোমান্টিক কল্পনার ঐশ্বর্য ও আবেগের উচ্ছলতা প্রকাশের সবচেয়ে উপযোগী কাল হল যৌবন, বয়োধর্মবশতঃই যৌবনের ওই উপযোগিতা। বার্ধক্যের প্রেমকল্পনায় প্রজ্ঞার উপাদান যতটা পরিমাণে এসে মেশে ঠিক ততটাই প্রাণোচ্ছলতা থেকে সে কল্পনা বঞ্চিত হয়। পরিণত বয়সের রচনায় কবির জীবনবোধের খাতে যতটা লাভ হয় প্রাণস্ফূর্তির খাতে ঠিক ততটাই তিনি হারান।

কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছিল কবিতা নিয়ে নয়, কথা-সাহিত্য নিয়ে। কথা-সাহিত্যের স্বীকৃত দুটি বিভাগ—ছোটগল্প ও উপন্যাস। যৌবনে ভাল ছোটগল্প লেখা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। আমাদের সাহিত্যের একাধিক লেখক যৌবন-বয়ঃসীমার মধ্যে বহু প্রথমশ্রেণীর ছোটগল্প ও বড়গল্প সৃষ্টির গৌরব অর্জন করেছেন। ছোটগল্পের প্রকৃতি অনেকটা কবিতার সমধর্মী, তার ভিতর কল্পনার lyricism একটা প্রধান জায়গা জুড়ে আছে (অবশ্য, হালের কট্টর বাস্তবপন্থী গল্পাদর্শকে বাদ দিয়েই এ কথা বলছি)। সে-কারণ ছোটগল্পের নির্মাণকলায় শিল্পসিদ্ধির শ্রেষ্ঠ কালও বোধ হয় যৌবনবয়স, যদিও এ সম্বন্ধে ধরা-বাঁধা কোন নিয়ম প্রবর্তন করা যায় না। কিন্তু উপন্যাস? যৌবনের অপরিণত মনন আর অস্ফুট জীবনবোধের দ্বারা কি ওই বিশেষ আঙ্গিকের সাহিত্যশিল্পকে আয়ত্তের মধ্যে আনা যায়? নয়, নয়, কদাচ নয়। উপন্যাস হল জীবনভাষ্য। দীর্ঘায়িত কাহিনীর মধ্য দিয়ে তা মুখ্যতঃ জীবনের তাৎপর্যকেই প্রকাশের চেষ্টা করে। উপন্যাসমাত্রেই কাহিনীর

একটা রস থাকে, কিন্তু সত্যকার উপন্যাসে সেইটেই সব নয়। ওই কাহিনীর অন্তর্জীবী গূঢ়ার্থকে ধরাটাই উপন্যাসশিল্পের মূল লক্ষ্য। উপন্যাস-আঙ্গিকে বিচিত্র ঘটনার ডালপালাকে যখন শিল্পী একটি অখণ্ড বৃহৎ বিশালতার মধ্যে এনে মেলানোর চেষ্টা করেন এবং ওইভাবে কাহিনীকে একটা সামগ্রিক ঐক্যদানের চেষ্টা করেন তখন শুধু যে নিরবচ্ছিন্ন শিল্পভাবনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি এ কাজ করেন তা নয়, তাঁর মনের গভীরে দার্শনিকতার বোধও যুগপৎ ক্রিয়া করতে থাকে। প্রত্যেক সমর্থ উপন্যাসকার এক অদ্ভুত জীবনরহস্যের অনুভূতির দ্বারা সংচালিত হন। আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বিভূতিভূষণ তারাশঙ্কর মানিক প্রত্যেকেই এ কথার প্রমাণ। জীবনের জটিলতার আবর্তে যিনি না ডুবেছেন না ভেসেছেন, উপন্যাসের বহিরঙ্গ কৃতিত্ব অর্জন সম্ভব হলেও উপন্যাসেব অন্তরঙ্গ রূপ তাঁর পক্ষে আয়ত্তগম্য হওয়ার কথা নয়।

এই যে প্রজ্ঞার অনুভূতি, এই যে জীবন-রহস্যের বোধ, এই যে জীবন-জটিলতার অভিজ্ঞতা—এই মানসিক ঐশ্বর্য যৌবনে অধিগত হওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তির প্রয়োজন এবং ওই সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা শুধু বয়সের সঙ্গেই আসা সম্ভব। যাকে আমরা বয়সের ভার বলি, তা আসলে অভিজ্ঞতার ভার ছাড়া আর কিছু নয়। ওই ব্যাপ্ত আর সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই জীবন-রহস্যের বোধ ধীরে ধীরে চিত্তকে অধিকার করে, জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে মনে গভীর জিজ্ঞাসার উদয় হয়। ব্যাপক সহানুভূতি আর করুণার উৎসও ক্রমশ ওই পথে অবারিত হতে থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের আত্মাদর কমে যায়, ফলে পরকে বোঝার কাজ সহজতর হতে থাকে। এইরূপ উন্নত মার্জিত পরিশোধিত অবস্থাতেই কেবল উপন্যাস-শিল্পের প্রতি সুবিচার করবার আশা করা যায়, তরুণ বয়সের

কাঁচা অভিজ্ঞতায় বড়জোর বড়গল্প লেখা যায়, সত্যিকার উপন্যাস লেখা যায় না। অবশ্য জীবনের কতকগুলি বহিরঙ্গ ঘটনাকে পর পর সাজালেই যদি উপন্যাস হয়, মন-দেওয়া-নেওয়ার নিতান্ত লৌকিক অভিজ্ঞতাকে লেখায় হুবহু সেই আকার দিলেই যদি উপন্যাস হয়, তা হলে অবশ্য আমার বলবার কিছু নেই। কিন্তু উপন্যাস বলতে এখানে আমি যথার্থ উপন্যাসের কথাই বলছি, যে শিল্পরীতি কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণনির্ভর আর কাহিনী-ভিত্তিকই নয়, যা বহুলাংশে মনোজীবী ও জীবনরহস্য-সন্ধানী। তেমন রচনা যৌবনের অপরিণত মনন ও অভিজ্ঞতার দ্বারা নির্মাণ করা যায় না। যৌবনকালে পৃথিবী সুখে ঝলমল করতে থাকে সন্দেহ নেই —কিন্তু যা-ই ঝলমল করে তা-ই সোনা নয়। ঝলমলে অনেক বস্তুর মধ্যেই ভাবোচ্ছ্বাসের খাদ মিশিয়ে থাকে, যৌবনসুখের ভিতর অনেকটাই থাকে। যৌবনকাল জীবন্ত কিন্তু অস্থির। মনের অতলে ডুবুরী নামাবার বয়স সেটা নয়। পল্লবগ্রাহিতার স্তরেই যৌবনের প্রায় বারো-আনা চিন্তা ও কল্পনা সীমাবদ্ধ থাকে। যুবকমন শুধু জীবনকে উপরে-উপরেই ছুঁতে পারে, তার দ্বারা গভীর সত্যের উদ্‌ঘাটন কদাচ সম্ভব হয়। নিবিড় ধর্মানুভূতি ও দার্শনিকতার উপলব্ধি যুবকবয়সের লেখকমানসে খুব কমই স্ফুরিত হতে দেখা যায়, সুতরাং যৌবনের রচনায় প্রগাঢ়তারও তেমন সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। যৌবনকালীন রচনায় আমোদের উপকরণ থাকে প্রচুর, তদনুপাতেই তাতে রস থাকে কম। রস বলতে এখানে স্থূল সুখস্বাদকে বোঝাচ্ছে না, সত্যিকারের জীবনরসিকতাকে বোঝাচ্ছে। শেষোক্ত ধরনের রস-রসিকতা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গেই কেবলমাত্র উপজাত হওয়া সম্ভব।

ভট্টাচার্য মহাশয় সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের প্রসঙ্গের উত্থাপন করেছেন। এ বিষয়ে আমি আমার দ্বিতীয় কিস্তির প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, তাঁকে সেই নিবন্ধটি পড়তে অনুরোধ

করছি। এ প্রবন্ধের গোড়ার দিকেও খানিকটা আলোচনা করেছি। এখানে আরও দুই-চারি কথা যোগ করবার চেষ্টা করব।

সংস্কৃত কাব্যে দেহবাদ আছে সত্য কথা, কিন্তু তা সুললিত ধ্বনির আবরণের দ্বারা আবৃত সুতরাং বহুলাংশেই অনিষ্টসম্ভাবনা-হীন। এখনকার সাহিত্যের দেহবাদ সে জাতের নয়। বিশেষতঃ কথা-সাহিত্যের দেহবাদ তো বড্ড বেশীই নগ্ন, বড্ড বেশীই স্পষ্ট। কথা-সাহিত্যের মাধ্যম গদ্য, গদ্যে পদলালিত্য ও ধ্বনিসৌকুমার্য পরিস্ফুটনের অবকাশ নিতান্ত সংকুচিত; সেই কারণে কথা-সাহিত্যাশ্রয়ী দেহবাদ প্রায়শঃ নিরাবরণ রিক্ততায় প্রকাশিত হয়ে তার ভিতরকার স্থূলতাকে প্রকট করে তোলে; ধ্বনিমধুর সংস্কৃত-কাব্যে এ ভয় ছিল না। কালিদাস যখন লেখেন "শ্রোণীভারাদলস-গমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাম্", নারীর দেহসৌন্দর্যের একটি বিশেষ রূপ ও ভঙ্গিমা আমাদের মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হয়। কবিবর্ণিত এই রূপ দেহসুরভিতে ভরপূর, এমন কি তা আমাদের আলোচিত দেহবাদের কাছ ঘেঁষেও গিয়েছে বলা যেতে পারে, কিন্তু যেহেতু তা ধ্বনির বর্মের দ্বারা সুরক্ষিত সেইহেতু তা পাঠকমনে কোন বিস্বাদের সৃষ্টি করে না, বরং তার ফলে তাঁর ভিতর এক বিশুদ্ধ সৌন্দর্যানুভূতির আস্বাদনের সঞ্চার হয়। রসের এই-ই ধর্ম, তা দেহাশ্রিত হয়েও মনকে বিমল আনন্দে আপ্লুত করে দেয়। কিন্তু এখনকার কোন হালফিল কথা-সাহিত্যিককে এই চিত্রটি পরিস্ফুট করতে বলুন, তিনি তাঁর একান্তগদ্যধর্মী ধ্বনিরিক্ত ঊষর, ক্ষেত্র-বিশেষে অশালীন, শব্দসমষ্টির পেষণযন্ত্রের দ্বারা মাড়িয়ে ওই সুন্দর কবিকল্পনাধৃত রূপটিকে চটকে ছাড়বেন। কবি ও অকবি, সুন্দরের পূজারী আর অসুন্দরের বশীভূত ব্যক্তিতে এইখানেই পার্থক্য।

২

"কথা-সাহিত্য ও দেহবাদ" প্রসঙ্গে শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় দ্বিতীয় যে আলোচনা পাঠিয়েছেন, ভেবেছিলাম সে সম্বন্ধে আমি নীরব থাকব। নীরবতার ইচ্ছা ক্লান্তিবশতঃ নয়, মনস্তাত্ত্বিক কারণজনিত। যে সব লেখক এই আলোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও যাঁদের বিরুদ্ধে আমি আমার প্রথম নিবন্ধে লেখনী ধারণ করেছিলাম, সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে তাঁরা আমার বিরুদ্ধবাদী হলেও সমাজজীবনে অনেকেই আমার বন্ধু। তাঁদের সঙ্গে বিরোধের ক্ষেত্র এমনিতেই যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে, সেই সম্পর্ককে আরও বেশী তিক্ত করতে আমি চাই নি। আলোচনায় একবার প্রবেশ করলে তারপর আর সামাজিক সম্পর্কের কথা বিশেষ মনে পড়ে না; বিশেষ, যে আলোচনার মধ্যে ভাবের দ্বন্দ্ব আর আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সুগুপ্ত রয়েছে, সে আলোচনার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার পর সংসারের পটভূমি স্বতঃই ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে থাকে। এমতাবস্থায় বন্ধুজনের মনে আঘাত দেওয়ার অভিপ্রায় না থাকলেও সময়ে সময়ে কার্যগতিকে আঘাত লেখনীমুখে এসে যায়। আর সে অপ্রীতিকর সম্ভাবনাটি নিরোধের জন্মই প্রধানতঃ আমি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলাম।

মুশকিল হচ্ছে যে, আমাদের সামাজিক ব্যক্তিত্ব আর লেখক-ব্যক্তিত্ব এক জিনিস নয়। সমাজ-জীবনে অমায়িক অথচ সাহিত্যের এলাকায় মিত্রামিত্র নির্বিশেষে নির্ভীক সত্যসন্ধ পথের পথিক—এমন আপাত-অদ্ভুত যোগাযোগপূর্ণ একাধিক লেখক-ব্যক্তিত্বের দেখা মিলবে। অথচ সাহিত্যই তো জীবনের একমাত্র সত্য নয়, সমাজের দাবি সাহিত্যের দাবি অপেক্ষা কোন অংশে কম অপ্রতিরোধ্য নয়। এই দুই দাবির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যে কী কঠিন ব্যাপার তা প্রত্যেক অনুভূতিপরায়ণ লেখকই মর্মে

মর্মে জানেন। সাহিত্যের প্রতি একনিষ্ঠ হতে গেলে সমাজের দাবি পূরণ করা হয় না, আবার সামাজিকতার প্রতি অবহিত হতে গেলে সাহিত্যের প্রতি কর্তব্যপালনের ত্রুটি ঘটে। এক দিকে শিল্প-সাহিত্য ও অন্য দিকে জীবনের মধ্যে এই বৈপরীত্য প্রবল বলেই লেখকের ব্যক্তিত্ব এত দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়। লেখকের মনের উপর অত্যন্ত কঠিন এই চাপ। ক্ষুরধার তরবারির উপর চলেও অক্ষত থাকা বোধ হয় সেই তুলনায় অনেক সহজ ব্যাপার।

তবু যোগেশবাবুর আলোচনার আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করলাম। আমার আলোচনায় আমি ব্যক্তিপ্রসঙ্গ যথাসম্ভব পরিহার করতে চেষ্টা করব। আলোচনা তাত্ত্বিক স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে এই আমার ইচ্ছা।

একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেল। যোগেশবাবু তাঁর দ্বিতীয় নিবন্ধে তাঁর প্রথম নিবন্ধেরই জের টেনে চলেছেন। ইতোমধ্যে তাঁর প্রথম প্রবন্ধের জবাবে আমিও যে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ লিখেছিলাম তার বক্তব্যের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ স্থাপনের তিনি প্রয়োজন বোধ করেন নি। আমার আলোচনাকে প্রায় সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে তিনি আপনার ভাবে বিভোর হয়ে তাঁর প্রথম প্রবন্ধের বক্তব্যকে আরও কিছুটা দূর টেনে নিয়ে এসেছেন তাঁর দ্বিতীয় অর্থাৎ বর্তমান নিবন্ধে। তাতে সুবিধা হয়েছে সামান্যই। মদীয় বিনীত আলোচনা সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে পেলে আমার পক্ষে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া সহজতর হত। বিতর্ক বা বাদ-প্রতিবাদঘটিত আলোচনায় মীমাংসা প্রায়শঃ দূরপরাহত হয় এই কারণে যে, উভয় পক্ষই নিজ নিজ বক্তব্যবিস্তারে মশগুল থাকেন, অপর পক্ষের বক্তব্য যথেষ্ট তৎপর হয়ে অনুধাবন করেন না। তাঁদের আলোচনা প্রায়ই সমান্তরাল রেখা অনুসরণ করে চলে, সুতরাং কোন সময়েই

তা একটি বিন্দুতে গিয়ে মিলিত হয় না। বর্তমান ক্ষেত্রেও যে এমনতর ব্যাপার ঘটে নি তা হলফ করে বলা যায় না।

যোগেশবাবু বিদেশী সাহিত্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। বিদেশী যে সকল উপন্যাসে, নাটকে দেহবাদের অবতারণা আছে এমন কতকগুলি বইয়ের তিনি নামোল্লেখ করেছেন। তাঁর তালিকায় আমি নিজেও আমার জানিত কিছু নাম যোগ করতে পারি। নূতন পুরাতন অনেক বইতেই দেহবাদী বিষয় অবলম্বনে কাহিনী রচনা করা হয়েছে, সুতরাং সেটি কিছু অভিনব তথ্য নয়।

একটা জিনিস পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। দেহবাদী বিষয়াবলম্বনে কাহিনী দাঁড় করালেই তা অশ্লীল বা অসৎ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায় না। কে কী ভাবে কী ভাষায় দেহবাদী বিষয়ের বর্ণন করেন তারই উপর নির্ভর করে রচনার ভাল বা মন্দ। দেহবাদী বিষয়মাত্রই অশ্রদ্ধেয় নয়। দেহবাদ যখন মানবজীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত তখন দেহবাদকে সাহিত্যে অস্বীকার করতে চাইলেই তা অস্বীকৃত হয়ে যাবে না। কিন্তু বর্ণনার প্রকারভেদ সর্বথাস্বীকার্য। কেউ দেহবাদী বিষয় ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে স্বীয় রুচি ও প্রবণতার টানে নিরাবরণ ভাষার আশ্রয় নেন, কেউ গভীর শিল্পবোধপ্রসূত সংযমশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে ব্যঞ্জনাপ্রধান লিখনরীতির সাহায্য নেন। ইঙ্গিত ও সংকেতের দ্বারা যে কথা বোঝানো যায়, ইচ্ছা করলেই তাকে চটকে অনাবৃত স্পষ্টতার মধ্যে উদ্‌ঘাটিত করে তোলা সম্ভব, কিন্তু সত্যিকার সৌন্দর্যানুভূতিযুক্ত লেখক কখনও ও পথ মাড়ান না। তাঁর সহজাত সুরুচিই তাঁকে ও পথে চলা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে। তিনি বাস্তববাদী লেখক হয়েও সাহিত্যের বাস্তব আর জীবনের বাস্তবের পার্থক্য এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হন না। তিনি বাস্তবসঙ্গতির আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্ত্বেও মনে মনে জানেন যে, সাহিত্যশিল্প যদি নিছক জীবনের ফোটোগ্রাফ বা হুবহু অনুকৃতি

হত, তা হলে মানুষের পক্ষে শিল্প সাহিত্য ইত্যাদি সৃষ্টির কোন প্রয়োজনই হত না। জীবনের সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র নির্দিষ্ট গণ্ডীকে অতিক্রম করবার জন্যই শিল্প। জীবনের মৃত্তিকা থেকে সে রস আহরণ করে কিন্তু আকাশের আলোয় তার বিস্তার। শিল্প-মাত্রেরই গতি উর্ধ্বমুখী, তার প্রকৃতি মূলতঃ transcendental। এই দিক্ দিয়ে ধর্ম এবং সাহিত্যের প্রকৃতি অভিন্ন। কিন্তু সে কথা বিস্মৃত হয়ে গিয়ে আমরা যদি সাহিত্যকে মাটির সীমানাতেই ধরে রাখবার চেষ্টা করি তা হলে সাহিত্যের ভিতর শুধু সোঁদা আর আঁসটে গন্ধই পেতে থাকব, ফুলের গন্ধ কখনও পাব না।

'ফুল'-এর প্রসঙ্গ তুলতেই আমাকে প্রথাবদ্ধ ভাববাদী সমালোচক ঠাউরে কোণঠাসা করবার চেষ্টা হবে জানি, কিন্তু প্রতিবাদীদের নিরস্ত করে বলি, ভাববাদী কবি-সমালোচকেরা যে অর্থে 'ফুল', 'আকাশ', 'চাঁদের আলো', 'পাখীর গান', 'নদীর ঢেউ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করেন, আমি সে অর্থে 'ফুল' কথাটির ব্যবহার আদপেই করি নি। ও সব এলাকা থেকে এই দুরারোগ্য যুক্তিবাদী লেখকের মন অনেক দূরে অবস্থিত। নিছক ফুলের গন্ধে আর চাঁদের আলোয় আর পাখির গানে এই লেখকের মন কখনও ভরে নি, ভরবেও না কোনদিন। তবে পঙ্ক থেকে পঙ্কজ সৃষ্টির নীতিতে আমি বিশ্বাস করি। দেহ থেকে দেহাতীতে যাওয়ার সাধনাই যে-কোন দেহবাদী লেখকের সাধনা হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। দেহবাদী লেখকের পক্ষে দেহকে সাহিত্যে স্থান দেওয়ায় দোষ নেই, কিন্তু বাস্তবতাচর্চার নামে পাঁক ঘাঁটবার অধিকার কেউ তাঁকে দেয় নি। ভাষার ভঙ্গীতে কেবলই অশ্লীলতার ইঙ্গিত করতে থাকলে অতি বড় উদারচেতা পাঠকসমাজও তাঁকে ক্ষমা করবে কিনা সন্দেহ। যে লেখায় মনের ভিতর ঘিনঘিনে ভাবের উদয় হয়, অভিপ্রায়ের মহত্ত্বের দ্বারা বাস্তবতার মালিন্যের শোধনের কোন চেষ্টা থাকে না,

পাঠকের চিত্তকে কামাশ্রিত প্রবৃত্তির সুড়সুড়ি দিয়ে অধোগামী করা ছাড়া যেখানে লেখকের অন্য কোন অভিপ্রায়ের নাগাল পাওয়া যায় না, সে ক্ষেত্রে সাহিত্যের কল্যাণ, সমাজের কল্যাণ, জাতির কল্যাণ চিন্তা করে সাবধানবাণী উচ্চারণ করার প্রয়োজন আছে বইকি।

আর তা ছাড়া, সংশ্লিষ্ট লেখকদেরও এতে সমূহ লাভ। তাঁরা তাঁদের বিষয়কে অনাবরণ দেহবাদ থেকে স্খলিত করে অন্য খাতে চালিত করবার চেষ্টা করুন, দেখবেন তাঁদের সাহিত্যের প্রকৃতির যেমন রূপান্তর হয়েছে তেমনি তাঁদের ব্যক্তিত্বেরও বদল হয়ে গেছে। এই ব্যক্তিত্বের রূপান্তর সাধন, ক্রমোন্নয়ন সাধন—এই হল শিল্পীর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। বিষয় নির্বাচনের অপরিমিত স্বাধীনতায় অভ্যস্ত বিষয়কে জীর্ণ নির্মোকের মত পিছনে ফেলে আর নূতন নূতন বিষয়ে স্থিরনিবদ্ধচিত্ত হয়ে শিল্পীর এগিয়ে চলা। শিল্পীর এই ক্রমোন্নয়নের আদর্শে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের নিকট দেহবাদ নিতান্তই নীচের ধাপের বস্তু বলে মনে হবে। ও বস্তুতে কেউই সংলগ্ন হয়ে থাকতে ভালবাসেন না, একমাত্র বয়ঃসন্ধিকালীন মানসিকতাযুক্ত শোধনাতীত একগুঁয়ে শিল্পী ছাড়া। দেহবাদের জন্যই যাঁরা দেহবাদ করেন তাঁদের বই মাইকেল মধুসূদনের ভাষায় চণ্ডালের হাত দিয়ে পোড়ালে তবে তাঁদের উচিত শাস্তি হয়।

পাশ্চাত্ত্য কথা-সাহিত্যে দেহবাদী প্রসঙ্গের অবতারণায় কোন ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নীতি অবলম্বন করা হয় না খুবই সত্য কথা, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য লেখকেরা ভাষা ব্যবহারে কোথাও উচ্ছৃঙ্খলতার আশ্রয় নেন না এও সর্বৈব সত্য। সে দেশের প্রায় প্রত্যেকটি উন্নত সাহিত্যে (বিশেষতঃ ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যে) শব্দ ব্যবহারের স্থিরনির্দিষ্ট ঐতিহ্য রয়েছে, সেই বিশিষ্ট ঐতিহ্যকে অস্বীকার বা অতিক্রমণের ক্ষমতা অতিবড় বৈপ্লবিক লেখকেরও

নেই। তাঁরা দেহবাদের চিত্র আঁকতে পারেন, কিন্তু ভাষার অশালীনতার প্রশ্রয় দেন না। যে শব্দ বা ভাষা-প্রয়োগে মনে অশুচি ভাবের উদয় হয় তেমন শব্দ প্রয়োগ তাঁরা সাধ্যমত বর্জন করে চলেন। যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বাস্তবতার নিখুঁত প্রতিধ্বনি হওয়া সত্বেও বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর অনুমোদন বা সাহিত্যের স্বীকৃতি পায় নি, সে শব্দের ব্যবহার সাহিত্যে অপাংক্তেয় থাকে। কেউ গায়ের জোরে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হাস্যাস্পদ হন।

সম্প্রতি দুটি উগ্র দেহবাদী বর্ণনার বিষয়মূলক বই পড়লুম। দুটিই ফরাসী সাহিত্যিকের লেখা। একটি আঁদ্রে জিদের *The Immoralist*, অন্যটি জুলে রোমাঁর *The Body's Rapture*। দুটিই কট্টর অশ্লীল গ্রন্থরূপে কুখ্যাত। প্রথম গ্রন্থটির বিষয় সমকামিতা, দ্বিতীয়টির উপজীব্য নববিবাহিত দম্পতির দেহসম্পর্ক। সম্প্রতি বিতর্কাধীন 'কথা-সাহিত্য ও দেহবাদ' প্রসঙ্গের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই বই দুটি নেড়ে-চেড়ে দেখবার উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্ত্য লেখকেরা কথা-সাহিত্যে দেহ-বাদের বর্ণনায় কতদূর পর্যন্ত যেতে পারেন তার ব্যাপ্তি ও স্বরূপ উপলব্ধি করা। এই সূত্রে নিজের প্রচারিত মতটাকেও একবার নতুন করে যাচাই করে নেবার অভিপ্রায় ছিল। অর্থাৎ আমার মতটা ব্যক্তিগত শুচিবাইপ্রসূত উৎকেন্দ্রিক একটি মত, না, যুক্তিসিদ্ধ ধারণা, শেষোক্ত বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ না থাকা সত্বেও বিশ্বাসটিকে আর একবার ঝালাই করে নিতে চেয়েছিলুম। নিজেকে ক্রমাগত পরীক্ষা করার নীতিতে আমি বিশ্বাসী। সুতরাং নিজের ভুল হলে সে কথা স্বীকার করায় আমার কোন লজ্জা বা সংকোচ নেই। কিন্তু দেখলুম, ভুল তো হয়ই নি, বরং ওই দুটি গ্রন্থ পাঠের পর আমি আমার প্রত্যয়ে আরও সুদৃঢ় হলুম। যাঁরা বাস্তবতাচর্চার নামে সাহিত্যে নিরঙ্কুশ

দেহবাদের সমর্থন করেন এবং ওই সূত্রে খিস্তির ভাষা আর বস্তির ভাষা প্রয়োগে দোষ দেখেন না, তাঁরা কী বলছেন বা কী তাঁরা চান নিজেরাই বোধ হয় ভাল করে জানেন না। তা যদি জানতেন তো ভাষা প্রয়োগে স্বেচ্ছাচারী, পাঠকমনের উপর শব্দের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে চেতনাহীন কতকগুলি স্বল্পশক্তিবিশিষ্ট লেখকের পক্ষ সমর্থনের জন্য এগিয়ে আসতেন না। অনভিজ্ঞদের হয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির লড়াই করার দৃষ্টান্ত বড়ই ক্লেশদায়ক। আলোচ্য গ্রন্থ দুটির বিষয় দেহবাদী সন্দেহ নেই, বিশেষতঃ দ্বিতীয় বইটিতে বইয়ের নামের সার্থকতা প্রতিপাদন করে দেহবাদী বর্ণনার আতিশয্য অতি সুপ্রকট, কিন্তু লেখকদের ভাষা-সংযমে বিস্মিত হতে হয়। বই দুটির কোন একটিতে এমন একটি শব্দও খুঁজে পেলুম না যা অশ্লীল বা অশ্লীলতার ইঙ্গিতবাহী বলে মনে হতে পারে। The Body's Rapture বইটি তো রীতিমত গভীর-গম্ভীর। জিদের উপন্যাসে কাব্যের স্বাদ আছে, কিন্তু এ বইয়ের ভঙ্গী আগাগোড়াই বিশ্লেষণাত্মক ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবজাত। পড়তে পড়তে এক-এক সময় হাঁফ ধরে যায়। অথচ এ সব বইয়ের নজীর টেনেই কিনা আমাদের দেশের তরুণ দেহবাদী লেখকেরা আত্মপক্ষ সমর্থনে প্ররোচিত হন। বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক যে সকল লেখক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেহবাদের বর্ণনা করে দেহবাদকে প্রায় দেহবিলাসের পর্যায়ে এনে ফেলেছেন এবং দেহবাদের ন্যূনতম সমালোচনায় শহীদ হওয়ার মত মুখভাব করেন, তাঁদের কোন ধারণাই নেই পাশ্চাত্ত্য প্রথম শ্রেণীর লেখকেরা দেহবাদ বলতে ঠিক কী জিনিস বোঝেন। এঁরা কাহিনীসর্বস্ব লেখক, কাহিনীতেই এঁদের সকল জারিজুরি নিঃশেষিত। তাঁরা কী করে জানবেন উৎকৃষ্ট উপন্যাসে কোথায় কী উদ্দেশ্যে কেন দেহবাদের অবতারণা করা হয়। কাহিনীর বুদ্ধিগত পটভূমি হৃদয়ঙ্গম না হলে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে দেহবাদ

স্থূলবুদ্ধির নিকট নিছক দেহবাদ মনে হওয়াই স্বাভাবিক। দেহ-বাদের অবতারণা আর ভাষা ব্যবহারে উচ্ছৃঙ্খলতা এক বস্তু নয়। প্রথমটি মহৎ অভিপ্রায়যুক্ত ও শিল্প-সংযমসম্মত হয়ে প্রায়শঃ সৎ সাহিত্যের কোঠায় উত্তীর্ণ হয়; দ্বিতীয়টি নিছকই গ্রাম্যতার পরিচায়ক। সাহিত্য থেকে সর্বপ্রকার গ্রাম্যতা আর অভব্যতা ঝেঁটিয়ে বিদায় করবার জন্যই প্রগতিশীল আদর্শের উদ্ভাবনা, সাহিত্যের সুরকে টেনে নামাবার জন্য নয়। একই সঙ্গে প্রগতি-শীলতার উদ্‌গাতা হয়ে ভাষায় উচ্ছৃঙ্খলতা কী ভাবে সমর্থন করা যায় ভাল বোঝা যায় না।

আজকাল অবশ্য সব সাহিত্যেই বাস্তবতার অজুহাতে কিছু কিছু উন্মুক্ত দেহবাদচর্চার সূত্রপাত হয়েছে, সাম্প্রতিক ফরাসী সাহিত্যে এ জিনিসের বান ডেকেছে বললেও চলে, কিন্তু ওগুলিকে সাহিত্য না বলে পোর্নোগ্রাফি বলাই ভাল। পোর্নোগ্রাফির গায়ে নামী লেখকের লেবেল আঁটলেই সেটি সৎ সাহিত্যের কোঠায় উত্তীর্ণ হয় না।

ভাল-মন্দ সৎ-অসৎ সব-কিছু দেখা জানা ও পড়া-র কথা যোগেশবাবু বলেছেন। তাতে নাকি তুলনামূলক বিচারসহায়ে মনের প্রসার ও মননক্ষমতার সম্যক্ অনুশীলন হয়। হয় সন্দেহ নেই, তবে সেটি বয়স্কদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা ভাল, তরুণ-বয়সী পাঠকদের সামনে সেই এক্সপেরিমেণ্টের সুযোগ উন্মুক্ত করলে তাতে হিতে বিপরীত ফল ঘটবার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত। ওই পথে বিচারক্ষমতা অর্জনের পরামর্শ নিরাপদ দূরত্ব থেকে সকলেই দিতে পারেন কিন্তু যাদের সেই বিপজ্জনক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে তাদের অবস্থাটা চিন্তা করে দেখা দরকার। পাপ পুণ্য জীবনের এই দুটি দিক সম্পর্কেই সম্যক্ জ্ঞান থাকা আবশ্যক, তা না হলে নাকি জীবনের বৃত্ত পূর্ণ হয় না, ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না। কিন্তু কেউ কেউ এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এমন ছুটিয়ে পাপের

জ্ঞান আয়ত্ত করতে আরম্ভ করেন যে জীবনে আর তাদের পুণ্যের শ্রীমুখ দেখার সৌভাগ্যই হয় না। সমাজজীবনের এমন কতকগুলি অন্ধকার দিক আছে যার সম্পর্কে পরিচয় না থাকাটাই ভাল। যা-কিছু সংসারে ঘটে তা-ই সাহিত্যে প্রতিফলিত হওয়ার যোগ্য নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অজ্ঞতা স্পষ্টতঃই সমর্থনীয়। ইউরোপীয় sexologyর বইয়ের কথাই ধরুন। ওই সাহিত্য বৈজ্ঞানিক যৌনজ্ঞান ছড়াবার নামে প্রায়শঃ যে তরুণ-তরুণীদের কচি মাথা চিবিয়ে খায় সে কথা কে না জানে। পুত্রসন্তানের প্রতি মায়ের মধুর-বাৎসল্য বা কন্যার প্রতি পিতার সস্নেহ আচরণের মধ্যে কী কী complex লুকিয়ে আছে সে জেনে কোন্ চতুর্বর্গ ফল হয় জানি না, মাঝ থেকে পিতা-পুত্রী মাতা-পুত্রের সম্পর্কটা অযথা সংকুচিত আড়ষ্ট হয়ে যায়—এই তো সাকুল্য লাভ হয় দেখি। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে পদে পদে যদি স্বর্গ থেকে পতন ঘটতে থাকে তবে তেমন জ্ঞানবৃক্ষের ধারে-কাছে না যাওয়াই ভাল। জীবনকে সুন্দরভাবে সার্থকভাবে কল্যাণময়ভাবে যাপন করবার জন্যই জ্ঞান; জীবন-নিরপেক্ষ জ্ঞানের বিশেষ কোন মূল্য নেই। অধিকারীভেদে কিছু-কিছু ব্যক্তি-বিশেষ অর্থাৎ বিশেষজ্ঞদের নিকট বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সর্বসাধারণকে ওই জ্ঞানের অংশীদার হবার পরামর্শ দিলে বিপজ্জনক পরামর্শ দেওয়া হয় বলে আমার বিশ্বাস।

আর বয়স্ক পাঠকদেরও ভাল-মন্দ সব রকম বই পড়তে হবে এমন কী কথা আছে? যাঁরা সৎ সাহিত্য সৎ দর্শন সৎ ভাবের পরিমণ্ডলের মধ্যে জীবন যাপন করতে চান তাঁরা নিরবচ্ছিন্ন ওই-জাতীয় গ্রন্থই পছন্দ করবেন, সংসারের পূর্ণজ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে ভাল-মন্দ সব রকমের বই ঘেঁটে মনের আত্মসমাহিত স্থৈর্যকে চঞ্চল করে তোলার নীতি তাঁরা স্বীকার করবেন বলে মনে হয় না। নিছক পর্যবেক্ষণ-নির্ভর গল্প-উপন্যাস, যা শুধু কথার সমষ্টি, যার

পিছনে গূঢ় অভিপ্রায়ের দ্যোতনা নেই, যা অর্থান্বিত নয়, যার মধ্যে, অধিকন্তু, প্রায়শঃ অনুচিত বিষয়ের বর্ণনা থাকে, তেমন বই তাঁরা চিমটের সাহায্যে ছুঁতেও রাজী হবেন কি না সন্দেহ। বাক্ যেখানে অর্থের দ্বারা সম্পৃক্ত নয়, সে স্থলে বাক্ কথার জঞ্জাল মাত্র। জীবনের লৌকিক দিকের পরিচয় লাভের জন্য প্রত্যক্ষ সাংসারিক অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট, তার জন্য কথামাত্রসার নিরবচ্ছিন্ন-পর্যবেক্ষণনির্ভর বাস্তবানুকারী ও কাহিনীসর্বস্ব গ্রন্থাদির দ্বারস্থ হওয়ার আবশ্যকতা নেই। এতে মন বিক্ষিপ্ত হয়, মন চঞ্চল হয়, মন উচ্চ ভাবের পরিবেশবিচ্যুত হয়। সংসারে এত এত সৎ গ্রন্থ পড়বার জন্য ছড়িয়ে রয়েছে, বাংলা সাহিত্যের হাল ফ্যাশানের রম্যতাপ্রয়াসী দেহবাদী গল্প-উপন্যাস না পড়লে মনের বিচার-ক্ষমতা অপরিপক্ক থাকবে—এতটা প্রাধান্য সাময়িক সাহিত্যকে দিলে অকিঞ্চিৎকর বিষয়কে অনুচিত মর্যাদা দেওয়া হয়।

পরিশিষ্ট
(আলোচনা)

১

'শনিবারের চিঠি'র গত শ্রাবণ সংখ্যায় (১৩৬৪) খ্যাতিমান সমালোচক শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর 'কথাসাহিত্য ও দেহবাদ'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে নারায়ণবাবুর বক্তব্য সুপরিষ্কার হলেও অনেক স্থলে প্রমাণ প্রয়োগের এবং উদাহরণের অপেক্ষা রাখে, এবং তাঁর বক্তব্য সর্বথা গ্রহণীয় কি না এ প্রশ্ন থেকে যায়, যার আলোচনা ও মীমাংসা প্রথমে হওয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়। আমি এই শেষোক্ত প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করতে চাই।

প্রশ্নটি এই, সাহিত্য কাদের জন্য লেখা হয়? আশা করি সকলেই এ কথা স্বীকার করবেন, পাঠকদের শ্রেণীভেদ আছে। শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, সকল বয়সের নরনারী পাঠক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। "যারা বাংলা আর হিন্দী সিনেমা-ছবির নিয়মিত দর্শক, মোহনবাগান-ঈস্টবেঙ্গলের প্রসঙ্গ নিয়ে ফাটাফাটি পর্যন্ত করতে প্রস্তুত, রকে বসে ডালমুট আর হাফ-চায়ের সঙ্গে দৈনিক পত্রিকা পড়া অবধি যাদের সংস্কৃতিচর্চার দৌড, খেলোয়াড় আর সিনেমা-স্টারদের অন্ধিসন্ধি যাদের নখদর্পণে" তারাও যেমন পাঠকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তেমনই বয়স্ক নরনারীরাও "যাদের ক্রমে ক্রমে মনের বয়স বাড়ে, বিচারবুদ্ধি পরিণত হয়, জীবনের অভিজ্ঞতা দানা বাঁধে"— তারাও পাঠকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আবার এই দুই সীমান্তের মধ্যেও আরও বহু শ্রেণীর বা স্তরের পাঠক বর্তমান। এখন প্রশ্ন এই, লেখক কাদের জন্য লিখবেন? এই প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করবার আগে পাঠকদের শ্রেণীবিভাগকে একটা সমালোচনাসঙ্গত ভিত্তিতে দাঁড় করানো প্রয়োজন।

মোটামুটিভাবে পাঠকদের সাহিত্যপাঠে অধিকারী ও অনধিকারী এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করলে বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাদের মনও পরিণত হয়েছে, বিচারবুদ্ধি পরিপক্কতা লাভ করেছে এবং যারা জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তারাই প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যপাঠের অধিকারী, এবং সাহিত্য তাদের জন্যই লিখিত হওয়া উচিত। অপর পক্ষে

পূর্বোক্ত শ্রেণীর পাঠক বাদে অন্যান্য সকল পাঠকই সাহিত্যপাঠের অনধিকারী, যদিও এই শেষোক্ত শ্রেণীর পাঠকসংখ্যা বাস্তবিকপক্ষে প্রথমোক্ত শ্রেণীর পাঠক অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যেও সাহিত্যের অল্পাধিক রসাস্বাদনে সমর্থ পাঠক-পাঠিকা থাকা অসম্ভব নয়, এবং আছেও। তৎসত্ত্বেও প্রকৃত রসজ্ঞ পাঠক একমাত্র প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যেই পাওয়া যাবে।

এখন প্রশ্ন এই, সাহিত্যিক কাদের জন্য লিখবেন? রসজ্ঞ অভিজ্ঞ পাঠকের জন্য, না, অনভিজ্ঞ অপরিণতমনা অরসিক পাঠকের জন্য? এ প্রশ্নের মীমাংসা এই জন্য প্রয়োজন যে নারায়ণবাবু প্রবন্ধের শেষভাগে সঙ্গতভাবেই 'ক্ষতিকর সাহিত্য প্রচারে'র কথা তুলেছেন। কিন্তু কাদের পক্ষে ক্ষতিকর? অধিকারী পাঠকের পক্ষে কোনও শ্রেণীর পুস্তকই সম্ভবত 'ক্ষতিকর' হতে পারে না। নারায়ণবাবু নিজেই স্বীকার করেছেন, "এ-জাতীয় (দেহবাদী) রচনা এবং রচনাকারকে তিনি (বয়স্ক পাঠক) অক্লেশেই অস্বীকার করতে পারেন, করেও থাকেন।" আমি কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বলতে চাই, অভিজ্ঞ রসজ্ঞ পাঠক সকল ক্ষেত্রেই সমগ্রভাবে সাহিত্য-বিচারের মাপকাঠি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস সার্থক হয়েছে কি না অর্থাৎ সত্যকারের সাহিত্যসৃষ্টি হয়েছে কি না। এই সাহিত্যিক বিচার সামগ্রিকভাবে হওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থের স্থানবিশেষ বা অংশবিশেষের প্রতি আবদ্ধদৃষ্টি হয়ে বিচার করলে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাই সমধিক।

অপর পক্ষে অনভিজ্ঞ অপরিণতমনা পাঠকের বা পাঠকসম্প্রদায়ের পক্ষে 'ক্ষতিকর' বলে সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াসকে নিরস্ত করার চেষ্টায় বিপদ আছে, এবং এর সীমারেখা টানাও সহজ নয়। দৃষ্টান্ত দিয়ে আমার বক্তব্যকে আরও একটু পরিষ্কার করে বলতে চাই। শরৎবাবুর লেখা 'চরিত্রহীন' ও 'দেবদাস' এই দুইখানির কথাই ধরা যাক। অপরিণতমনা পাঠকের পক্ষে 'চরিত্রহীন' পাঠের পর যদি মনে হয় যে, মেসের অথবা বাড়ির ঝি-শ্রেণীর মধ্যেও নায়িকা ও প্রিয়া হবার উপযুক্ত নারী পাওয়া অসম্ভব নয়, এবং এই সিদ্ধান্তের দ্বারা সে যদি জীবনে প্রভাবিত হয়ে ঝি-শ্রেণীর মধ্যে নায়িকা ও প্রিয়ার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয় তা হলে তার পক্ষে 'চরিত্রহীন' পাঠ ক্ষতিকর হবে সন্দেহ নেই। আবার 'দেবদাস' পাঠের পর তার মনে হতে পারে যে, বারাঙ্গনা-শ্রেণীর মধ্যেও এমন নারী থাকা অসম্ভব নয়, সত্যকার প্রেমের স্পর্শে যার সমস্ত কলঙ্ক বিধৌত হয়ে যেতে পারে এবং যার ভিতর থেকে কুমারী নারী

'বাহিরিয়া' আসতে পারে, এবং এই মনে হওয়ার দ্বারা অনভিজ্ঞ পাঠক যদি তার জীবনে প্রভাবিত হয়ে চলতে যায়, তা হলে তা গুরুতর ক্ষতিকর হতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা বলে কি এ কথা বলা চলে যে 'চরিত্রহীন' ও 'দেবদাস' সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি নয়? শরৎবাবুর এ-জাতীয় বই লেখাই উচিত হয় নি? ক্ষতিকর সাহিত্য প্রচারের তর্ক বহুদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে বলা যেতে পারে যে, এই দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে সুবোধ ঘোষের 'ভারত প্রেম কথা'ও ক্ষতিকর সাহিত্য। এ কথা বলা যেতে পারে, মহাভারত থেকে বেছে বেছে এমন সব কাহিনীর কঙ্কালকে রক্তমাংসে পরিপুষ্ট করে পাঠকের সামনে তিনি উপস্থাপিত করেছেন, যাতে এক শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকারা অন্যায় ও অবৈধ মেলামেশার স্বপক্ষে প্রাচীন নজির তথা sanction খুঁজে পায়। এ ক্ষেত্রে এ কথা বলা কি উচিত হবে বা এ সিদ্ধান্ত কি সমীচীন হবে যে, সুবোধবাবুর 'ভারত প্রেম কথা' রচনায় অগ্রসর হওয়াই উচিত হয়নি?

নিছক সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে চলবে না, সামগ্রিক ভাবে বিচারের প্রয়োজন নেই, বাস্তব জীবনের বিচিত্র অভিনয়ের প্রতি প্রসারিতদৃষ্টি হলে ভাল হবে না; কেবলমাত্র অনধিকারী পাঠকের পক্ষে ক্ষতিকর কি না এই প্রশ্নই সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি হবে? আমার মনে হয়, এ সিদ্ধান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয়। এই মাপকাঠি দিয়ে সাহিত্যসৃষ্টির প্রকৃত মূল্য-নিরূপণ সম্ভব নয়।

এইবার নারায়ণবাবুর মূল বক্তব্যে আসা যাক। এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বাংলা সাহিত্যে 'দেহবাদ' (আমার কাছে 'দেহবিলাস' কথাটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়) নিয়ে আলোচনা এই প্রথম নয়। 'শনিবারের চিঠি' এই মতের সমর্থক, এবং এই মত অবলম্বন করে দীর্ঘকাল সাহিত্যক্ষেত্রে তীব্র সংগ্রাম পরিচালনা করে এসেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন পাঠকমাত্রেই 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকদের সঙ্গে 'শনিবারের চিঠি'র দেহবাদ নিয়ে তীব্র মতভেদ, বিরোধ ও তার পরিণতির ইতিহাস জানেন। 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' নির্ণয় করতে এক সময় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ রথীমহারথীরাও আসরে নেমেছিলেন। এ সম্বন্ধে তখনও তীব্র মতদ্বৈধ ছিল, আজও আছে, পরেও থাকবে বলেই মনে হয়।

কিন্তু এখানে নারায়ণবাবুর কথাই আলোচনা করা যাক। তিনি বলেছেন,

"এঁদের (দেহবাদী সাহিত্যিকদের) যুক্তি হল এই যে, জীবনযাত্রার প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন আর অক্ষুণ্ণ থাকবার মূলে রয়েছে কাম, সুতরাং এই মৌলিক প্রবৃত্তিকে বাদ দিয়ে সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস কখনও স্বাভাবিক পদবাচ্য হতে পারে না। যুগ যুগ ধরে আদিরস সাহিত্যের অন্যতম প্রধান অবলম্বন, তাকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না।" নারায়ণবাবু নিজেই লিখেছেন—কথাটা অনস্বীকার্য সন্দেহ নেই। আলোচ্য প্রবন্ধের আর এক স্থানে তিনি বলেছেন, —"যে-কোনও মানুষের মনোজীবনের বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যাবে, তার দেহমনে যখন তারুণ্যলক্ষণের সঞ্চার হয় সে সমস্ত জগৎটাকে কেবল প্রেমময় দেখে। আর সে প্রেমও পরিণত বোধবুদ্ধির উপলব্ধ প্রেম নয়, নিতান্তই ছেলে-মানুষী প্রেম, যার ভিতর দেহজ বাসনাই সর্বাধিক বলবৎ। কিন্তু ধীরে ধীরে এই একমুখীন আবিষ্টতার অবসান ঘটে। বয়োবৃদ্ধির আর অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তার গ্রহণক্ষমতার প্রসার ঘটতে থাকে।" সম্পূর্ণ সত্য কথা। কিন্তু এ বিচার পরিণত মনের বিচার এ কথা মনে রাখা ͐য়োজন—প্রথম জীবনের উন্মেষের সময় থেকে পূর্বোক্ত একমুখীন আবিষ্টতার অবসান পর্যন্ত সময় মানব-জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এবং সময়ের পরিমাণেও মাত্র দুই-একটা বৎসর নয়। সম্ভবতঃ মানবমাত্রই জীবনে এই সময়ে সর্বাপেক্ষা সুখী, সারা পৃথিবী তার কাছে অপরূপ সুন্দর, আশায়-আকাঙ্ক্ষায় হাসি-আনন্দে সে এই সময়ে ঝলমল করে। "ওই কালোচিত মনন আর অনুভূতি আর কল্পনা নিয়ে যারা সাহিত্যসেবায় অবতীর্ণ, বস্তুতঃ ওই যাদের মূল পুঁজি" তাদের কাছ থেকে সাহিত্যের এতটুকু শ্রীবৃদ্ধি কেন আশা করা যাবে না—তা বুঝতে পারি না। যাঁরা আশা করেন না, তাঁরা গালি না দিয়ে এবং উদ্দেশ্য আরোপ না করে এ কথা স্বীকার করে নেন না কেন যে, জীবনের পূর্বোক্ত একমুখীন আবিষ্টতার সময়কে অবলম্বন করে সাহিত্যসৃষ্টির অধিকার সাহিত্যিকের সম্পূর্ণই আছে—ছোটগল্প, কবিতা ও নাটকের মাধ্যমে তো বটেই, এমন কি উপন্যাসের মধ্য দিয়েও আছে। সমগ্র জীবনকে সাহিত্যপরিধির মধ্যে সার্থকভাবে আনতে পারলে শ্রেষ্ঠ কথাকারের মর্যাদা লাভ করা যায় এ কথা যেমন সত্য, তেমন এ কথাও সত্য যে, জীবনের যে কোনও অংশকে, যে কোনও 'পিরিয়ড'কে অবলম্বন করে সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াসে কোনও বাধা নেই, থাকা উচিত নয়, এবং সার্থক প্রয়াসের ক্ষেত্রে সাহিত্যিক যোগ্য মর্যাদা ও স্বীকৃতির অধিকারী।

পরিশিষ্ট

আলোচ্য প্রবন্ধে নারায়ণবাবু কয়েকজন খ্যাতনামা লেখককে "দেহবাদের জন্যই দেহবাদী রচনার প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শনের দোষে দোষী" বলে রায় দিয়েছেন। তাঁর এ সিদ্ধান্ত বিনা প্রমাণে ও বিনা বিচারে মেনে নেওয়া অন্যায় হবে বলেই মনে হয়। শুধু তাই নয়, সাহিত্যে 'দেহবাদ' যে কেবল "আধুনিক বৈদেশিক সাহিত্যের ভাবধারায় পুষ্ট", "দেশীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যের সহিত সম্পর্করহিত"—এ মত সম্পূর্ণভাবে বিচারসাপেক্ষ। শুধু-মাত্র আধুনিক বৈদেশিক সাহিত্যের ভাবধারায় পুষ্ট হলেও দেহবাদী সাহিত্যিকদের পক্ষে একটি বিপুল সমর্থন ও যুক্তি থেকে যায়। তা ছাড়া আমি দেখাতে চেষ্টা করব দেশজ সাহিত্যের ঐতিহ্য এই তথাকথিত দেহবাদী সাহিত্যিকদেরই স্বপক্ষে, বিপক্ষে নয়।

দেশজ সাহিত্যের ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা করতে গেলে কেবলমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনাই সম্ভবতঃ সঙ্গত হবে। সংস্কৃত সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই সম্ভবতঃ এ কথা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবেন যে, সংস্কৃত-সাহিত্যপাঠকের পক্ষে দেহবাদ বা দেহবিলাস নিয়ে শুচিবায়ুগ্রস্ত থাকা সম্ভব নয়।

আর্যগ্রন্থ সংস্কৃত 'মহাভারত' পর্যালোচনা করলে নারায়ণবাবু দেখতে পাবেন—মহাভারতে অনেক জায়গায় এমন সব কথা বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে, যা তাঁর মতে শুধু অশ্লীল নয়, ঘৃণ্য বলেই মনে হবে।

অথচ সামগ্রিক বিচারে শ্রেষ্ঠ সমালোচক ও রসজ্ঞ পাঠক সংস্কৃত মহাভারতকে সর্ববাদীসম্মতভাবে বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে স্বীকার করেন এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক মনীষীর মতে সংস্কৃত মহাভারত তুলনামূলক বিচারে বিশ্বসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

মহাভারতের বহু পরে রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্যগুলি আলোচনা করলেও দেখা যায়, দেহবিলাসের এমন বহু চিত্র সেখানে আঁকা রয়েছে যা হয়তো পর্নোগ্রাফিকেও হার মানায়। আমি মহাকবি কালিদাসের 'শৃঙ্গারতিলকে'র উল্লেখ করতে চাই না। মাঘ, ভারবি, নৈষধ—বাস্তবিকপক্ষে কোন মহাকাব্যই এর ব্যতিক্রম নয়। মহাকবিরা এসব ক্ষেত্রে ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনার বেশী ধার ধারেন নি, যা বলবার তা সোজাসুজি ও স্পষ্টাপষ্টভাবে (directly and bluntly) বলেছেন। তা সত্ত্বেও, এর প্রত্যেকখানিই সর্ববাদীসম্মতভাবে শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য বলে স্বীকৃত।

আসল কথা এই, প্রাচীনকালে ঋষি থেকে আরম্ভ করে লৌকিক লেখকেরা পর্যন্ত সকলেই মানবজীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মত দেহবিলাসকেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে সঙ্গতভাবেই মনে করতেন, এবং তাঁদের লেখায় বিনা-দ্বিধায় দেহবিলাসের চিত্রও অঙ্কিত করেছেন। কিন্তু এই সব চিত্রের জন্য সামগ্রিক বিচারে তাঁদের কাব্যের উৎকর্ষ ক্ষুণ্ণ হয়েছে বা গৌরবের হানি হয়েছে—এ সিদ্ধান্ত কোনও দিনই গৃহীত হয় নি। এবং এ কথাও বলা প্রয়োজন, তাঁরাও যেমন শুধু দেহবিলাসকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচনা করেন নি, আধুনিক সাহিত্যিকেরাও তা করছেন না। প্রকৃতপক্ষে শুধু দেহবিলাস বা দেহবাদকে অবলম্বন করে 'সাহিত্য' রচনা সম্ভব বলেই মনে হয় না। সে চেষ্টা কোথায়ও কেউ করেন নি, এ কথা বলতে চাই না; কিন্তু বায়রনের নিষিদ্ধ গ্রন্থের মত সে সৃষ্টি সাহিত্য বলে গৃহীত হয় নি, এবং তা নিয়ে আলোচনা নিস্প্রয়োজন বলে মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন, প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা অলঙ্কারশাস্ত্রের আলোচনায় অশ্লীলতাকে দোষ বলে মনে করলেও স্থানবিশেষে অশ্লীলতাকে মেনে নেওয়া যায় এ কথা স্বীকার করেছেন এবং এই প্রতিপ্রসবের ক্ষেত্রের ব্যাপকতাও কম নয়। অশ্লীলতা তথা অন্যান্য বহু দোষ থাকা সত্ত্বেও সামগ্রিক বিচারে প্রাচীন প্রায় সকল মহাকাব্যই শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য অর্থাৎ সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি বলে স্বীকৃত হয়েছে। অপরপক্ষে কেবলমাত্র কোনও বিশেষ একটি অথবা বহু দোষের জন্যই কোনও সুপরিচিত গ্রন্থ সর্বথা নিন্দিত হয়েছে অর্থাৎ সাহিত্যসৃষ্টির অসার্থক প্রয়াসের উদাহরণ বলে মনে করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

পরিশেষে একটি ছোট প্রচলিত গল্পের উল্লেখ করে আমার এ প্রবন্ধের ছেদ টানতে চাই। মহাকবি শ্রীহর্ষ 'নৈষধচরিত' রচনার পর তাঁর মাতুল মম্মট ভট্টকে গ্রন্থখানি পড়তে দিয়ে তাঁর মতামত জানতে চান। সমালোচক ও আলঙ্কারিক মাতুল গ্রন্থপাঠ শেষ হবার পর শ্রীহর্ষকে বলেন. "দেখ, অলঙ্কারশাস্ত্রের উপর আমি সম্প্রতি যে গ্রন্থ রচনা করেছি, তার 'দোষ' অধ্যায় লিখতে গিয়ে আমাকে গুরুতর পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং বহু পুস্তক অনুসন্ধান করে দোষের উদাহরণ বার করতে হয়েছে। তোমার এই নৈষধচরিত আর কিছুদিন আগে রচিত হলে আমায় এত পরিশ্রম করতে হত

না। তোমার এই একখানা বই থেকেই আমার প্রয়োজনীয় সব উদাহরণ মিলত।"

আলঙ্কারিক মাতুলের এই সমালোচনা সত্ত্বেও শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত' সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য বলে সর্বজনস্বীকৃত।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

২

যাঁরা সাহিত্যে দেহবাদের বিরুদ্ধপন্থী, তাঁরা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এই মত প্রকাশ করেন যে, দেহবাদী সাহিত্য সমাজের পক্ষে চরম ক্ষতিকর। তাঁদের এই বক্তব্য আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখার প্রয়োজন আছে। কোন বিষয় জোরের সঙ্গে বার বার বললেই তা সত্য হয়ে দাঁড়ায় না। যদি দেখা যায়, দেহবাদী সাহিত্য সমাজের ক্ষতিসাধন করে, তা হলেও সেই ক্ষতির প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ণয়ের প্রয়োজন। এবং আরও দেখা দরকার (স্থান কাল পাত্রের পরিবর্তন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থেকে) বর্তমান যুগে সেই ক্ষতি থেকে পাঠকসাধারণকে বাঁচানো সম্ভব কি না! অথবা দেখা যাবে সেই ক্ষতির সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিলে বর্তমানযুগে বিশেষ কোনও ঝুঁকি স্বীকার করে নেওয়া হয় না। বরং দেহবাদী সাহিত্যও জীবন তথা মানবচরিত্র ও সমাজকে চেনবার, জানবার ও বোঝবার—এক কথায় মনের পরিণতি লাভের সহায়ক হয়ে ওঠে এবং রসবোধের পরিপুষ্টিতেও সহায়তা করে।

সাহিত্য যেমন জীবনের প্রতিচ্ছবি, তেমন ব্যষ্টি তথা সমষ্টির জীবনকেও অর্থাৎ সমাজকেও সাহিত্য গুরুতরভাবে প্রভাবিত করে বা করতে পারে—এ কথা কেউই অস্বীকার করেন না। ইতিহাসের সাক্ষ্য এ বিষয়ে সুস্পষ্ট। অতএব এ কথা স্বীকার করতে কোন বাধা নেই যে, কোন কোন বিশেষ ধরনের রচনা বা সৃষ্টি পাঠকসাধারণ ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই, কোন্ শ্রেণীর রচনা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়?

সমাজরক্ষার প্রয়োজনে মানবজীবনের কার্যাবলীকে পাপপুণ্য বা ভালমন্দ—এই দুই বিশাল শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এই বিভাগ সর্বকালে সকল দেশে দেখা গেছে। কোন মানুষই জীবনে এই পাপপুণ্য বা ভালমন্দের দ্বন্দ্ব থেকে একেবারে পরিত্রাণ পায় না। সমাজজীবনেও এই দ্বন্দ্ব অনুক্ষণ

পরিদৃশ্যমান। অতএব অপরিহার্যভাবেই এই দ্বন্দ্বের প্রতিফলন সাহিত্যে দেখা যায়। প্রাচীন সমালোচকদের মতে, যেখানে এই দ্বন্দ্বের পরিণতি হয় পাপের জয়ে ও পুণ্যের পরাজয়ে, মন্দের বিজয়ে ও ভালর অস্বীকৃতিতে, সেইখানেই সাহিত্য সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায় এবং পাপ ও মন্দের জয়কে যতখানি বড় করে সাহিত্যে দেখানো হবে, পাঠকসাধারণের উপর প্রতিক্রিয়া ততখানি গুরুতর হতে পারে।

প্রাচান কালে এই ছিল আমাদের দেশে লেখক তথা সমালোচকদের আদর্শ। কিন্তু এই আদর্শ পাশ্চাত্ত্য দেশে কখনও পুরোপুরি স্বীকৃত হয়নি। বাস্তব জীবনে পাপপুণ্যের, ভালমন্দের দ্বন্দ্বে পাপ বা মন্দের সর্বত্র যে পরাজয় ঘটে, এ কথা সত্য নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই তার বিপরীতই সত্য হয়ে দেখা দেয়। তা ছাড়া, দেশকালপাত্রভেদে পাপপুণ্যের আদর্শেরও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। অতত্রব সেখানে পাঠক-সাধারণকে সুশিক্ষা দেওয়ার জন্য সাহিত্যে কেবলমাত্র আদর্শের জয়গান করতে তাঁরা রাজী হন নি। তৎসত্ত্বেও সেখানে প্রকৃত রসসৃষ্টির পক্ষে কোনও বাধা হয় নি। এবং রসসৃষ্টির প্রচেষ্টা যেখানে সার্থক হয়ে উঠেছে, সেখানেই স্রষ্টা সাহিত্যিকের যোগ্য মর্যাদা ও গৌরব লাভ করেছেন।

সার্থক রসসৃষ্টির জন্য সাহিত্যপদবাচ্য হয়েছে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে সমাজের পক্ষে গুরুতর ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে,—এমন কোন রচনার কথা আমার জানা নেই। সাহিত্যে দেহবাদের বিরুদ্ধপন্থী সমালোচকেরা যখন কোন তথাকথিত দেহবাদী সাহিত্যিকের কোনও রচনা নিয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন, তখন স্পষ্ট করে বলেন না যে, আলোচ্য রচনা সাহিত্য হয়েছে কি না। সু-সাহিত্য ও কু-সাহিত্য বা সৎ-সাহিত্য ও অসৎ-সাহিত্য আখ্যা দিয়ে সাহিত্যের যে শ্রেণী-বিভাগ করার চেষ্টা করা হয়, তা অবাস্তব ও অসমীচীন। বিশেষতঃ সোনার পাথর বাটির ন্যায় কু-সাহিত্য বা অসৎ-সাহিত্য ইত্যাদি শব্দ স্ববিরোধী ও অর্থহীন। কোনও রচনা হয় সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি, না হয়, নয়—সাহিত্য-বিচারের এই শেষ কথা।

সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও কোনও রচনায় বহু দোষ থাকতে পারে। যদি প্রতিপক্ষের সমালোচকগণ স্বীকার করেন যে, এ দেশে বা বিদেশে কোনও একজন দেহবাদী সাহিত্যিকের একটি রচনাও, একখানি গ্রন্থও যথার্থ সাহিত্যসৃষ্টি হয়েছে তা হলে সাহিত্যে দেহবাদের বিরুদ্ধতা তাঁরা

করতে পারেন না, করলেও তা বিচারসঙ্গত হবে না; আর যদি তাঁরা বলেন যে, দেহবাদকে অবলম্বন করে সাহিত্যে অশ্লীলতা, কুরুচি, অশোভনতা ইত্যাদি দোষের আমদানি করা হচ্ছে এবং সে কারণে সাধারণ অপরিণত পাঠকসম্প্রদায়ের মনের উপর বিষময় প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে এবং সেই হেতু এই দেহবাদী সাহিত্য সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হচ্ছে, তা হলেও এই মত বিচারসহ কি না দেখা প্রয়োজন এবং ক্ষতির প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ণয় প্রয়োজন।

এই নির্ণয়ের জন্য আর একটি বিষয়ের আলোচনা দরকার। সাহিত্যের অন্তর্গত তিনটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। এখানে কথা-সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। কথা-সাহিত্যের বিষয়বস্তু (subject-matter), চরিত্রচিত্রণ ও ঘটনাবর্ণনা তিনটিই গুরুত্বপূর্ণ—ঘটনাবর্ণনায় অশ্লীলতা, কুরুচি বা অশোভনতাদোষ ঘটতে পারে। কিন্তু পরিণত রসজ্ঞ পাঠকের কথা দূরে থাক্, অপরিণত পাঠক-মনেও তার প্রতিক্রিয়া নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। সাময়িক চঞ্চলতা ছাড়া অন্য কোন স্থায়ী কুফলের আশঙ্কা তাতে নেই। এখানে বলা আবশ্যক যে, যে সব তথাকথিত দেহবাদী সাহিত্যিকের লেখা সম্বন্ধে আপত্তি উঠেছে, তাঁদের প্রায় কারও লেখাতেই আমি ঘটনাবর্ণনায় এই সব দোষ দেখতে পাই নি। বরং প্রাচীন সাহিত্যিকদের অনেকের লেখাতেই এই সব দোষ দেখতে পাওয়া যায়। আর চরিত্রচিত্রণে যে কোনও জাতীয় চরিত্রই সাহিত্যের গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে—এ বিষয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ নেই। সবচেয়ে ভাল আর সবচেয়ে খারাপ স্ত্রীপুরুষের অজস্র নজির সকল দেশের সাহিত্যেই পাওয়া যায়। সবচেয়ে খারাপ যারা, তাদের খারাপ করেই দেখানো হয়। অতএব সেখানে কুফলের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বিপদ হচ্ছে বিষয়বস্তু নিয়ে। এ কথা স্বীকার করি, বিষয়বস্তুর প্রতিক্রিয়া পাঠকমনের উপর গুরুতর এবং এর প্রভাব বহু ক্ষেত্রে মনের উপর দীর্ঘকালস্থায়ী। কিন্তু দেহবাদের দিক দিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে কোনও রকমের কাহিনীই বাদ পড়ে নি। পরকীয়া প্রেম তো সাহিত্যের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। এক পুরুষ বহু নারীর সঙ্গে জীবনে প্রেম করেছে—রমাঁ রলাঁর মত ঋষিকল্প লেখকের 'জাঁ-ক্রিস্তফের' মত বইতেও দেখা যায়। এক নারী একাধিক পুরুষের বিবাহিতা পত্নী—এ তো আমাদের মহাভারতেই পাওয়া যায়। একই পুরুষ মাতা-কন্যা উভয়ের সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত মোপাসাঁর

'বেনামী'তে পাবেন। একই নারী পিতা-পুত্রের কামনার পাত্র—সিগ্রিড উনড্‌সেটের 'জেনী'তে পাবেন। সফোক্লীসের 'রাজা ঈডিপাস' নাটকে পিতৃহন্তা পুত্র মাতাকে বিবাহ করেছে, এবং তারপর তাকে তার সন্তানের জনক দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যে পিতা-পুত্রীর প্রেম নিয়ে বই লেখা হয়েছে। তা বাদে মোপাসাঁর গ্রন্থে, ছোটগল্পে দেহবাদের চূড়ান্ত ছড়াছড়ি। তার বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতার শেষ নেই। পরকীয়া প্রেম (এখানে অন্যের বিবাহিত পত্নীর সঙ্গে প্রেম—এই অর্থে) ও তৎসঞ্জাত সন্তানের সমস্যা—ঈউজিন ওনীল, ডি এইচ লরেন্স, স্থাবাটিনি প্রমুখ লেখকদের গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

কে কী ভাবে এই সকল বিষয়ের 'ট্রিট্‌মেণ্ট' করছেন, সে প্রশ্নের আলোচনা না করেও এ কথা বলা চলে যে, এই সকল বিষয়বস্তুর প্রতিক্রিয়া পাঠকসাধারণের মনের উপর গুরুতর এবং দীর্ঘকালস্থায়ী। দেহবাদী সাহিত্যিকের বিরুদ্ধপক্ষগণ কি পাঠকসাধারণকে এঁদের লেখা পড়তে বারণ করবেন? না, করলেই তারা শুনবে? তাঁরা কি চাইবেন না, এঁদের লেখা বাংলা ভাষায় অনূদিত হোক? বা না চাইলেই কি অনূদিত হবে না বা হচ্ছে না? আমাদের যে সকল দেহবাদী লেখকের রচনা তাঁরা চরম ক্ষতিকর মনে করেন, তাঁদের লেখা কি এ সব বিষয়বস্তু থেকে বেশী ক্ষতিকর?

তা ছাড়া এ যুগে বিরুদ্ধপক্ষ সমালোচকগণের এ প্রচেষ্টার কোন সার্থকতা নেই। পাঠকসাধারণের মনের উপর শুধু আজকালকার তথাকথিত দেহবাদী সাহিত্যের প্রভাব পড়ে না। ছায়াছবি, নৃত্য, চারুশিল্প, ভাস্কর্য—কোথায় দেহবাদের প্রভাব নেই? তাঁদের পক্ষে এ কথা বলা কি ঠিক হবে, ভাস্করের তৈরী নগ্নমূর্তি দেখা ঠিক নয়? উড়িষ্যার দেবমন্দিরসমূহের প্রাচীন ভাস্কর্য তোমরা দেখো না? না, তার প্রতিক্রিয়া দেহবাদী সাহিত্যের প্রতিক্রিয়া অপেক্ষা কম গুরুতর হবে? বিদেশী ও স্বদেশী ও স্বদেশী ছায়াছবির প্রভাব থেকে এই সব লেখার প্রভাব কি বেশী বলে মনে হয়? আমার মনে হয়, এ যুগে অত্যন্ত দেহবাদী সাহিত্যের প্রভাব সমাজের পক্ষে চরম ক্ষতিকর বলে আন্দোলন সম্পূর্ণই অর্থহীন। প্রাচীনকালেও এই ভিত্তিতে এই জাতীয় আন্দোলন সম্পূর্ণ অজানা ছিল।

আর এ কথাও তো ঠিক, কাচের ঘরে বা আবদ্ধ ঘরে রেখে বলিষ্ঠ সুস্থ

স্বাভাবিক মানুষ গঠন সম্ভব নয়। জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পক্ষে, মনের পরিণতির জন্য ভাল মন্দ, সৎ অসৎ—সব কিছু দেখা জানা ও পড়াই তো ভাল। তবেই তো তুলনামূলক বিচারে মনের প্রসার ও মননক্ষমতার সম্যক্ অনুশীলন ঘটবে। এ দিক দিয়ে বিচার করলেও মানতে হবে, ক্ষতির সম্ভাবনা যদি কোথাও থাকে, তাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা অর্জন করবার তো এও একটা পথ।

আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে, বর্তমান যুগ-সাহিত্যে দেহবাদের আমদানি অপরিহার্য। প্রাচীনকালে সাহিত্যিকেরা সমাজের উচ্চস্তর থেকে বিশিষ্ট নরনারীকে তাঁদের নায়িকার জন্য নির্বাচন করতেন। এই নায়ক-নায়িকা-শ্রেণীর জীবনের তার ছিল উচ্চগ্রামে বাঁধা, আদর্শ ও লক্ষ্যস্থল ছিল বড়, জীবনের গতি ও আকর্ষণ বিভিন্ন দিকে, অনেক সময়ে ব্যাপক ভিত্তিতেও। কিন্তু বর্তমানকালে খুব সঙ্গতভাবে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। আজ সাহিত্যের প্রাঙ্গণে সমাজের সকল স্তরের সর্বশ্রেণীর নরনারীরা এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। এ কালের সাহিত্যিকেরা সাহিত্যের পরিধিকে বহুবিস্তৃত করে দিয়েছেন। এখানে আজ যেমন অসাধারণ নরনারীকে নায়কনায়িকারূপে দেখা যায়, ঠিক তেমনি সাধারণ বা একেবারে নীচের তলার মানুষকেও নায়ক-নায়িকার অভিনয়ে দেখা যাবে। কলকারখানা বা চা-বাগানের কুলি-মজুরেরাও আজ আর সাহিত্যে অপাংক্তেয় নয়। তাদের জীবনও আজ সাহিত্যের বিষয়বস্তু। কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা-বিহীন এই শ্রেণীর এক প্রধান অংশের কাছে জীবনের প্রধানতম আকর্ষণ উচ্ছৃঙ্খলতা ও দেহবিলাস। শুধু সাধারণ মানুষের জীবনের তারুণ্য-অংশ নিয়ে নয়, তাদের জীবনকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু করে সাহিত্যিক যখন সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হবেন, তখন অতি সঙ্গত ও অপরিহার্য-ভাবেই সাহিত্যে দেহবাদের অবতারণা ঘটবে। সেখানে দেহবাদকে পরিহার করে চলতে গেলে সাহিত্য বাস্তবানুগ হবে না এবং তাতে রসসৃষ্টির পথে বাধা ঘটবে বলেই আমার ধারণা।

আরও একটা অদ্ভুত অবস্থার উল্লেখ না করে পারছি না। সাহিত্যে দেহবাদের বিরুদ্ধে সমালোচকগণ ঠিক কী ও কতদূর চান—এ বিষয়ে কোনও মতৈক্য নেই। মাথু আর্নল্ডের মত সমালোচক সেক্সপীয়র-পাঠ তরুণদের পক্ষে নিরাপদ মনে করেন নি। বায়রনের কোন কোন চলিত লেখার পঠনের বিরুদ্ধে আজও কারও কারও তীব্র আপত্তি

আছে। নরেন্দ্রের কোন কোনও লেখা তাঁর স্বদেশী ও বিদেশী (রাশিয়ান) কোন কোন সমালোচকের মতে পর্নোগ্রাফি ছাড়া কিছুই নয়। ইউজিন ও'নীলের 'স্ট্রেঞ্জ ইণ্টারল্যুড' এক সময়ে নিষিদ্ধ গ্রন্থ ছিল। আমাদের দেশে শরৎচন্দ্রের লেখা 'প্রবাসী'র কাছে প্রকাশযোগ্য বলে বিবেচিত হয় নি। 'শনিবারের চিঠি' ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের রচনাকে সাহিত্য আখ্যা দিতেই রাজী হয় নি। (অথচ আজকালকার রচনার বিষয়বস্তুর পাশে নরেশবাবুর বিষয়বস্তুর মারাত্মকতা অতি তুচ্ছ।) এমন কি, অপরাজিতা দেবীর কবিতাও অশ্লীল বলে নিন্দিত হয়েছিল (তাতে ব্যথিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—তোমার কবিতাকে যারা অশ্লীল বলে, তাদের মন অশুচি)। এই পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক সাহিত্যিক দেহবাদ সম্পর্কে কোন্ নির্দেশ মেনে চলবেন? আর চলবেনই বা কেন? সমালোচকের পক্ষে সে নির্দেশ দেবার চেষ্টা না করাই ভাল বলে আমার মনে হয়।

পরিশেষে, এই আলোচনা-প্রসঙ্গে যে দু-একটি কথা উঠেছে সে সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দু-চার কথা বলে আমি এই প্রবন্ধের উপসংহার করব।

(১) আধুনিক দেহবাদী সাহিত্য দেশজ সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কবিরহিত—এ কথা নারায়ণবাবুই বলেছিলেন। কিন্তু যখন দেখা গেল—উক্তিটা ঠিক নয়, তখন তিনি বললেন, সংস্কৃত সাহিত্যে দেহবাদ থাকলেই যে তা অনুসরণ করতে হবে, তার কী মানে আছে? এ বিচারশৈলী সঙ্গত নয়। অনুসরণ করতে হবে—এমন কোন বাধ্যবাধকতাও যেমন নেই, করলেই যে অন্যায় হবে—এমন মন্তব্যও অযৌক্তিক। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যিক যদি রসসৃষ্টির আদর্শ মেনে চলেন, অন্য কোনও আদর্শই তাঁর পক্ষে অপরিহার্য নয়।

(২) সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে, ভাষা ও আঙ্গিকের ক্রমবিবর্তন ও পরিবর্তনের ধারা সেখানে সুস্পষ্ট। কিন্তু বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। একই বিষয়বস্তু বার বার ঘুরে ফিরে আসতে পারে এবং এসেও থাকে।

(৩) আমার প্রথম প্রবন্ধে আমি বলেছিলাম যে, তরুণ-জীবনের একমুখীন আবিষ্টতার সময়কে অবলম্বন করে সাহিত্য সৃষ্টির অধিকার সাহিত্যিকের সম্পূর্ণ আছে অপেক্ষাকৃত প্রবীণ বা অর্বাচীন লেখকের কথা আমি তুলি নি, নারায়ণবাবু আর একবার লক্ষ্য করলেই সেটা পরিষ্কার হবে আশা করি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য